বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আরবী ক্যালিগ্রাফি : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

(এমফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

গবেষক

মোঃ সাইফুল্লাহ মানসুর

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ টি এম ফখরুদ্দীন

অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপনের তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর-২০১১

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

M.

46511[illegible]

465114

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

GIFT

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আরবী ক্যালিগ্রাফি : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

(Arabic Calligraphy: Bangladesh Perspective)

(এমফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

গবেষক
মোঃ সাইফুল্লাহ মানসুর
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. এ টি এম ফখরুদ্দীন
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
465114

465114

উপস্থাপনের তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর-২০১১

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মানচিত্র

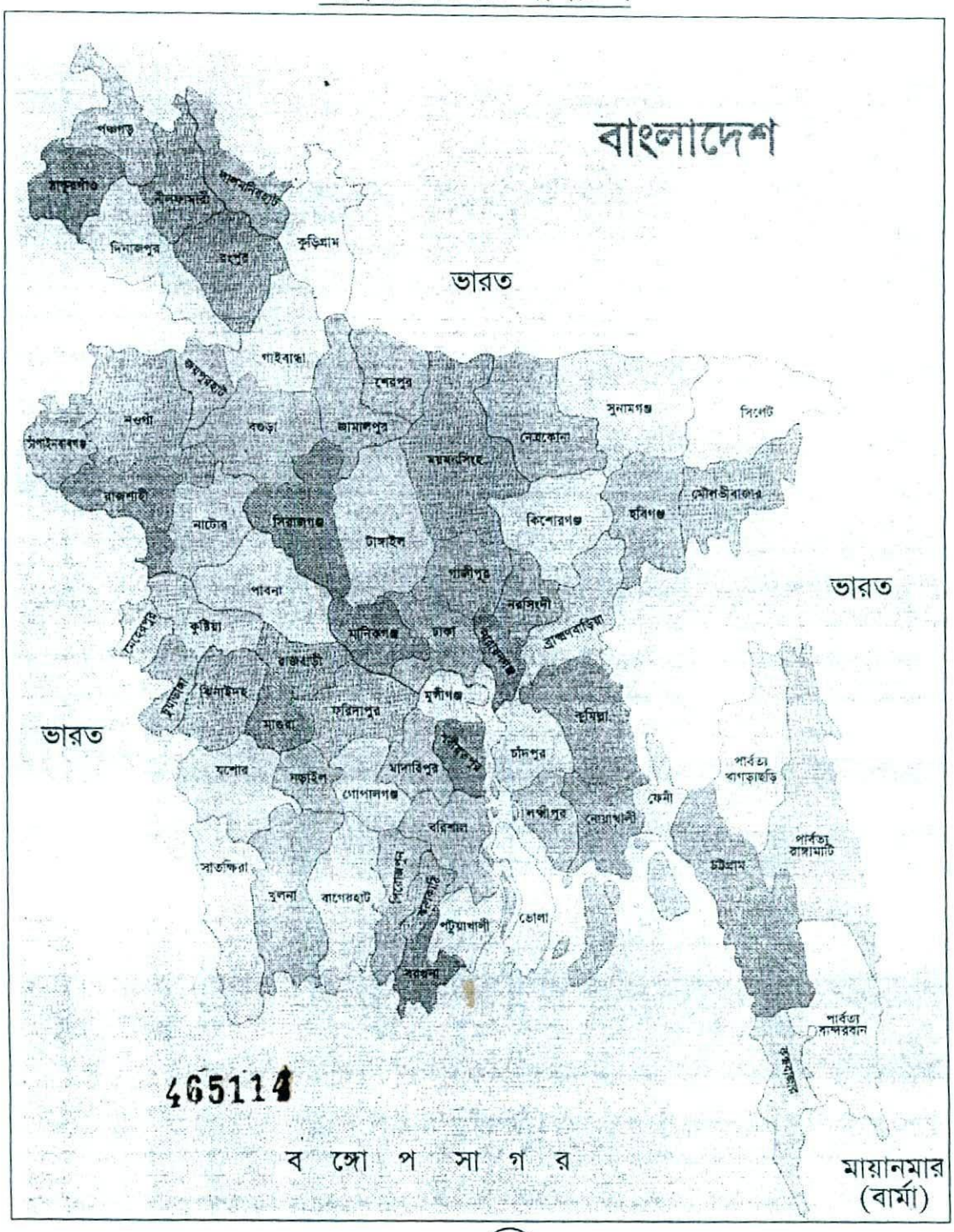

খ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

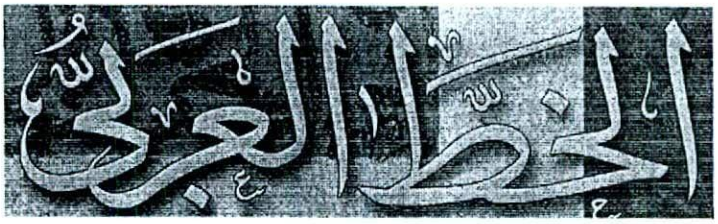

আরবী ক্যালিগ্রাফি : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

(Arabic Calligraphy: Bangladesh Perspective)

465114

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ড. এ টি এম ফখরুদ্দীন
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dr. A. T. M. Fakhruddin
Professor
Department of Arabic
University of Dhaka

সূত্রঃ

তারিখঃ ৩১ ডিসেম্বর-২০১১

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদভূক্ত আরবী বিভাগের এমফিল গবেষক **মোঃ সাইফুল্লাহ মানসুর** কর্তৃক এমফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **আরবী ক্যালিগ্রাফি : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি গবেষকের একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে এমফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম কোথাও সম্পাদন করা হয়নি। আমি অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এমফিল ডিগ্রি লাভের জন্য দাখিল করতে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করছি।

৩১/১২/১১
(ড. এ টি এম ফখরুদ্দীন)
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফোনঃ (০২) ৯৬৬১৯২০ এক্সটেনশনঃ ৬১১৩
ই-মেইলঃ atm_fakhruddin@yahoo.com
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৮৬১৫৫৮৩
ওয়েবসাইটঃ www.univdhaka.edu

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে - **আরবী ক্যালিগ্রাফি : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার এ গবেষণাকর্মের কোন অংশ ইতোপূর্বে কোথাও প্রকাশ করিনি।

মোঃ সাইফুল্লাহ মানসুর
এমফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং-৮২
সেশন: ২০০৮-০৯ ইং
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

সংক্ষিপ্ত	পূর্ণাঙ্গ রূপ
(সাঃ)	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
(আঃ)	আলাইহিস সালাম
(রাঃ)	রাদিয়াল্লাহু আনহু
(রহঃ)	রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(রাঃ)	রাদিয়াল্লাহু আনহা
পৃ	পৃষ্ঠা
নং	নাম্বার
ড.	ডক্টর
অনুঃ	অনুবাদ/অনুদিত
হিঃ	হিজরী (হযরত মুহাম্মদ সা. এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত থেকে গণনাকৃত সন)
ইফাবা	ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইং	ইংরেজি মাস
সম্পাঃ	সম্পাদিত
সংস্কঃ	সংস্করণ
খ	খণ্ড
P.	Page
(SM)	Sallallahu Alaihi Wasallam
Vol.	Volume
Ibid.	ibidem
Dr.	Doctor
Pvt.	Private
Edn.	Edition

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা

বাংলা	প্রতিবর্ণ	বাংলা	প্রতিবর্ণ
আ, া	أَ	‘	ع
ই, ি	إِ	গ	غ
উ, ু	أُ	ফ	ف
ঊ, ূ	او	ক্ব	ق
ঈ, ী	اى	ক	ك
ব	ب	ল	ل
ত	ت	ম	م
স, ছ	ث	ন	ن
জ	ج	ও, ভ	و
হ	ح	হ	ه
খ	خ	হ/ত*	ة
দ	د	’	ء
য	ذ	আ’	اء
র	ر	ই’	اء
য	ز	য়, ইয়া	يِ,ى
স, ছ	س	য়ি	ى
শ	ش	য়ী	يى
স্ব	ص	‘আ	عا
য, দ্ব	ض	‘ই	عى
ত্ব	ط	‘উ	عُ
য	ظ	‘ঊ	عو

* শব্দের শেষে আসায় ة কে উহ্য রাখা হয়েছে। যেমন- بقرة (বাকারা)

Dhaka University Institutional Repository

الحمد لله

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি কৃতজ্ঞতার মস্তক অবনত করছি যার সীমাহীন মেহেরবাণীতে **আরবী ক্যালিগ্রাফি : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সকল বিধি বিধান মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে পারলাম। অসংখ্য দরুদ ও সালাম সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি যিনি ক্যালিগ্রাফির প্রতি উৎসাহ প্রদান করে ইসলামী শিল্পকলার বিকাশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধাসহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক, বিশিষ্ট গবেষক ও অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ড. এ টি এম ফখরুদ্দীন স্যার এর প্রতি। যিনি প্রচণ্ড ব্যস্ততা সত্ত্বেও যথাযথ আন্তরিকতার সাথে আমার গবেষণা কর্মে অসামান্য অবদান রেখেছেন। শুরু থেকেই নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও তত্ত্বাবধানের ফলে গবেষণাকর্মটি শেষ করতে পেরেছি এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার জন্য অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন হয়েছে। আমার এ গবেষণাকর্মে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, অধ্যায় পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাব-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস ও আন্তরিক সহযোগিতায়। এজন্য আমি তাঁর নিকট চিরঋণী। সেই সাথে আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ মহতী কর্ম সম্পাদনে আমাকে বিভিন্ন সময় উদারচিত্তে পরামর্শ, সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা দিয়ে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন অত্র বিভাগের চেয়ারম্যান ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ড. আ স ম আব্দুল্লাহ, ড. যুবাইর মোঃ এহসানুল হক, জনাব মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী ও জনাব মুহাম্মদ রুহুল আমীন স্যার, চারুকলা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ড. আব্দুস সাত্তার, ইসলামিক আর্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি সোসাইটির সভাপতি জনাব ইব্রাহীম মন্ডল ও দেশের প্রখ্যাত ক্যালিগ্রাফার মোহাম্মদ আব্দুর রহীম। আর গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজে সহযোগিতা করেছেন মুস্তাফিজ। তাদের সবার কাছেও আমি চিরঋণী।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ, একাডেমিক পরিষদ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এর অফিসসহ অন্যান্য শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দের প্রতি যারা আমাকে আধুনিক যুগোপযুগী এ বিষয়ের উপর এমফিল করার সুযোগ করে দিয়েছেন। গভীর কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব এ বি এম আব্দুল হক, মাতা শ্রদ্ধেয়া ফিরোজা বেগম এবং বড় ভাই জনাব মোঃ ছফিউল্লাহর নিকট যারা আমার এ গবেষণার কাজে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে সাহস যুগিয়েছেন। আমি তাদের কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ। মহান আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে ইহকালে ও পরকালে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

মোঃ সাইফুল্লাহ মানসুর

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

উপস্থাপনা.....০১

প্রথম অধ্যায় : ক্যালিগ্রাফির মৌলতত্ত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ: পরিচিতি, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ.....০৭ - ৩৭
ক্যালিগ্রাফির শাব্দিক ও প্রত্যয়গত ধারণা, ক্যালিগ্রাফির প্রামাণ্য সংজ্ঞা, আরবী ক্যালিগ্রাফি, ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব, ক্যালিগ্রাফির ক্রমবিকাশ: প্রাথমিক যুগ, উমাইয়া যুগ, আব্বাসীয় যুগ ও আধুনিক যুগ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আরবী ক্যালিগ্রাফির শৈলী বা রীতিসমূহ .....৩৮ - ৬৮
কুফী লিপি, আল আকলাম আস সিত্তাহঃ সুলুস লিপি, নাসখী লিপি, মুহাক্কাক লিপি, রায়হানী লিপি, তাওকী লিপি ও রিকা লিপি।
কয়েকটি অপ্রধান ধারাঃ দিওয়ানী লিপি, তুঘরা লিপি, নাসতা'লিক লিপি, তা'লিক লিপি, শিকাসতা লিপি, ঘুবার লিপি, ইযাযা লিপি, গুলজার লিপি, তাউস লিপি, সাক্কি বা লারজা লিপি, তাজ লিপি, জুলফ-ই-আরুশ লিপি, খাত আল মানসুব, খাত আল হুর, খাত আল সুম্বুল, মুসান্না বা আয়নালী লিপি ও বিহারী লিপি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আরবী ক্যালিগ্রাফি লিপির কলাকৌশল .....৬৯ - ৭৯
আরবী লিখন পদ্ধতি, আরবী লিপির কলাকৌশল, কলম কাটার নিয়ম, কালির ব্যবহার, রং এর অন্তর্নিহিত ভাব, বিভিন্ন ধরণের রং ও রং এর ব্যবহার।

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশে আরবী ক্যালিগ্রাফি চর্চা

প্রথম পরিচ্ছেদ: ক্যালিগ্রাফারদের চর্চা ও অবদান .....৮৮ - ১৩৪
শিল্পী মুর্তজা বশির, শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী আবু তাহের, শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী, শিল্পী সবিহ-উল আলম, শিল্পী অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম, শিল্পী ভাস্কর রাসা, শিল্পী ফরেজ আলী, শিল্পী মনিরুল ইসলাম, শিল্পী এ.এইচ.এম. বশির উল্লাহ, শিল্পী সাইফুল ইসলাম, শিল্পী এনায়েত হোসেন, শিল্পী কামরুল হাসান কালন, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী, শিল্পী বশির মেসবাহ, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন, শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ, শিল্পী মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, শিল্পী নাসির উদ্দিন আহমেদ খান, শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ, শিল্পী আমিরুল হক, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার, শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী, শিল্পী মাসুম বিল্লাহ, শিল্পী আবুদ দারদা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, শিল্পী আতা ইমরান, শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল মারুফ, শিল্পী ইসহাক আহমেদ, শিল্পী মাসুম আখতার মিলি, শিল্পী আব্দুল্লাহ আল মামুন ও অন্যান্য শিল্পীগণ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা ও অবদান .....১৩৫ - ১৪১
তানযীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদরাসা, তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, কওমী মাদরাসা, শরীফা আর্ট স্কুল, চারুকলা ইনস্টিটিউট, আর্ট এন্ড ক্যালিগ্রাফি ইনস্টিটিউট, অঙ্কন আর্ট স্কুল, আর্ট স্কুল ও কলেজ এবং আরবী ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ সাংগঠনিক চর্চা ও অবদান .....১৪২ - ১৪৮
ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমী, ইসলামিক আর্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন, মুঈনীয়া ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতি কেন্দ্র ও সেন্টার ফর এশিয়ান ইসলামিক আর্ট এন্ড কালচার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা সমূহ .....১৪৯ - ১৬৮
ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রঃ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ও জাতীয় শিশু কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা।
বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীঃ বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমী, বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫, শিল্পী আরহাম-উল হক চৌধুরীর একক বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী।
একক প্রদর্শনীঃ শিল্পী মুর্তজা বশির, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী বশির মেসবাহ, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন, শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ ও শিল্পী সাইয়েদ জুলফিকার জহুর।
অন্যান্য প্রদর্শনীঃ তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, টঙ্গী শাখা ও HSBC ব্যাংক আয়োজিত প্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও ইরানী সংস্কৃতি কেন্দ্রের ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, প্রথম ও দ্বিতীয় আল কুরআন প্রদর্শনী, জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী, তেহরান ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের ৫ শিল্পী, এশিয় চারুকলা প্রদর্শনী, ইসলামী শিল্পকলার বিশেষ প্রদর্শনী এবং কাতিব ও ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও প্রদর্শনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ লোকজ ক্যালিগ্রাফি.....১৬৯ - ১৭১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ ভাস্কর্যে ক্যালিগ্রাফি.....১৭২ -১৭৩

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ বিমূর্ত ক্যালিগ্রাফি.....১৭৪ - ১৭৫

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ পাণ্ডুলিপিতে ক্যালিগ্রাফি.....১৭৬ - ১৭৮

নবম পরিচ্ছেদঃ উৎকীর্ণ লিপি.....১৭৯ - ১৮০

দশম পরিচ্ছেদঃ মুদ্রা লিপি.....১৮১ - ১৮২

একাদশ পরিচ্ছেদঃ গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা, ম্যাগাজিন-পত্রিকা, প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন.....১৮৩ - ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ক্যালিগ্রাফির প্রভাব.....১৯৯ - ২০৭

সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের কৃতিত্ব, বাংলাদেশের শিল্পকলায় এক মহান ধারা, সত্য ও সুন্দরের পথপ্রদর্শক, রুচিবোধের বহিঃপ্রকাশ ও অন্তর্নিহিত রহস্যের উদঘাটন।

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলাদেশে আরবী ক্যালিগ্রাফি চর্চায় সমস্যা সমূহ.....২০৮ - ২১৬

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, ক্যালিগ্রাফির ভাল প্রতিষ্ঠানের অবিদ্যমানতা, শিক্ষা কারিকুলামে ক্যালিগ্রাফির অনুপস্থিতি, অর্থনৈতিক সংকট, সংঘবদ্ধতার অভাব, অভিন্ন প্রকাশভঙ্গির অভাব, ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে ধারণার কমতি, আরবী ভাষা সম্পর্কে কম জানা, অবমাননার ভয় ও ক্যালিগ্রাফির উপকরণের অপ্রতুলতা।

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশে আরবী ক্যালিগ্রাফি চর্চায় সম্ভাবনাময় দিকসমূহ.....২১৭ - ২২৯

আরবী হরফের বিস্ময়কর প্রবাহমানতা, ক্যালিগ্রাফারদের সামাজিক মর্যাদা লাভ, প্রতিবছর প্রদর্শনীর আয়োজন, আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ, রুচিশীল শিল্প হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ, বাণিজ্যিক সম্ভাবনা লাভ, মিডিয়াতে প্রচার, শিল্পীর আর্থিক যোগান লাভ, দেশের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি ও মহিলা শিল্পীদের ক্যালিগ্রাফি চর্চা শুরু।

সুপারিশমালা.....২৩০- ২৩২

শিক্ষার্থীদের প্রতি, ক্যালিগ্রাফাদের প্রতি, প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি ও সরকারের প্রতি।

উপসংহার.....২৩৩ - ২৩৫

গ্রন্থপঞ্জি.....২৩৬ - ২৪২

পরিশিষ্ট.....২৪৩ - ২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপনা

তাবৎ পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে ইসলামী শিল্পকলার অবদান অনবদ্য। ইসলামী শরীয়তে প্রাণীর চিত্রাঙ্কন নিষিদ্ধ থাকায় শিল্পীরা থেমে থাকেনি ক্ষণিকের জন্যও, থমকে দাঁড়ায়নি তাদের শিল্পচর্চা। বরং কল্পনার পাখায় ভর করে তারা নির্মাণ করেছেন সৃজনশীল, সত্য ও সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি। আর ইসলামী শিল্পকলা যে সকল ধারায় বিকশিত হয়েছে তন্মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে ক্যালিগ্রাফি বা সুন্দর হস্তলিপিকলা। শিল্পীরা মহাগ্রন্থ আল কুরআন, আল হাদীস ও বিখ্যাত কবিদের কবিতার চরণমালাকে মনের মাধুরী মিশিয়ে শৈল্পিক রূপ দিয়ে শিল্পের এক অসাধারণ তৃপ্তি অনুধাবন করেছেন। চমৎকার লিপিশৈলী ও কলার মাধ্যমে একে পরিণত করেছেন একটি উচ্চাঙ্গ শিল্পে। যার জ্বলন্ত নিদর্শন হস্তলিখিত আল কুরআনের শিল্পব্যাঞ্জনা। পাশ্চাত্য শিল্পের মোকাবেলায় ক্যালিগ্রাফি শিল্প শুধু বিকাশই লাভ করেনি বরং রীতিমত প্রভাবান্বিতও করেছে আধুনিক শিল্পীদেরকে।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি নিয়ে গবেষণা, গ্রন্থ রচনা, শিল্পীদের সরাসরি পেইন্টিং ও ক্যালিগ্রফি শিল্প নির্মাণ এবং স্বদেশী ও বিদেশী প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ বাংলাদেশের শিল্পচর্চায় আরেক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যা শিল্পের এ নন্দিত ভূবনে চিরন্তন, সত্য ও সুন্দরকে একদিকে যেমন চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছে; অন্যদিকে উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়েছে নবীন শিল্পীদের মাঝে। কিন্তু সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এটি অন্তর্ভূক্ত না হওয়ায় চমৎকার এ শিল্পটি দ্রুত বিকাশ লাভ করছেনা। তবে নবীন শিল্পীদের প্রচণ্ড আগ্রহ ও আবেগ-উদ্বেলতা, তাদের শিল্পভাবনা এবং নিপুণতত্ত্ব অনুধাবনের প্রচেষ্টা অসীম দুয়ারকে করেছে উন্মুক্ত ও উন্মোচিত।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। আর প্রথম গবেষণামূলক কর্ম সম্পাদন করেছেন প্রফেসর পারেস ইসলাম সৈয়দ মুস্তাফিজুর রহমান। তাঁর কিছু রচনা ১৯৭৪-৭৫ সালে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয় তার পিএইচডি থিসিস 'মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি'। এছাড়াও 'ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি' শিরোনামে তাঁর আরেকটি বই প্রকাশিত হয় যা ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক প্রথম বই। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান ইসলামিক আর্টের উপর পিএইচডি করেছেন। ১৯৯৫ সনের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত 'মুসলিম লিপিকলা' শিরোনামে তাঁর এ বইটিতে ক্যালিগ্রাফির ইতিহাস, ক্যালিগ্রাফারদের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে।

ড. এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী এ বিষয়ে দু'টি বই লিখেন 'সিলেক্ট এ্যারাবিক এন্ড পারসিয়ান এপিগ্রাফ' (১৯৮৮) ও 'মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প' নামে। শিল্পী সবিহ-উল আলম 'লেখা থেকে রেখা', 'কারুকাজে জাদুকর' নামে দু'টি বই লিখেন। শিশুদের উপযোগী করে লেখা হলেও মূলতঃ এ দু'টি বইই গবেষণামূলক। 'আরবী লিপি ও ইসলামী হস্তলিপি কলা' নামে ড. আব্দুর রহমানের একটি রচনা ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। জোবেদ আলী কর্তৃক অনুবাদকৃত এ রচনাটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়। 'ইসলামী ক্যালিগ্রাফির উৎস ও প্রকাশ' শিরোনামে একটি অনুসন্ধানধর্মী রচনা লিখেন শিল্পী সাইফুল ইসলাম। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও জার্নালেও বেশ কিছু প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে আরবী ক্যালিগ্রাফি চর্চার উপর বিশেষ কোন গবেষণা হয়নি।

শিল্পকলার এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন থাকলেও এ পর্যন্ত তেমন খুব বেশি গবেষণা হয়নি। অথচ সাধারণ দর্শক ও পাঠকদের এ বিষয়ের নান্দনিক, ঐতিহাসিক ও উন্নয়নের ক্রমধারা জানা থাকলে এটি আরো গ্রহণযোগ্য এবং এর মাধ্যমে শৈল্পিক রসবোধ আহরণ সহজ হত। তাই আমি এ বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ নিয়েছি, যাতে ক্যালিগ্রাফির পরিচয়, বাংলাদেশের খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফারদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, বিভিন্ন শৈলীতে তাদের ক্যালিগ্রাফি শিল্প নির্মাণ, দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও প্রশিক্ষণ, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ,

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের শিল্পকলা চর্চার প্রেক্ষাপটে ক্যালিগ্রাফির ভূমিকা এবং এ শিল্পের বিকাশে সরকারের প্রতি সুপারিশমালা ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপন করেছি।

বিবেক সম্পন্ন সত্ত্বা হিসেবে প্রত্যেক মানুষই অনুভূতিপ্রবণ। তাই মানুষ মাত্রই বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অনুভূতি প্রকাশের প্রয়াস পায়। আর ক্যালিগ্রাফি হচ্ছে, সুন্দর আক্ষরিক অবয়বে অনুভূতি ও সুপ্ত প্রতিভার বাহ্যিক ও শিল্পরূপ। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় এটি সৌন্দর্য পিপাসু ও আর্ট সমঝদারদের নয়নে প্রশান্তির স্পর্শ এনে দেয়। ক্যালিগ্রাফির আক্ষরিক শিল্পরূপ মানুষের হৃদয়ে ভাবাবেগ সৃষ্টি করে এবং সুশৃংখল ও অনুগত করে তুলে। এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তারকারী শিল্প সম্পর্কে এদেশের মানুষের ধারণার কমতি থাকায় শিল্পের এ নন্দিত ধারাটি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়নি। তাই আমি এতদবিষয় অনুধাবন করে বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চা, এর বিকাশ ও লালনে প্রতিবন্ধকতা সমূহ এবং এক্ষেত্রে যে সকল সম্ভাবনা বিদ্যমান তা যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করতঃ এ শিল্পের বিকাশ ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির জন্য এবং নিম্নোক্ত কারণে এ বিষয় নিয়ে গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি-

১. ক্যালিগ্রাফি শিল্পের পরিচিতি, গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করে সমাজে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা
২. এ শিল্প বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সমূহ চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় বের করা
৩. এ শিল্প চর্চার সম্ভাবনাময়ী দিকগুলো তুলে ধরা
৪. শিল্পকলায় ক্যালিগ্রাফি শিল্পের অবদান সমূহ পর্যালোচনা করা
৫. আগামী প্রজন্মকে এ শিল্পের প্রতি আগ্রহী করে তোলা

আলোচ্য গবেষণাকর্মটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এজন্য ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট, ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমী, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, আর্ট স্কুল, ইসলামী ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, আল-আরাফাহ লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী, খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফারদের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী, বিভিন্ন প্রকাশনা ও গবেষণা সংস্থা, ইন্টারনেট ব্রাউজিং

Dhaka University Institutional Repository

এবং আমার নিকট দীর্ঘদিন থেকে সংগৃহীত ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক পেপার কাটিং, ক্যাটালগ, দেশী-বিদেশী বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও জার্নাল হতে তথ্য সংগ্রহ করেছি। অভিসন্দর্ভটিতে যাদের ক্যালিগ্রাফি চর্চার কথা ও যে সকল প্রতিষ্ঠানের অবদানের কথা উল্লেখ করেছি; তাদের সাথে সরাসরি, ডাকযোগে, সাক্ষাৎকার ও ফোনে কথা বলে এবং বিভিন্ন ক্যাটালগ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

তাছাড়া বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চায় প্রকৃত সমস্যাবলী চিহ্নিত করার জন্য প্রশ্নপত্র তৈরী করে খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফারদের কাছে পাঠিয়েছি এবং তাদের প্রেরিত উত্তরপত্রের সাথে আমার চিন্তার সমন্বয় ঘটিয়ে আমার গবেষণাপত্র প্রস্তুত করেছি। আমার গবেষণাপত্রকে ভূমিকা, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি, পরিশিষ্ট ও পাঁচটি অধ্যায়ে মোট চৌদ্দটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। শেষাংশে গবেষণার আলোকে শিক্ষার্থী, ক্যালিগ্রাফার, প্রতিষ্ঠান ও সরকারের প্রতি একটি বাস্তবসম্মত সুপারিশমালা পেশ করেছি। মূল পাঁচটি অধ্যায়ের পরিচ্ছেদ ভিত্তিক বর্ণনা নিম্নরূপ:

প্রথম অধ্যায়ে- ক্যালিগ্রাফির মৌলতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের তিনটি পরিচ্ছেদের প্রথম পরিচ্ছেদে ক্যালিগ্রাফির শাব্দিক বিশ্লেষণ, প্রামাণ্য সংজ্ঞা, আরবী ক্যালিগ্রাফি এবং এর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ক্যালিগ্রাফির প্রধান ও অপ্রধান সহ মোট ২৪টি ধারার চিত্র সহ সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। আর তৃতীয় পরিচ্ছেদে আরবী লিখন পদ্ধতি, কলম কাটার নিয়ম, কালির ব্যবহার, রং এর অন্তর্নিহিত ভাব, বিভিন্ন ধরণের রং ও রং এর ব্যবহার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে- বাংলাদেশে আরবী ও বাংলা ক্যালিগ্রাফির চর্চা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়টিতে মোট এগারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। যার প্রথমটিতে- ক্যালিগ্রাফারদের চর্চা ও এ শিল্পে তাদের অবদান, দ্বিতীয়টিতে- প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা ও অবদান, তৃতীয়টিতে- সাংগঠনিক চর্চা ও অবদান, চতুর্থটিতে- ক্যালিগ্রাফির একক ও যৌথ প্রদর্শনীসমূহ, পঞ্চমটিতে- লোকজ ক্যালিগ্রাফি, ষষ্ঠটিতে- ভাস্কর্যে ক্যালিগ্রাফি, সপ্তমটিতে- বিমূর্ত ক্যালিগ্রাফি, অষ্টমটিতে- পাণ্ডুলিপিতে ক্যালিগ্রাফি, নবমটিতে- উৎকীর্ণ লিপি, দশমটিতে- মুদ্রা লিপি এবং একাদশ পরিচ্ছেদে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা, পত্রিকা-ম্যাগাজিন, প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ে- বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ক্যালিগ্রাফির নানাবিধ ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে- বাংলাদেশে আরবী ক্যালিগ্রাফির চর্চা ও এর বিকাশে সমস্যা সমূহ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে- এক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় দিকসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে- আলোচ্য গবেষণার বিশ্লেষণ ও গৃহীতব্য বিষয় সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আমার এ গবেষণাকর্মের মাধ্যমে মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশে ইসলামী শিল্প তথা ক্যালিগ্রাফি চর্চার সমস্যা ও সম্ভাবনাময়ী দিকগুলো প্রতিভাত হয়েছে বলে আশা রাখি। পাশাপাশি সমস্যা সমূহ দূরীকরণে সরকারসহ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতি বাস্তবসম্মত সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে। এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন এবং সম্ভাবনাময়ী দিকগুলো সামনে রেখে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে গেলে বাংলাদেশে আরো দ্রুত ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্পের বিকাশ ও ব্যাপক প্রসার লাভ করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

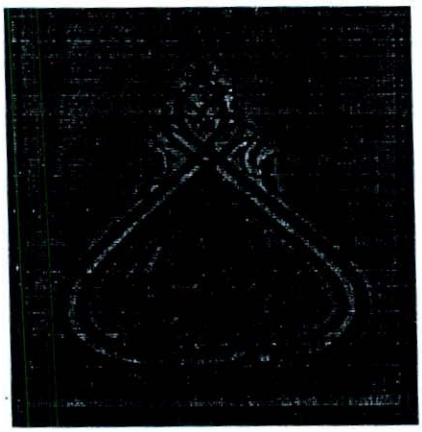

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ক্যালিগ্রাফির মৌলতত্ত্ব

পরিচয়, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

আরবী ক্যালিগ্রাফির শৈলী বা রীতিসমূহ

আরবী ক্যালিগ্রাফি লিপির কলা-কৌশল

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিচিতি, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

ক্যালিগ্রাফির শাব্দিক ও প্রত্যয়গত ধারণা

ইংরেজি ভাষার শব্দ Calligraphy শব্দটি গ্রীক ভাষার Kallos এবং Graphein শব্দদ্বয়ের সংমিশ্রণে গঠিত। Kallos অর্থ সুন্দর বা চমৎকার আর Graphein অর্থ হস্তলিখন। সুতরাং ক্যালিগ্রাফি শব্দের অর্থ- লিপিকলা, চারুলিপি, সুন্দর হস্তলিখন, হস্তলিপি শৈলী, হস্তলিখন শিল্প, হস্তলিপি কলা, হস্তলিপি বিদ্যা, হস্তাক্ষর লিখন, সুন্দর লিখনশৈলী, হস্তাক্ষর বিন্যাস ও টাইপোগ্রাফি ইত্যাদি।[১] অর্থাৎ- যে লেখায় ফুটে উঠে সৌন্দর্যবোধ, মার্জিত ও চিত্তাকর্ষক অক্ষরাবয়ব এবং সুকুমার কৃতি ও নিপুণতার ছাপ।

আরবী ভাষায় যাকে الخط বা الفن এবং ফারসীতে خوش خط (খোশখত) বলে। আর ইংরেজিতে বলা হয়- Elegant Penmenship, Fair hand writing, Beautiful writing, Art of beautiful writing, The Art of fancy lettering ইত্যাদি।[২]

Encyclopedia of World Art তে আছে- Elegant Penmenship.[৩]

আল মাওরিদ অভিধানে আছে- الخط, الخط اليد, حسن الخط ও علم الخط ইত্যাদি।[৪]

যিনি লিপিশিল্পে পারদর্শী তাকে আরবীতে خطاط ও فنان (খাত্তাত) আর ইংরেজিতে ক্যালিগ্রাফার বলে।

ক্যালিগ্রাফির প্রামাণ্য সংজ্ঞা

৯. قال الشيخ شمس الدين بن الاكفانى فى كتابه ارشاد القاصد : وهو علم تتعرف منه صور الحروف المفردة واوضاعها ـ وكيفية تركيبها خطا او ما يكتب منها فى السطور ـ وكيف سبيله ان يكتب ومالايكتب وبدال ما يبدل منها فى الهجا وبماذا يبتذل ؟[৫]

২. Mediavilla-1996:17 তে আছে- The Art of giving from to sign in an expressive, harmonious and skillfull manner.[৬]

Dhaka University Institutional Repository

৩. Oxford Advanced learners Dictionery তে আছে- Hand writing as an art, Beautiful hand writing etc.[৭]

৪. Illustrated Oxford Dictionery তে আছে- Hand writing especially when fine. The Art of hand writing.[৮]

৫. Encyclopedia Britanica তে আছে- The art of beautiful or elegant hand writing as exhibited by the correct formation of characters the ordinary of the various parts and harmony of proportions.[৯]

৬. প্রখ্যাত মুসলিম লিপিকার ইয়াকুত আল মুস্তাসিমী বলেন- ক্যালিগ্রাফি এক ধরণের আধ্যাত্মিক জ্যামিতি বা নকশা যা বিশেষ ধরনের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

৭. শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী বলেন- নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ও শিল্পকলার সৌন্দর্যের মাপকাঠি অনুসরণ করে আরবী অক্ষরে লেখা হস্তলিপিকে আরবী ক্যালিগ্রাফি বা আরবী লিপিকলা বলা হয়।

৮. আর্ট এণ্ড সিভিলাইজেশন নামক গ্রন্থে আছে- কলম বা তুলির সাহায্যে কাগজ বা এ জাতীয় উপাদানের উপর হস্তাক্ষর যা একই সাথে শৈল্পিক ডিজাইন এবং ফর্ম তুলে ধরে তাই ক্যালিগ্রাফি।

৯. ক্যালিগ্রাফি ও আধুনিক শিল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক নাসির মাহমুদ বলেন- Oriental Art আজন্ম Decorative বা অলঙ্কারবাদী। আর অলঙ্কারের উদ্দেশ্য হলো- Asthatic sence কে জাগৃতি দান। ফলে অলঙ্কৃত বস্তু যদি মানুষের নান্দনিক মনের সুক্ষকোণে নিজস্ব সুন্দরের অস্তিত্বকে নিরবে কিংবা সরবে ধীরে সুস্থে হলেও প্রামাণ্য করে তুলতে সক্ষম হয় তাহলেই তা শিল্প। আর ক্যালিগ্রাফি ঠিক তেমনি এক শিল্প।[১০]

১০. তিনি আরও বলেন- ক্যালিগ্রাফি চিরচেনা বস্তুর অচেনা ব্যাঞ্জনাসহ এক প্রাচ্য শিল্পকলা। সুতরাং এর নির্মাণ বৈজ্ঞানিক অর্থে অপূর্ব।

১১. অন্যভাবে বলা যায়- Calligraphy is the Art of beautiful or elegant hand writing. It is affine art of skilled penmenship.

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা মনের ভাব প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সাহায্যে আলঙ্কারিক রূপকে লিখিতভাবে উপস্থাপন করাকে ক্যালিগ্রাফি বলে।

তবে সুন্দর হস্তলিপিকে ক্যালিগ্রাফি শিল্পকলা বলা হলেও তা পরিপূর্ণ শিল্পকর্ম বলা যায় না। কারণ হস্তলিপির সাথে শিল্প শব্দটির সম্পৃক্ততা রয়েছে। তাই হস্তলিপিকে শিল্পকলার পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে অবশ্যই হস্তলিপিকে শিল্পরূপ দান করতে হয়। আর তা সার্থকতার সাথে পারলেই কেবল কোন হস্তলিপি ক্যালিগ্রাফি শিল্পে রূপ লাভ করে। যেমন তেমন রূপ প্রয়োগ করে যেকোন রংয়ের সমাহার ঘটালেই

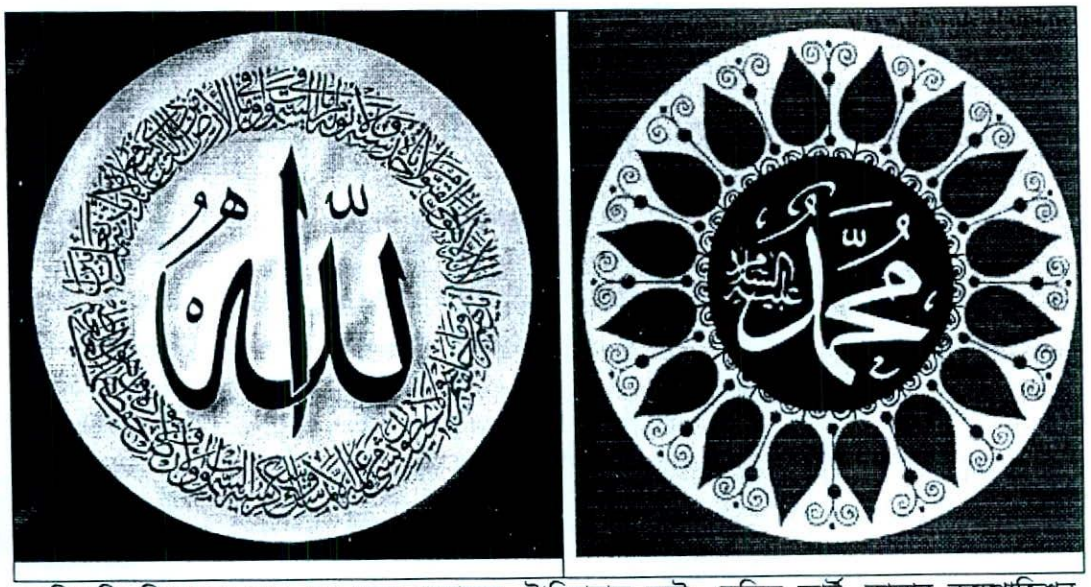

ক্যালিগ্রাফি শিল্প হয় না। এর জন্য প্রয়োজন- ট্রাডিশনাল ফন্ট, বেসিক আর্ট, কালার কম্পোজিশন, রিয়েলিস্টিক বেজ, পারসপেকটিভ সেন্স, গ্রামারিটিক্যাল সেন্স, অনুপাত, দর্শন, এবস্ট্রাক্ট ফর্ম, টেক্সচার, কালার কম্বিনেশন, আলোছায়া ও ব্রাশের জড়তাহীন গতি। আর এসব গুণ অর্জন করতে হয় প্রচুর কাজ, অনুশীলন, সাধনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ক্যালিগ্রাফি

Arabic Calligraphy is the artistics practice of hand writing and by extention of bookmarking in the land sharing a common Islamic cultural heritage.[১১] মানব সভ্যতার বিকাশ লগ্ন হতে অনিন্দ্য সুন্দর হস্তলিখন শিল্পের ব্যাপক কদর চলে আসছে। তার নান্দনিক মহিমা ও জ্ঞানের প্রসারতার বাহক হিসেবে। প্রাচ্যদেশ যথা- চীন, মিশর, আরব, ইরান, ইরাক ও প্রাতীচ্যের গ্রীস ও রোমের হস্তলিখন শিল্পের সুদীর্ঘ পরম্পরা গড়ে উঠেছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় ক্যালিগ্রাফি চর্চা হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। যেমন আরবী, গ্রীক, চীনা, ল্যাটিন, ফারসী, উর্দূ ইত্যাদি। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে খোদ বাংলাদেশেও বাংলা ভাষায় ক্যালিগ্রাফি চর্চা শুরু হয়েছে। প্রত্যেকটি ভাষার বর্ণমালার আকৃতি-প্রকৃতি ও গঠনগত কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একটি থেকে অন্যটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্টমণ্ডিত করে। কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই দ্বিধাহীন চিত্তে একথা বলা যায়, আরবী ভাষাই ক্যালিগ্রাফি শিল্পের সর্বোত্তম মাধ্যম। এ ভাষার লিপিমালায় রয়েছে শিরঃকোণ (Vertical) এবং তীর্যকরেখা (Oblique) এর টানা টানা রেখাগুলো দিয়ে যে ধরনের কৌণিক লিপি বা অক্ষর বহুভাবে লেখা যায় তা এক আশ্চর্যজনক রৈখিক ছন্দে পরিণত হয়।[১২] উল্লম্ব রেখা ও সমান্তরাল আঁচড়ের নমনীয়তা লিপিকারের জন্য এনে দেয় সৃজনশীলতার এক অপার সম্ভাবনা। যার ফলে সে সৃষ্টি করতে পারে অসংখ্য চতুষ্কোণ চক্র, ডিম্বাকৃতি রেখা, ঘনক, ফাঁস ইত্যাদি পরস্পরের সঙ্গে জড়িত রেখা যা ভারসাম্য, সাবলীলতা এবং শিল্পচাতুর্যে অতুলনীয়। মোটকথা এ ভাষার প্রত্যেকটি বর্ণের আকৃতি ও প্রকৃতিগত চরিত্র এমন যে এরা একেকটি স্বতন্ত্র শৈল্পিক কর্মের বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে।[১৩]

ভাষা মহান আল্লাহর দান। আর এ ভাষায় ক্যালিগ্রাফিক্যাল প্রকাশ ঘটে লেখনির মাধ্যমে। রাসূল (সাঃ) বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাজে সীলমোহর ব্যবহার করতেন যা আরবী ক্যালিগ্রাফি সমৃদ্ধ। খোলাফায়ে রাশেদার সময় এর ব্যাপক চর্চা হয়। হযরত আলী (রাঃ)ও একজন দক্ষ ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগ নামে খ্যাত আব্বাসীয় খিলাফতে হস্তলিপির অসংখ্য Style বা শৈলীর উদ্ভব হয় এবং লিপিমালার সকল শৈল্পিক প্রয়োজনীয়তা ও মাধুর্যের চরম বিকাশ ঘটে। আরবী হস্তলিপি পদ্ধতির প্রকারভেদ এবং শিল্পমাধ্যম গুলো কাল ও রসোত্তীর্ণ। এ ভাষার বর্ণমালার সকল অক্ষরের সমাপ্তি ঘটে পেলব বড় বড় টানা রেখায়। আর সেই রেখাকে যেমন খুশি কৌণিক বা বক্রাকার রেখায় রূপান্তরিত করা যায়। এ সকল অক্ষরের শেষাংশকে দীর্ঘায়িত বা সংকুচিত করা যায় এবং সমান্তরাল রেখার সঙ্গে খাঁড়া রেখার সামঞ্জস্য

Dhaka University Institutional Repository

বিধান অথবা বৈপরিত্বে এমন ঐন্দ্রজালিক মোটিভের সৃষ্টি করা হয় যা সুমিষ্ট সঙ্গীতের আবেশের সমতুল্য। আরবী হরফের সুপ্ত শৈল্পিক গুণাবলী হাজার বছর ধরে হস্তলিপি বিশারদ বা লিপিকারদের অনুপ্রাণিত করেছে। নানাবিধ অনুপম বৈচিত্রময় বর্ণমালা সৃষ্টিতে আরবী লিপির কৌণিক, গোলায়িত, উল্লম্ব, সমান্তরাল, টানটোন ও রেখা বিন্যাসের সাহায্যে লিপিকারেরা সুষমামণ্ডিত ছন্দায়িত সর্পিল পেলব আরবী লিপিকলা নির্মাণ করেছেন।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও আল হাদীসের ভাষা আরবী। জান্নাতের ভাষাও আরবী। আরবী বর্ণমালা ইসলামী শিল্পকলাকে দিয়েছে বিশিষ্ট রূপ ও শিল্পগত ঐক্য। ইসলামে আরবী লিপিকলার রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। সুন্দর ও চমৎকার লিপিই হচ্ছে শিল্পের মাধ্যমে ইসলামের বাণী প্রচারের শক্তিশালী হাতিয়ার। আমরা মহান আল্লাহকে দেখিনা কিন্তু পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সময় তার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করি। যেমন- হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা ঙ চিহ্নকে ওঙ্কারের প্রতীক ধরে তার প্রতি আরাধনা ও শ্রদ্ধা জানায় ঠিক তেমনি শিল্পীরা তার বাণীমালাকে শৈল্পিক রূপব্যাঞ্জনায় হৃদয়গ্রাহী করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন এবং তারা একাজকে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত মনে করেন। তাই ক্যালিগ্রাফি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র। সুতরাং কুরআনের এ ভাষাকে অবলম্বন করে যে লিপিশিল্প গড়ে উঠেছে তা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য অতুলনীয় এক শিল্পসম্পদ।

হস্তলিখিত কুরআনের বাণী হচ্ছে অলৌকিক বাণীর শৈল্পিক রূপব্যাঞ্জনা। আর মুসলমানরা একে পরিণত করেছে উচ্চাঙ্গ শিল্পে। এ লিখন পদ্ধতির প্রকৃতি একক নয়, বহুবিধ। তাই সর্বক্ষেত্রে এর শৈল্পিক রূপ লক্ষ্য করা যায়। আর তা হচ্ছে- এ বর্ণমালা গুলো লম্বা ও সমান্তরাল স্বভাবের। এ দু'বিপরীতমুখী

বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে শিল্পীরা লিপিকর্মে এক অসাধারণ সৌন্দর্য নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন। যেমন- আল্লাহ' শব্দের মধ্যে যে ক'টি হরফ আছে তা লম্বা স্বভাবের। এ লম্বা স্বভাবটি সমান্তরাল স্বভাবের সাথে সমন্বিত হয়ে যে বৈচিত্র রূপ দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে তা লিপিকর্মে অতুলনীয়। তাছাড়া উদ্ভিদীয় পরিকল্পনায় বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে ফুল ও লতা-পাতা। জ্যামিতিক আকার আকৃতির মধ্যে বৃত্ত, ঘনক, সরল, ও বক্ররেখা বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী বর্ণমালার ২৯টি বর্ণই আঁকা-বাঁকা, খাড়া ও সমান্তরাল। তাই এর অক্ষর গুলোকে উদ্ভিদীয় তথা ফুল-

Dhaka University Institutional Repository

লতা-পাতা এবং জ্যামিতিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে যেকোন ভাবে এ লিপিকে উপস্থাপন করা যায় যা অন্য কোন ভাষার লিপি দ্বারা সম্ভবপর নয়।[১৪]

শুধু তাই নয় ইউরোপ, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের স্থাপত্য অলঙ্করণ প্রক্রিয়ায় আরবী হস্তলিখন শিল্প প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রফেসর লেথাবী মনে করেন, ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবীর কোন কোন অংশের অলঙ্করণ প্রক্রিয়ায় মুসলিম হস্তলিখন শিল্পের অলঙ্করণ বৈশিষ্ট্যের ছাপ সুস্পষ্ট। অতএব ডেকোরেটিভ আর্ট হিসেবে আরবী ক্যালিগ্রাফি শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর পারেস ইসলাম সৈয়দ মুস্তাফিজুর রহমান বলেছেন- The nature of Arabic script is such that it provides the calligraphers with squares, circles, ovals, loops, entwining and interlacing shafts adaptable to almost any design or graceful curvature.[১৫] আর তাই আরবী ক্যালিগ্রাফির এত ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ সম্ভব হয়েছে।

পবিত্র আল কুরআনের অনুলিপি প্রণয়ন ধর্মীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত একটি প্রশংসনীয় কাজ হিসেবে পরিগণিত। কথিত আছে- কুরআন শরীফের অনুলিপি তৈরী ও বিক্রি করে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব জীবিকা নির্বাহ করতেন। আর্থার উপহাম পোপ মনে করেন, কুরআন হচেছ- মুসলমানদের জীবনধারা এবং পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। এর উপর সমাজের পূর্ণ কাঠামো, জীবন প্রণালী এবং ভবিষ্যতের পাথেয় নির্ভর করছে। এর উপর সমাজের সর্বশেষ ও অলংঘনীয় বাণী সম্বলিত ও জীবনের সৎকাজের পাথেয় হিসেবে স্বীকৃত কুরআন স্বভাবত মানুষের চিরন্তন শৈল্পিক চাতুর্যের বিকাশের একটি প্রধান উৎস হিসেবে দাঁড়ায়। এর ফলে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ পবিত্র ধর্মগ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলো লিপিকারেরা এমন অসামান্য দক্ষতা, জ্ঞান ও ধর্মীয় অনুভূতি সহকারে বিভিন্ন ধরনের অপূর্ব নকশাবলী দ্বারা অলঙ্কৃত করেন যে, সেগুলো আজ পর্যন্ত বিমূর্ত শিল্পকলার ইতিহাসে সর্বোত্তম কৃতিত্ব হিসেবে পরিগণিত।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

আরবদের পারস্য বিজয়ের সময় শিল্পী ধর্মগুরু মনীর অনুসারীরা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সমূহ অপূর্ব লিপিকলার মাধুর্য ও লালিত্য দ্বারা অনুলিপি প্রস্তুত করতেন। মূলত তাদের ধর্ম শিল্পকলার সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। এম. জিয়াউদ্দীন বলেন, যেখানে প্রায় সমস্ত পয়গাম্বর সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে প্রত্যাদেশ লাভ করেন সেখানে একমাত্র মনী তাঁর নিকট প্রেরিত দৈববাণীর রূপায়নে ধর্মীয় চিত্রকলার আশ্রয় গ্রহণ করেন। একমাত্র তিনিই ছিলেন একাধারে ধর্মগুরু এবং প্রথিতযশা শিল্পী। মানবজাতিকে মনীর শিল্পকর্ম ভিত্তিক ধর্ম বা Mainchainism এর নিগড় থেকে রক্ষার জন্য পারস্যে যখন জরথুস্ত্র ধর্মের আবির্ভাব হয় তখন মনীর তথাকথিত আসমানী গ্রন্থ ধর্মগুরুর সামনেই আগুনে পোড়ান হয়। কথিত আছে যে, লেলিহান শিখা যখন তার ধর্মগ্রন্থ সমূহ গ্রাস করেছিল তখন সেগুলো থেকে সোনার নহর প্রবাহিত হয়। বহুযুগ ধরে নির্যাতনের পরেও মনীর অনুসারীরা আব্বাসীয় খিলাফতে বসবাস করতে থাকে এবং চিরাচরিত শিল্পরীতির মাধ্যমে তাদের গ্রন্থাবলী সুচারুরূপে অলঙ্কৃত করতে থাকে। এমনকি আজ পর্যন্ত পারস্যে মনীর গ্রন্থের অপরিসীম আলঙ্করিক সৌকর্য এবং তার সুক্ষ্ম ও বলিষ্ঠ লিপির মাধ্যমে ঈশ্বরের নৈকট্য ও সৌন্দর্যলাভের প্রয়াস সর্বজনবিদিত। মনী সিরিয়াকে সঙ্গে নিয়ে এস্ট্রান জেলোর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একটি নতুন লিপিকলা আবিস্কার করেন। তার রচনাবলী এ নতুন রীতিতে লিপিবদ্ধ করা হয় যার মূল আকর্ষণ অলঙ্কার।

রাণী হেটেপ হেরেসের সমাধিতে প্রাপ্ত একটি আবলুস কাঠের চেয়ারে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে দেখা যায়, এর শৈল্পিক গুরুত্বের প্রধান উৎস হচ্ছে - অক্ষরের স্থলে ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তুর চিত্রায়ণ। আরবী বর্ণমালার হস্তলিখন রীতিতে সকল গুরুত্ব আরোপিত হয় গীতিময়তা ও ছন্দময় রেখা। রোজার ফ্রাই বলেন- এক্ষেত্রে বলা যায় যে, চীনা ও পারস্য লিপিকলা যেহেতু উভয়ের সাবলীল এবং বাঁধাহীন রেখাছন্দের উপর নির্ভরশীল সেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এটি চিত্রকর এবং লিপিকারকে চিত্রকলার সাথে লিপিকলার সমন্বয় ঘটিয়ে একটি অপূর্ব শিল্পকর্ম তৈরী করতে সহায়তা করে। সম্ভবত রেখার অসামান্য গীতিময়তা ও সম্ভাবনার জন্য আরবী লিপিকলাকে আমরা অধিকতর মাধূর্যপূর্ণ বলতে পারি। আরবী লিপিকলার অসাধারণ সম্ভাবনার মাধ্যমে চিত্রকর্ম এবং সাহিত্যিক বিষয়াদির সংমিশ্রণে পারস্য প্রতিভার উদ্ভাবনী শক্তি ও কৌশলের যে স্ফুরণ ঘটেছে তার চেয়ে অধিকতর আকর্ষণীয় আর কিছুই নেই। এ রীতি পদ্ধতি প্রমাণ করে যে, পারস্য শিল্পীদের সুকুমার প্রবৃত্তিতে রৈখিক ছন্দ অসামান্য প্রভাব ফেলেছে।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট শিল্পসমালোচক ও বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন- চতুষ্কোণিক শব্দে বা বর্ণে ক্যালিগ্রাফি সুন্দর হয় না। যেমন- ইংরেজি বাংলা ইত্যাদি ভাষার বর্ণমালা। কিন্তু আরবী ভাষার বর্ণগুলো উর্ধ্ব-লম্ব ও জ্যামিতিক বৃত্তের মত। অর্থাৎ ক্যালিগ্রাফি শিল্পের যতগুলো আকার-আকৃতি আছে আরবী হরফে তার সবই পাওয়া যায়। মোটকথা আরবী বর্ণামালা নিজেই একটি শিল্প। জাপানী, চীনা ও কোরিয়া লিপিতেও শিল্পচর্চার প্রথম সোপান হিসেবে ক্যালিগ্রাফি হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন- আমরা আল্লাহকে দেখতে পাইনা শুধু অনুভব করি। সে অনুভবের মাধ্যম হল কুরআন শরীফ। আমরা আল্লাহকে চিত্রিত করতে না পারলেও আল্লাহর বাণীকে চিত্রিত করে আল্লাহকে অনুভব করতে চেষ্টা করি এ ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে।[১৮]

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে ক্যালিগ্রাফির বিশাল ভাগ চর্চা হয় বা হওয়ার সুযোগ আরবী ভাষায় রয়েছে। আর এজন্য ক্যালিগ্রাফির কথা উচ্চারণ করলেই মনের অজান্তেই আরবী ক্যালিগ্রাফির কথাই মানব মনে ঝংকৃত হয় অথবা বাস্তবে চোখের সামনে ভেসে উঠে আরবী বর্ণের সুদৃশ্য রূপব্যাঞ্জনা।

ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব

ইসলামী ক্যালিগ্রাফির মূলভিত্তি হচ্ছে- আরবী লিপি। তাই ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করার আগে ভাষা ও বর্ণমালার উদ্ভব সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। পৃথিবীর সূচনালগ্ন হতে মানুষ মনের ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ভাষা এবং ভাষা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে লিপির ব্যবহার করে আসছে। মানব শিশু জন্মগ্রহণের পর একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে ছোট ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা মনের উদিত ভাব ও আবেগ প্রকাশের চেষ্টা করে থাকে। তারা তাদের পিতা-মাতার ভাষাকে অনুসরণ করে কথা বলে। এভাবেই প্রয়োজনের তাগিদে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে এবং মনের ভাবকে অন্যের নিকট প্রকাশ করতে গিয়ে উদ্ভাবিত হয়েছে লেখার কলাকৌশল। পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষারই নির্দিষ্ট বর্ণমালা রয়েছে যার সাহায্যে অর্থবোধক শব্দ এবং একাধিক শব্দের সঠিক প্রয়োগের ফলে বাক্য সৃষ্টি হয়। যা লিখনযোগ্য উপকরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করে মনের লালিত ভাবকে নিকট ও দূরের লোকদের নিকট প্রেরণ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে- ফিনিশীয় লিপি থেকে এ লিপির উদ্ভব হয়েছে। আর ফিনিশীয় লিপি মিশরীয় লিপি থেকে জন্ম নিয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে- আরবী বর্ণমালা এক মুসামী বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত। তিনি আরও বলেছেন- বর্তমানে লিপিতত্ত্ববিদগণ প্রমাণ করেছেন যে, গ্রীক লাতিন বর্ণমালাও মুসামী লিপিমালা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। উত্তর আরবে মুসনাদ লিপির শাখালিপিগুলোকে সাফাভী, সামুদী ও লিহয়ানী লিপি বলা হতো। দক্ষিণ আরবে এর শাখালিপিকে বলা হতো হিময়ারী।[১৯]

প্রাচীন লিপিবিজ্ঞানের সূত্র মতে- প্রাচীন ভাষার বর্ণমালা আবিস্কৃত হওয়ার পূর্বে জীবজন্তুর প্রতিকৃতি, প্রতীক চিহ্ন ও সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে লেখার কাজ চালানো হতো।[২০] মিসরের নীলনদ ও দজলা ফোরাতের উপত্যকা ধরে প্রাচীন সভ্যতার যে ভিত্তিস্তর রচিত হয়েছিল তারই ফল্গুধারা পরবর্তীতে বিশ্বের সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছিল। প্রাচীন মিসরের সমাধিসৌধ ও উপাসনা মন্দির গাত্রের প্রস্তর ফলকে এক ধরনের লেখার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যাকে Hieroglyphs (হাইরোগ্লিফস) বা সাংকেতিক চিহ্নের লিখন পদ্ধতি হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে। সাধারণত

জীবজন্তুর স্থুল প্রতিকৃতি বর্ণমালার পরিবর্তে সাংকেতিক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে যে লেখার জন্ম দিয়েছে তাকে লিপিবিজ্ঞানীগণ Hieroglyphs নামে অভিহিত করেছেন। যেমন কাক, শকুন, মাছি ও মানুষ প্রভৃতির প্রতিকৃতি বর্ণমালার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রায় একশত সাংকেতিক লিপির সাহায্যে এ Hieroglyphs লিখন পদ্ধতি পরিচালিত হতো।[২১]

আরবী লিখন পদ্ধতির ন্যায় সাধারণত ডানদিক হতে বামদিকে সাংকেতিক লিপি সাজিয়ে লেখার কাজ সম্পন্ন করা হতো। ঠিক এমন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, ক্রীট ও সিনাই উপদ্বীপে। আরব উপদ্বীপের উত্তরাংশে সিনাই উপত্যকা এবং এর আশে পাশে দক্ষিণ সিরিয়ার বিশাল অঞ্চল জুড়ে একটি গোত্র সভ্যতা গড়ে ছিল। বুশরা, পেতরা ও হিজর এ তিনটি শহরকে কেন্দ্র করে নাবাতিয়ানরা নিজেদের মধ্যে আরবী ভাষায় কথা বলত কিন্তু তাদের নিজস্ব কোন লিপি ছিলনা। তারা পার্শ্ববর্তী গোত্র আরামীয়দের লিপিকে সংস্কার করে নিজেদের প্রয়োজন মেটাত। নাবাতিয়ানরা মূলতঃ আধা যাযাবর ধরনের জীবনধারায় অভ্যস্ড় ছিল। এজন্য তারা বিভিন্ন বস্তু ও অলঙ্কৃতিতে হরফের গঠন ও উচ্চারণ

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বনির প্রচলন করে। যেমন- 'ইয়াদুন' অর্থ হাত। যার আরবী হরফ يد এর গঠনও হাতের সদৃশ করার চেষ্টা চালায়। অনুরূপভাবে 'সিন' অর্থ দাত। যার আকৃতিও (س) দাঁতের মত। প্রাচীন আরবী হরফের সর্বপ্রথম যে নমুনাটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে উম্মুল জিমালে প্রাপ্ত ২৫০ খৃস্টাব্দের একটি প্রস্তরফলক। ষষ্ঠ শতাব্দীতে উম্মুল জিমাল থেকে প্রাপ্ত দ্বিতীয় প্রস্তরফলক থেকে এ তথ্য পাওয়া যায় যে, নাবাতিয়ান লিপি থেকেই আরবী লিপির উদ্ভব।[২২]

অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায়, খৃস্টপূর্ব প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ইরাকের দজলা ও ফোরাত অঞ্চলে হাম্মুরাবি সভ্যতা ছিল। রাজধানী বাবেল বা ব্যাবিলনের প্রতিষ্ঠাতা হাম্মুরাবি সুমরিউন ভাষায় কথা বলতেন। পরবর্তীতে এই সুমরিউন ভাষা-ভাষীগণ আরবী ভাষায় একীভূত হয়। ফলে আরব অধিবাসীগণ যে আরবী ভাষার প্রচলন করে পরবর্তীতে তার সাথে এ সুমরিউন ভাষার কিছুটা সংমিশ্রণ ঘটে। আরব সূত্র সমূহ থেকে জানা যায়, খৃস্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতক পর্যন্ত ও আরবী ভাষার কোন লিখিত রূপ ছিলনা। তবে পঞ্চম শতকে উত্তর-পূর্ব আরব উপদ্বীপের হিরা ও আম্বর অঞ্চলে যে সমস্ত গোত্রসভ্যতা ছিল তাদের মধ্যে আরবী লিপি 'উত্তর আরবীয় লিপি' হিসেবে প্রচলিত ছিল। হিজরী সন শুরুর পাঁচ-ছয়শত বছর পূর্বে এ লিপি পশ্চিম আরব পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। বিশর ইবনে আবদুল মালিক তার শ্বশুর ও তার বন্ধু হারব ইবনে উমাইয়া কুরাইশদেরকে এ লিপির শিক্ষা দেন।[২৩] প্রাপ্ত প্রাচীন প্রস্তরলিপি থেকে জানা যায়, আরবী লেখার জন্য প্রথম দিকে পরস্পর যুক্ত ও বিচ্ছিন্ন উভয় ধরনের বর্ণমালাই ব্যবহৃত হত। তবে পরস্পর যুক্ত বর্ণমালাকেই প্রকৃত আরবী বর্ণমালা বলে ধরে নেওয়া হয়।

ব্যাবিলনে প্রাপ্ত পাথর ও ইটের উপর কীলকাকার প্রতীক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে যে লিপিশৈলী সৃষ্টি হয়েছিল, লিপি বিজ্ঞানীগণ তাকে কিউনিফরম (Cuneiform) বা কীলকাকার সাংকেতিক চিহ্নের লিখন পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। প্রথম পর্যায়ে ত্রিকোণাকৃতি ছবি সাংকেতিক চিহ্ন হিসেবে অক্ষরের মান নির্ণয় এবং ক্রমান্বয়ে সরলীকরণের মাধ্যমে সাধারণ প্রাকৃতিক বস্তু কীলকাকার সাংকেতিক চিহ্ন রূপে অক্ষরের মান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে লেখালেখির কাজ সম্পাদন করা হত। যেমন- মানুষের হাত, পা, মাথা, কুড়েঘর, মানুষ ও হাতুড়ী ইত্যাদি বিভিন্ন পাত্র ও নলখাগড়া ত্রিকোণাকৃতির পরিসর সৃষ্টি করে বর্ণমালার সাংকেতিক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত ব্যাবিলনে উদ্ভাবিত এ কিউনিফরম লিখন পদ্ধতিটি সামী বা সেমেটিক ভাষালিপির অন্তর্ভূক্ত।[২৪] দূর প্রাচ্যের চীনে ভাবের পরিবর্তে প্রতীক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে যে লিখনশৈলীর

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি করেছে তাকে Ideograph হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। মিসরের 'হাইরোগ্লিফস' এবং ব্যাবিলনের 'কিউনিফরম' লিখন পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে সামী বা সেমেটিক ভাষা সমূহের বর্ণমালা ও লিপির উদ্ভব ঘটিয়েছে এবং পরবর্তীতে তা ইউরোপীর ভাষাসমূহের বর্ণবিকাশে প্রভূত অবদান রেখেছে।

আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে, ফিনিশিয়ার অধিবাসীগণ মিসরের হাইরোগ্লিফস এবং ফিনিশীয় বর্ণমালা ভিত্তিক লিখন পদ্ধতির সূত্রপাত করেছিল। কিন্তু হাইরোগ্লিফস এবং ফিনিসীয় বর্ণমালা ভিত্তিক লিখন পদ্ধতির মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান ছিল। খৃস্টপূর্ব ২০০০ বছর আগে সিনাই উপদ্বীপে সিনাইতীয় বর্ণমালা মিসরীয় হাইরোগ্লিফস এবং ফিনিশীয় বর্ণমালা ভিত্তিক লিখন পদ্ধতির মধ্যে এক চমৎকার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হাইরোগ্লিফস পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ষাড়ের মাথা, ফিনিশীয় ভাষায় আলিফ অক্ষরের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।[২৫] সিনাইয়ের বর্ণমালার যে উৎপত্তি হয়েছিল তা দক্ষিণ আরবে পরিব্যপ্ত হয়ে একটি স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে এবং খৃস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে তা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পরবর্তীতে আরবের পাথর ব্যবসায়ীদের সূত্র ধরে এ বর্ণমালা ফিনিসীয় উপকূলে পৌছে এবং সে স্থান হতে গ্রীকদের নিকট হস্তান্তরিত হয়ে ইউরোপের যাবতীয় বর্ণমালায় জন্মদাত্রী হিসেবে বিবেচিত হয়। মোটকথা সিনাইতীয় বর্ণমালার রূপান্তর থেকে দক্ষিণ আরবী বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছে এবং তা বিকাশের ধারায় ফিনিসীয়, রাস আল শামরাহ আর পরবর্তীতে গ্রীক, ল্যাটিন এবং আরবী বর্ণমালার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নয়নে প্রভূত প্রভাব বিস্তার লাভ করে।

আরবী ভাষা এবং এর লিখন পদ্ধতির উৎপত্তির বিষয়টি পরিপুর্ণভাবে সুস্পষ্ট নয়। ফলে এ নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ ও বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন- পবিত্র আল কুরআনের সূরা আল বাকারার ৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾

অর্থাৎ- আর তিনি হযরত আদম (আঃ) কে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর সেগুলোকে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন- যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে বলতো এগুলোর নাম।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব এ আয়াতের আলোকে বিশ্বাস করা যায় যে, যেহেতু প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কেই হযরত আদম (আঃ) কে অবহিত করানো হয়েছে সেহেতু তাকে আরবী সম্পর্কেও অবগত করানো হয়েছে। এ বিশ্বাসের আলোকে বলা যায়, হযরত আদম (আঃ) এবং তারপর তদীয় পুত্র হযরত শীষ (আঃ) আরবী বর্ণ ও বিন্যাসের উৎকর্ষ সাধন করেন। এভাবে বংশানুক্রমে তারাই আরবী ভাষার বিকাশ সাধন করেন। তবে ইতিহাস অধ্যয়নে নিম্নোক্ত মতামতগুলো পাওয়া যায়-

কথিত আছে, হযরত আদম (আঃ) আরবী-সিরীয় এবং অন্যান্য বর্ণমালায় উদ্ভাবন করে ঐসব ভাষার ভাবের আদান-প্রদান করেন। হযরত আদম (আঃ) এরপর স্বীয় পুত্র শীষ (আঃ) আরবী বর্ণ ও অক্ষরের উৎকর্ষ সাধন করেন।

অপরপক্ষে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন- হযরত ইসমাঈল (আঃ) চৌদ্দ বছর বয়সের সময় আরবী বর্ণমালায় লেখার পদ্ধতি চালু করেছেন।[২৬]

উপরিউক্ত দু'টি মতের মাঝে সমন্বয় করে বলা যায়- হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক প্রদত্ত আরবী লিপির প্রকৃত রূপ প্রদান করেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)। আর হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর অপর পুত্র হযরত ইসহাক (আঃ) ও তার বংশধরগণ সিরীয় বর্ণমালার বিকাশ সাধন করেন।

আদাবুল কেতাবে বর্ণিত আছে- হযরত আদম (আঃ) প্রথম সুরিয়ানী বা আরবী হরফ তৈরী করেন। হযরত নূহ (আঃ)ও আরবীর প্রসার ঘটান এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ) তার সংস্কার করেন।

বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়, হযরত আদম (আঃ) এর পুত্র শীষ (আঃ) আরবী বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করেন। তারপর আরবরা এ বর্ণের ও ভাষার আরও শিল্পরূপ বিকশিত করেন।

কারো কারো মতে, আরবী লিপির উদ্ভব হযরত ইদরীস (আঃ) এর দিকে নির্দেশ করা হয়। যিনি 'মাকালী' বৈশিষ্ট্যের লিখন পদ্ধতিকে পূর্ণতা দান করেন।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে ইসহাক হতে বর্ণিত আছে- প্রাথমিক পর্যায়ে উমায়ম, জুদাইস এবং তামস গোত্রের ব্যক্তিভিত্তিক নাম অনুসারে আরবী বর্ণমালার নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।[২৮]

খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে নাবাতীয় সাম্রাজ্য শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান হিসেবে বিদ্যমান ছিল। ১০৫ খৃস্টাব্দে নাবাতীয় শক্তি স্বাধীনতা হারিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের এক অঙ্গ প্রদেশে পরিণত হয়। এ সময় নাবাতীয়রা আরবদের সাথে একীভূত হতে থাকে। নাবাতীয়গণ দৈনন্দিন জীবনে আরবী ভাষায় মনের ভাব আদান-প্রদান করলেও আরবী বর্ণমালা ও লিখনশৈলীর উদ্ভাবন না হওয়ায় তাদের উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিবেশী এ্যারামীয়দের লিখন পদ্ধতির সাহায্যে মনোভাব প্রকাশ করত। খৃস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এ্যরোমীয় লিখনশৈলী হতে গোলায়িত নাবাতীয় লিখন পদ্ধতির সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীতে উত্তর আরবের সাবলীল আরবী লিখনশৈলীতে রূপান্তরিত হয়। আর ষষ্ঠ শতাব্দীর সূচনালগ্নে নাবাতীয় বর্ণমালা হতে আরবী বর্ণমালার উদ্ভব হয়। কিন্তু অন্য আরেকটি সূত্রমতে, সিরিয়া লিখন পদ্ধতি আরবী লিখন পদ্ধতির উৎপত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।[২৯]

উপরে উত্থাপিত সেমেটিক বা সামী বর্ণমালা ও লিখন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নাবাতীয় লিখন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত বর্ণ ও হরফের প্রকৃতি সাধারণত গোলায়িত। সিরীয় লিখন পদ্ধতিতে স্বরচিহ্ন হরফের পৃথকীকরণের জন্য ব্যবহৃত নোকতা বা বিন্দু এবং শব্দ বিন্যাসের নিয়ম পদ্ধতি দেখা যায়। 'মাকালী' পদ্ধতির লিখন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গোলায়িত হরফের ও লম্ব-উল্লম্ব দণ্ডের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। মাকালী পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গেলে আরব উপকথার আশ্রয় নিতে হয়। হযরত ইদরীস (আঃ) আরবী লিপির মাকালী ধারাটির পূর্ণতাদানকারী। হযরত ইসহাক (আঃ) সিরীয় ধারার লিপির মূলধারার পূর্ণতাদানকারী। তবে উৎস হিসেবে আরবী বর্ণমালার লম্ব দণ্ডের জন্য মাকালী পদ্ধতি গোলায়িত আকৃতির জন্য নাবাতীয় পদ্ধতি এবং স্বরচিহ্ন ও হরফের পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কৌশলের জন্য সিরীয় লিখন পদ্ধতিকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে অনুমান করা যায়।

তাছাড়া তখন এমন এক ধরনের টানা লিখা ছিল যাতে একেকটি শব্দের বর্ণগুলো সাধারণত পরস্পর যুক্ত থাকত। 'লায়িন' নামে পরিচিত এ ধরনের লেখা ছিল মোলায়েম এবং তা মোটা ডগাবিশিষ্ট কলম দ্বারা লেখা হত। এছাড়া সম্ভবত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইয়াবীস নামে অন্য এক ধরনের লিপি ব্যবহৃত হত যা

Dhaka University Institutional Repository

ছিল অনেকটা কর্কশ ধরনের ট্যান করা চামড়ার উপর বাটালির মত। ধারালো ডগা বিশিষ্ট কলম দ্বারা এ লিপি লেখা বা খোদাই করা হত। বিভিন্ন শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ধরনের লিপিরও প্রচলন ছিল।[৩০] আরবী বর্ণমালার রূপ পরিপূর্ণরূপে পরিগ্রহ করার ফলে এবং প্রয়োজন অনুসারে তাদের সংকোচন ও সম্প্রসারণ করে তড়িত লেখার কাজ সমাধা ও অলঙ্করণের ব্যবহার করার প্রেক্ষিতে সুন্দর হস্তলিখন পদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশ লাভ করছে।

শিল্প সাধনা মানব প্রকৃতির একটি বিশেষ গুণ। তাই শিল্পের সাধনা বিভিন্ন যুগের প্রেক্ষিতে বিভিন্নভাবে পাল্টেছে এবং আরো আকর্ষণীয় হয়ে আসছে। প্রাক ইসলামী যুগে শিল্পচর্চার উপর কোন প্রকার বিধি-নিষেধ না থাকায় শিল্পীরা ভাস্কর্য ও চিত্রকলার উৎকর্ষ সাধনে যথেষ্ট প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর ভাস্কর্য ও চিত্রকলার উপর ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা আরোপিত হয়। তাই তখন চিত্র শিল্পীগণ সাধারণভাবে সমাজের চোখে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল না। তবে ইসলাম পূর্ব যুগেও মক্কার পবিত্র কাবাঘরকে ওকাজ মেলার সময় ক্যালিগ্রাফি তথা সুন্দর হস্তাক্ষরে সাজানো হত এবং কবিরা সেখানে প্রাধান্য পেত। এমতাবস্থায় ইসলাম সুন্দর হস্তলিপি ও ক্যালিগ্রাফির অনুমোদন দেয় এবং অনুমোদিত শিল্পচর্চার দিকে শিল্পীরা আকৃষ্ট হয়। ফলে ইসলামের প্রথম যুগ হতেই ক্যালিগ্রাফি শিল্প প্রশংসিত এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগেই প্রচলন হয়ে দৈনন্দিন বিষয়ে লেখার জন্য দ্রুত লিখনের উপযোগী লিপি ব্যবহৃত হয় এবং বিশেষ বা আনুষ্ঠানিক কোন বিষয় লেখার জন্য বিশেষ লিপিশৈলী ব্যবহৃত হয়। আর এই শেষোক্ত লিপি থেকেই পরবর্তীকালে ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব ঘটে। ঘটনাক্রমে প্রথম ধরনের লিপি থেকে পরবর্তীকালে আধুনিক ক্যালিগ্রাফিক স্টাইলের উদ্ভব ঘটে এবং দ্বিতীয়টি থেকে চ্যাপ্টা নিব বিশিষ্ট কলম দ্বারা লেখ্য কুরআনিক ক্যালিগ্রাফির সূত্রপাত ঘটে। ক্যালিগ্রাফি উদ্ভবের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে লিপিকার কর্তৃক লেখার মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতিকে উপস্থাপন করা যায়। মহানবী (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ বাণী লিখে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গৃহীত হয়। আর তাই এ ব্যাপারে সুন্দর হস্তলিখনে উৎসাহিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক লিপির উদ্ভব ঘটে আরব উপদ্বীপের হেজায ও মদীনা থেকে। কুফী হরফে লেখা প্রাথমিক যুগের কুরআন সমূহ ছিল সত্যিই অপরূপ। এগুলো উল্লম্ব ও সুপরিমিত হরফে লিখা যা মনের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত কম সতর্কতার সাথে লেখা লিপির অনেক উর্ধ্বে।[৩১]

আরবী ক্যালিগ্রাফির ক্রমবিকাশ

ইসলামী শিল্পকলা প্রথম বিস্তার লাভ করে মরুময় অঞ্চলে তাবুতে থাকা মানুষদের মধ্যে। তাবুতে বসবাসকারী মানুষের নিকট খুব বেশি আসবাবপত্র থাকে না। কারণ যাযাবর জীবনে একজায়গা হতে অন্য জায়গায় যেতে হলে বেশি জিনিসপত্র নিয়ে চলাফেরা করা খুবই কষ্টকর। আর তাই তাবুতে বসবাসকারী মানুষ প্রধানত তার শিল্পবোধের তৃপ্তি খুঁজেছেন বয়ন শিল্পের মাধ্যমে। তাবুতে তারা গোড়া থেকেই সুন্দর গালিচা বুনতে পেরেছে। এসব গালিচা তাবুর মধ্যে বিছিয়ে পূরণ করতে চেয়েছে তাদের চাদরের অভাব। মরুভূমিতে পানির অভাব থাকায় পানি যোগাড় করে হিসাব করে খরচ করতে না পারলে জীবন চলতোনা। এ প্রয়োজনে মৃৎপাত্র গড়ার দিকেও তাদের ঝোঁক ছিল প্রবল। তারা গালিচা, কাপড় ও মৃৎপাত্রের উপর ফুল, লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশা এঁকেছে। আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তারা প্রাণীর ছবি অঙ্কণ পুরোপুরি বর্জন করে আঙ্গুর লতা-পাতা, ফুল দিয়ে নকশা করে মনের সৌন্দর্যবোধকে প্রকাশ করে তৃপ্তি খুঁজেন।

আর ইসলামী শিল্পকলার বিকাশ লাভ করেছে মরুচারী যাযাবর জীবনের বাস্তবতাকেই কেন্দ্র করেই। আরবরা আঙ্গুর নকশা করত নানাভাবে। চেরাপাতা যুক্ত পাক খাওয়া আঙ্গুর লতা ছিল এদের নকশার বিশেষ উপাদান। পরবর্তী যুগে ইসলামী বিশ্বে নকশাকলা বিশেষ জটিল হয়ে উঠে। ফুল, লতা-পাতা ও জ্যামিতিক আকার আকৃতি দিয়ে করা ইসলামী শিল্পের বেশিষ্টসূচক নকশা সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়। বিভিন্ন ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিল্পকলা।[৩২]

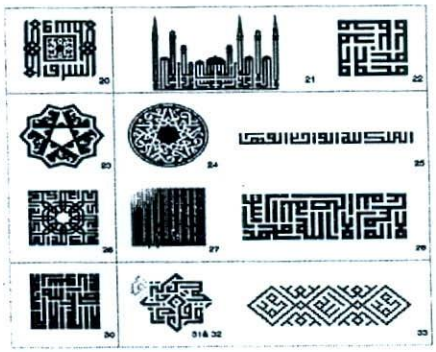

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার চেয়ে আরবী ভাষার হস্তলিখন শিল্পের যে উন্নতি ও বিকাশ সাধিত হয়েছে তার মূলে রয়েছে- প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা এবং আল কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুতকরণের উদ্দীপনা। চিত্রকলাকে ধর্মীয় অনুশাসনের পরিপন্থী ঘোষণা করে মহানবী (সাঃ) সুন্দর হস্তাক্ষরের বিকাশ সাধনে তাঁর অনুসারীদেরকে উৎসাহিত করেছেন। কাজেই শিল্পীগণ তাদের শিল্পকর্মের উৎকর্ষ সাধনের জন্য হস্তলিখনকে আর্ট হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। উপরন্তু আল কুরআনের বহুল পরিমাণে অনুলিপি তৈরীর প্রয়াসে বিভিন্নভাবে আরবী লিখনশিল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। মসজিদ কিংবা প্রাসাদগাত্রে জীবন্ত প্রাণীর প্রতিকৃতি উপস্থাপন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অনভিপ্রেত হওয়ায় শিল্পীগণ আরবী লিখনশিল্পকে অলঙ্করণ বা সাজসজ্জার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। প্রয়োজনের তাগিদে লিপি বিশারদ কর্তৃক এক পদ্ধতি হতে অন্য পদ্ধতি পল্লবিত হয়ে উঠেছে।[৩৩]

আরবী ভাষা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ভাষা হওয়ার ফলে ইসলামের প্রাথমিক যুগ হতেই এর অনুসারীরা আল কুরআন পঠন ও পাঠনের দিকে আত্মনিয়োগ করেন। তারা সুন্দর হস্তাক্ষরে কুরআন লিখন ও সংরক্ষণকে সৎকর্ম হিসেবে মনে করতেন। তখন কলমের সাহায্যে কুরআনের আয়াত ও হাদীস সমূহ সুন্দরভাবে লেখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হত। ফলে শিল্পীরা এ কাজে প্রচুর অনুপ্রেরণা বোধ করতেন। কুরআনের বাণীর সাথে প্রথম দিকে কাতিবগণ ড্রইং এর পরিবর্তে লতাপাতা ও আলপনার ব্যবহার করতেন। পরবর্তীতে কাতিবগণ বাণীকে এমনভাবে লিখতে শুরু করেন যাতে করে হরফ বা হরফ সমষ্টি নিজেই লতাপাতা ও আলপনার রূপ নিতে থাকে। পবিত্র কুরআনের বাণীর প্রচার ও প্রসার লাভের সাথে সাথে ক্যালিগ্রাফি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হয়ে উঠে। কেননা এতে করে কুরআনের বাণীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে পড়ে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আরবকে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির সূতিকাগার বলা যায়। ধর্ম হিসেবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভের পর মুসলমানরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে এবং জনগণকে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। সেই সাথে ইসলামিক ক্যালিগ্রাফিরও বিকাশ ঘটতে থাকে।

বিশেষ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠ সম্পাদনার জন্য এবং বৈদেশিক শাসকবর্গের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য পরস্পরের সাথে চিঠি পত্রের আদান-প্রদান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে স্পষ্ট ও সুন্দর হাতের লেখার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র লেখার জন্য মহানবী (সাঃ) হযরত

Dhaka University Institutional Repository

আলী (রাঃ) কে নিয়োগ করেছিলেন।[৩৪] কারণ হযরত আলী (রাঃ) এর লেখা খুবই সুন্দর ও স্পষ্ট ছিল। আরবী লিপিকলার বিকল্প এটিকে প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মহানবী (সাঃ) বিভিন্ন দেশের শাসকদের নিকট ইসলামের বাণী পৌছানোর উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এসব চিঠি লেখা হয়েছিল শুদ্ধ, সাবলীল এবং অত্যন্ত সুন্দর ও স্পষ্ট অক্ষরে। যেসব শাসকদের নিকট চিঠি পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্যে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস এবং মিসরের শাসক মুকুকাস উল্লেখযোগ্য।

মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রেরিত এসব পত্রের লেখক কে ছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও এরপর থেকে হস্তলিখন শিল্পের পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন ও বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মুকুকাসের নিকট প্রেরিত পত্রের লিপি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, বর্ণমালার একটিকে অপরটি হতে পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যে নোকতা ও স্বরচিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু বর্ণমালায় উল্লম্ব ও লম্ব প্রয়োগ সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে করা হয়েছে। সম্ভবত এসব পত্র কৌণিক লিখন পদ্ধতির আওতায় পড়ে। কাজেই দেখা যায় যে, মহানবী (সাঃ) এর আমল হতে লিপিকলার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে তার অনুসরণ অব্যাহত রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর পর ১৭০৭ সাল পর্যন্ত স্পেনের আন্দালুসিয়া থেকে ভারতবর্ষের পশ্চিম ও বুলগেরিয়ার পূর্বাঞ্চল থেকে ইয়েমেনের উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্ত অবধি মুসলমানরা বীরত্বের সাথে ছড়িয়ে পড়ে।

ইসলাম মক্কায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ অঞ্চলের আওস, খাজরাস ও ছাকিফ গোত্রের মধ্যে আরবী লিপি শিক্ষার ব্যাপারে ব্যাপক আগ্রহ উদ্দীপনা দেখা দেয়। অন্যদিকে মদিনার অধিবাসী যায়েদ ইবনে সাবিত তার লেখনির মাধ্যমে এবং কুরআন একত্রীকরণের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি রাসূল (সাঃ) থেকে ওসমান (রাঃ) পর্যন্ত সবগুলো কুরআন একত্রীকরণ কমিটির সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। রাসূল (সাঃ) ক্যালিগ্রাফি শিল্প এবং শিল্পীদেরকে খুব পছন্দ করতেন এবং এ শিল্প বিকাশে কাজ করেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বদরের যুদ্ধে যে সকল বন্দী মুক্তিপণ দিতে অক্ষম ছিল, তাদের প্রত্যেককে দশজন মুসলমানকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। এ শিক্ষাদানের মধ্যে ক্যালিগ্রাফিও অন্তর্ভূক্ত ছিল। এর মাধ্যমেই ক্যালিগ্রাফির প্রতি রাসূল (সাঃ) এর ভালবাসার গভীরতা নিরূপণ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

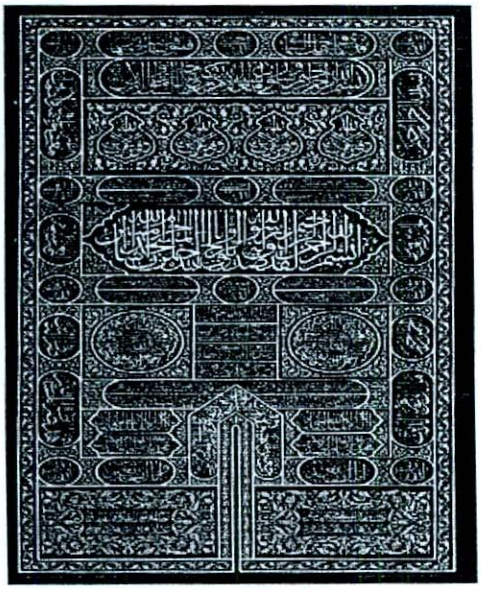

রাসূল (সাঃ) নিজে লিখতে পারতেন না। তাই তার সাহাবীরা আল কুরআনের বাণী পাথর, দেয়ালে কিংবা গাছের ছালে লিখে রাখতেন। যারা এসব আয়াত বা বাণী মনোরম ও সুন্দর করে লিখতেন তারাই ছিলেন কাতিব। রাসূল (সাঃ) এর জামাতা স্বয়ং হযরত আলী (রাঃ)ও একজন ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তিনি কুরআনের আয়াত কে চমৎকার করে লিখে রাখতেন। তিনি বলতেন, সুন্দর হস্তাক্ষর সত্যকে স্বচ্ছ করে তুলে। আল্লাহ নিজে সুন্দর তাই তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। যারা সৌন্দর্যের চর্চা করেন তিনি তাদেরকেও ভালবাসেন। সুতরাং ক্যালিগ্রাফি শিল্পের চর্চার মাধ্যমে যারা সুন্দরকে প্রচার করেন আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ) তাদেরকে পছন্দ করেন। তাই রাসূল (সাঃ) এর সময়ে মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে ক্যালিগ্রাফি ও ক্যালিগ্রাফারদের যথেষ্ট কদর ছিল। মুসলিম শাসকগণ শিল্পীদেরকে আর্থিক সহায়তা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন। অক্ষরকে বিশেষভাবে বিন্যাসের মাধ্যমে সুন্দর ও আকর্ষণীয় রূপ দেওয়া এবং ইসলামী আদর্শকে সামনে রেখেই অতীতে সমগ্র বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে ক্যালিগ্রাফি চর্চা হয়।

রাসূল (সাঃ) এর সময় থেকে আরবী লিপিকলা ধাপে ধাপে দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। উন্নয়নের এ ধারাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. প্রাথমিক যুগ: উমাইয়া খিলাফতের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ৬৬১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত

২. উমাইয়া যুগ: উমাইয়া শাসনামল অর্থাৎ ৬৬১-৭৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত

৩. আব্বাসীয় যুগ: আব্বাসীয় খেলাফত আমল অর্থাৎ ৭৫০-১২৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত

৪. আধুনিক যুগ অর্থাৎ ১২৫০ থেকে অধ্যাবধি

Dhaka University Institutional Repository

১. প্রাথমিক যুগ

মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিলের মাধ্যমে চারুলিপি ও রেখাঙ্কনের ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। মূলতঃ এ গ্রন্থকে কেন্দ্র করেই ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিকাশ লাভ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে। ছাপাখানা আবিষ্কারের পূর্বে হাতে লিখে কুরআন কপি করা হতো। যেহেতু ইসলামী সমাজ, ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র, সবকিছুই কুরআনে আবর্তিত। সুতরাং মুসলিম সভ্যতা আল কুরআনকে সব কিছুর উর্দ্ধে রেখে একে যতভাবে পারা যায় সৌন্দর্য মণ্ডিত করার প্রয়াস চালিয়েছে। তৎকালীন

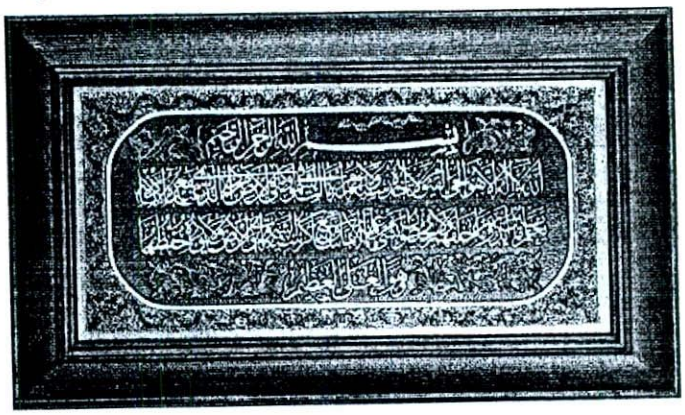

একজন ক্যালিগ্রাফারের অধীনে বহু নকশাকার ও কাতিব নিয়োজিত থাকত কুরআন কপি করার জন্য। ক্যালিগ্রাফার যাকে আরবীতে খাত্তাত বলা হয়। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন যাতে কুরআনের প্রতিটি কপি অনন্য সৌন্দর্যের আকর হয়। প্রতিটি হরফ, আয়াত, সুরার শিরোনাম, হাশিয়া বা পার্শ্বটীকা, বর্ডার অলঙ্করণ সবকিছুতেই ক্যালিগ্রাফার পুঙ্খানুপুঙ্খ নজর দিতেন।[৩৫]

এ বিষয়ে উপমহাদেশের প্রখ্যাত পণ্ডিত ও শিল্প সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন- ইসলামী শিল্পের পুনর্বিকাশ লাভ করে ৮০০ থেকে ১৫০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে। এ শতাব্দী যে দীপ্ত ও ঔজ্জ্বল্য এই আধুনিক সভ্য পৃথিবীর কাছে উপস্থিত করেছে তা পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং পৃথিবীর যে কোন সভ্যতার সাথে বিচার করলে অতুলনীয় বিবেচিত হয়। মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে যখন সংস্কৃতি এবং সভ্যতার একটি আড়ষ্ট সীমাবন্ধন, একটি দুরন্ত নির্জড়তায় পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল তখন ইসলামী সভ্যতা একটি স্বতন্ত্র উন্মুক্ততায় পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে। মূলতঃ মুসলমানদের কারণেই পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ বর্তমানে যা ইউরোপীয় রেনেসাঁ নামে অভিহিত। ইসলামের সংস্পর্শে না এলে তা কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। মুসলমানরা স্পেন বিজয় করার ফলেই ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে নতুন সাড়া পড়েছিল। শিল্প সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। স্থাপত্য শিল্পে রাসূল (সাঃ) এর তৈরী ঐতিহাসিক নিদর্শন মদিনা মসজিদ আজ আধুনিক স্থাপত্যবিদদের নিকট বিস্ময়।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীর আধুনিক স্থাপত্যবিদরা গবেষণা করে মদিনা মসজিদকে আধুনিক স্থাপত্যের মডেল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইসলামের সাথে যেমন অন্যান্য ধর্মের পার্থক্য রয়েছে তেমনি পার্থক্য রয়েছে শিল্প সংস্কৃতিরও।

রাসূল (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ অহী, তার মুখ নিঃসৃত অমর বাণীমালা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকদের নিকট চিঠি প্রেরণ এবং বিশেষতঃ হস্তলিখিত কুরআনের অনুলিপি করণের মাধ্যমেই ক্যালিগ্রাফির বিকাশ লাভ করতে থাকে। কুদরত উল্লাহ খোনসারী আরবী ও ফারসী ভাষার Writing style এর শিকড় খুঁজতে গিয়ে বলেন- It is in the period of prophet Mohammad (SM) the writers of revelation (Wahi) used the Arami or Hamidi or Nabati hand writing. After words from the Arami hand writing a new style of hand wrnting was derived and originated. This was Kufic style of hand writing. For some centuries this was the common and unique written style of Arabic and Persian language. রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফত কালে এ ধারা অব্যাহত থাকে। অতঃপর ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দীওয়ান বা রাজস্ব আদায় ও আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ এবং নামের প্রস্তুত করণের লক্ষে রেজিস্ট্রি বিভাগের গোড়াপত্তন করেন।[৩৬] আর এ কাজ পরিচালনার জন্য কিছু কাতিবের প্রয়োজন হয় ফলে কোন বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ না করেও হস্তলিখন শিল্পের ক্রমোন্নয়ন সাধিত হতে থাকে।

এরপর তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) এর আমলে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আঞ্চলিক পরিভাষার মাধ্যমে পঠিত কুরআনের অনুলিপি সমূহকে বাতিল করে দিয়ে মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রী হযরত হাফসা (রাঃ) এর নিকট সংরক্ষিত বিশুদ্ধ কপি হতে অনুলিপি প্রস্তুত করে সর্বত্র কুরআন শরীফ পৌছানোর ব্যবস্থা করা হয়। আর এ কাজে অনেক ক্যালিগ্রাফারকে নিয়োগ করা হয়। ফলে এ প্রক্রিয়াটি পরোক্ষভাবে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের ধারাবাহিক বিকাশে যথেষ্ট অবদান রাখে। আরবী বর্ণমালায় ক্যালিগ্রাফির স্বর্ণযুগ হচ্ছে- ওসমানীয় সুলতানী আমল। সুলতান রাজদরবারে ক্যালিগ্রাফারদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তৎকালীন সীলমোহর, মনোগ্রাম, দলীল-

Dhaka University Institutional Repository

দস্তাবেজ, রাজকীয় ফরমান, রাষ্ট্রীয়পত্র, নথিপত্র, স্থাপত্য বিষয়ক অলঙ্করণ যেমন- মসজিদ, রাজপ্রাসাদ, তোষাখানা প্রভৃতির দেওয়াল গাত্রে, কাঠের দরজায়, আসবাবে যেমন- সিন্দুকে আলমারীতে কিংবা সুসজ্জিত আসনে রুচিশীল নকশার সাথে নামাঙ্করণের ক্ষেত্রে কোন মুল্যবান বাণী লিপিবদ্ধ করার জন্য ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করা হত। প্রাচীন শিলালিপিতে আমরা সেই ক্যালিগ্রাফিই দেখতে পাই।

খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) নিঃসন্দেহে খ্যাতনামা ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তিনি হাতের লেখার কৌশল শিখতে গিয়ে বলেন- তোমরা কলমের জিলফা প্রসারিত কর এবং মোটা থেকে তির্যকভাবে মাথার দিকে ক্রমে চিকন করে কেটে দাও, যাতে সঠিক সমানুপাত ও খাঁড়া আলিফ হয়। তিনি সেমেটিক লিপিকে আরবী লিপিতে সফল রূপান্তর করেন এবং এতে শিল্পমানে উন্নীত করেন। এভাবে আরবী লিপি সেমেটিক লিপি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক লিপিতে রূপ লাভ করে।[৩৭] ওসমানীয় সম্রাজ্যে কুরআনের ক্যালিগ্রাফির জন্য খ্যাতি অর্জন করেন- আল হাফি ওসমান ও মোস্তফা রাফিস প্রমূখ ক্যালিগ্রাফারগণ। তারা চমৎকার আলিফ ও আইন হরফের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, হযরত ওমর (রাঃ) এর আমলে বাইজেন্তীয় ও সাসানীয় সাম্রাজ্য বিজয়ের ফলে সিরিয়া ও পারস্যে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন আরবের বাইরে ইসলাম বিস্তৃত এবং মুসলিম শাসন সু-প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রশাসন কাঠামোতে সে দেশীয় ভাষা বহাল রাখা হয়েছিল। ফলে আরবী বর্ণবিকাশে এবং ভাষার উন্নয়নে আর তেমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

২. উমাইয়া যুগ

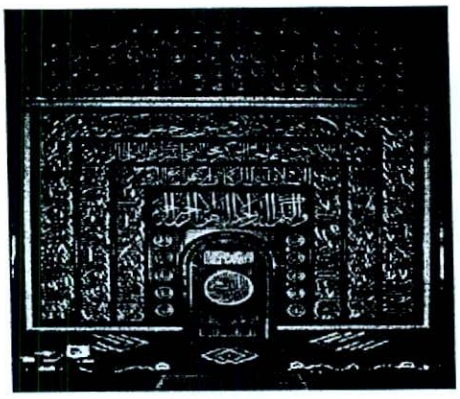

উমাইয়া শাসনামলে আরবী ভাষা ও ক্যালিগ্রাফি শিল্পের আরো উন্নয়ন সাধিত হয়। এ যুগে খ্যাতনামা ক্যালিগ্রাফারগণের কঠোর সাধনা, গবেষণা ও অধ্যাবসায়ী অনুশীলনের ফলে আরবী ক্যালিগ্রাফি শিল্প হিসেবে একটি মানসম্পন্ন পর্যায়ে পৌঁছে। বাস্তবিক পক্ষে উমাইয়া যুগে কুফী রীতির উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ যুগে হযরত আলী (রাঃ) এর সুযোগ্য অনুসারী আবুল আসওয়াদ আদ দুয়াইলী (রহঃ) কুফী লিপিরীতির উন্নতি সাধন করেন। তারপর প্রথিতযশা লিপিকার

Dhaka University Institutional Repository

কুতবা আল মুহাররির কুফীরীতির চারটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। অতপর এ যুগে যারা এ বিষয়ে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন তাদের মধ্যে খালেদ ইবনে হিয়াজ (রাঃ) ছিলেন যুগের সর্বশেষ্ঠ লিপিকার। রাসূল (সাঃ) এর মসজিদে সোনালী শিলালিপি তারই শৈল্পিক দক্ষতার পরিচায়ক। তিনিই সর্বপ্রথম সোনালী হরফে কুরআন শরীফের অনুলিপি তৈরী করেছেন। এ যুগে আরো যারা বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে মালেক ইবনে দিনার, রাশিদ আল বাসরী ও মাহদী আল কুফী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উমাইয়া যুগে দামেস্ক হতে ১০৯ মাইল দূরত্ব নির্দেশক মাইলস্টোনে যে লিপি কুফিক স্টাইলে উৎকীর্ণ তা উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের রাজত্বকালে করা হয়েছে।[৩৮]

আরবী ভাষা ও ক্যালিগ্রাফির বিকাশের ক্ষেত্রে খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করতে গিয়ে আরবীয় করণনীতি অনুসরণ করেন। একমাত্র আরবীকেই রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দান করে তিনি প্রশাসন কাঠামোর সর্বস্তরে আরবী ভাষা চালু করেন।[৩৯] বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা, যথা-সিরীয়, কপ্তীয় ও পাহলভী ভাষার চর্চা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রের কবলে পড়ে স্তিমিত হয়ে পড়ে। ফলে সরকারি চাকুরীতে যোগদান এবং রাষ্ট্রীয় অনুকম্পা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মানুষ আরবী ভাষা আয়ত্ত করে। এমনকি ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়ার কারণে মিসর, সিরিয়া ও ইরাকে জনজীবনের সর্বস্তরে আরবী ভাষা একমাত্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃত ও গৃহীত হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা মাতৃভাষা হিসেবে রূপান্তরিত হয়। আব্দুল মালিকের এ আরবীয়করণ নীতি আরবী ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। তাছাড়া তিনি সার্বজনীন ও আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদায় উন্নীত করার প্রয়াসে বিশেষ কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যথা-

১. অনারবদের নিকট আরবী ভাষা সহজবোধ্য করার জন্য বর্ণমালায় নোকতা ও স্বরচিহ্নের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।

২. ভাষাকে গতিশীল ও সাবলীল করার লক্ষ্যে ব্যাকরণের নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়।

৩. হস্তলিখন শিল্পের সরলীকরণ রীতি গৃহীত হয়।

এভাবে প্রশাসনে আরবী করণের নীতি বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে আরবীতে লেখার কাজের পরিধি বেড়ে যায়। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই হস্তলিখন শিল্পে সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে তার

Dhaka University Institutional Repository

উন্নতি আরো ত্বরান্বিত হয়। আব্দুল মালিকের এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পরামর্শ ও সুচিন্তিত মতামত বিশেষভাবে গৃহীত হয়।

আরবী বর্ণমালার বিকাশ, ভাষার মান উন্নতকরণ এবং হস্তশিল্পের গতিশীলতা নিশ্চিত করতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে আরবী ভাষাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আকরে পরিণত হয়েছিল। সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ রাখার উদ্দেশ্যে চিঠি-পত্র আদান-প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। ফলে হস্তলিখন শিল্পকে অধিক গতিশীল করার প্রয়াসে সহজতর পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। দ্রুতগতিতে লেখার জন্য লিপি শিল্পীদেরকে উৎসাহিত করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কৌণিক লিখন পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করা হয়। প্রাপ্ত উপকরণাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হস্তলিখন শিল্প উদ্ভাবনের কৃতিত্ব আরব মুসলমানদেরই প্রাপ্য। উমাইয়া যুগ (৭৫০ খৃঃ) পর্যন্ত আরব লিপি শিল্পীদের দ্বারা কৌণিক লিখন পদ্ধতির বিকাশ সাধিত হয়। এ যুগেই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্রুতগতিতে লেখার কাজ চালানোর জন্য কৌণিক লিখন পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে কিছুটা গোলায়িত পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

উমাইয়া খলিফাদের শাসনামলে এতদসংশ্লিষ্ট আরেকটি লিপির উদ্ভব ঘটে যা এতটাই নিবিড়ভাবে লেখা হয় যে, যা খুবই সুক্ষ্ম এবং লিখতে জায়গা কম লাগে। এ লিপিটির সঠিক নাম জানা যায় না। তবে সাধারণত 'মাশক' নামে আখ্যায়িত করা হয়। বাহরাইনের 'বাইতুল কুরআন' মিউজিয়ামে এর একটি চমৎকার নিদর্শন মওজুদ রয়েছে। বিভিন্ন দলিল-পত্রাদি দ্বারা জানা যায়, ঐ সময় আল কুরআন ব্যতীত অন্যান্য বিষয় বস্তুর লেখা ও লিপিকারগণ আরো বিভিন্ন ধরনের লিপি ব্যবহার করতেন। এ যুগে প্রথম বারের মত লেখার নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিপক্ক ক্যালিগ্রাফিতে উত্তরণের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। বায়তুল মুকাদ্দাসের 'কুব্বাতুছ ছাখরাহ' মসজিদের চতুর্দিক ঘিরে খোদাই করে লেখা কুরআন মজিদের আয়াতগুলো হিজরী প্রথম শতাব্দীর ক্যালিগ্রাফির নিদর্শন হিসেবে এখনও টিকে আছে। বস্তুত এসব ক্যালিগ্রাফি ছিল শিল্পকলার জগতে এক নতুন উদ্ভাবন। মোজাইক টাইলসের উপর করা এ ক্যালিগ্রাফি গুলো পুরোপুরি পঠনোপযোগী এবং কুরআন মজিদের আয়াতের সর্বপ্রথম শিল্পসম্মত বড় আকারের ক্যালিগ্রাফি। ইসলামের ইতিহাসের এক শতাব্দীকাল পূর্ণ না হতেই হিজরী সপ্তম দশকে এ ধরনের চমৎকার ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম তৈরী নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর একটি ব্যাপার। আর এভাবে গম্বুজের

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্দিকে ঘিরে ক্যালিগ্রাফির ধারণা ছিল এমন একটি কালোত্তীর্ণ শৈল্পিক ধারণা যে, কিছুটা নতুনত্ব সহকারে হলেও আজও তা মসজিদ অলঙ্করণের ক্ষেত্রে সর্বত্র অনুসৃত হচ্ছে।

উমাইয়া যুগের শেষ দিকের ও আব্বাসী যুগের প্রথম দিকের ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের সম্বন্ধে কিছুটা তথ্য পাওয়া যায়। আর ঐ সময়ের ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের অন্যতম ছিলেন আয যাহ্হাক ইবনে আযলান ও ইউসুফ ইবনে হাম্মাদ। আরবী সাহিত্যের সূত্রসমূহ থেকে তাদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। তবে চিহ্নিত করে বলা যায় না যে কোনটি কার শিল্পকর্ম। কারণ কোন শিল্পকর্মে তাদের নাম বা স্বাক্ষর পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তখনকার সময় ক্যালিগ্রাফাররা মূলত ধর্মীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করতেন ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ বা নিজের নাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়। তারা যেহেতু তাদের শিল্পকর্মে নিজেদের নাম বা স্বাক্ষর দেননি তাই কোন শিল্পকর্ম কার তা চিহ্নিত করা যায় না তবে তাদের ক্যালিগ্রাফি কেমন ছিল সে সম্পর্কে তৎকালীন ক্যালিগ্রাফি নিদর্শনাদি দৃষ্টে মোটামুটি কিছু ধারণা করা যায়।

উমাইয়া শাসনামলে (৬৬১-৭৫০ খৃঃ) ক্যালিগ্রাফির উন্নয়নের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি। আব্বাসীয় খলিফাগণ (৭৫০-১২৫৮ খৃঃ) উমাইয়া শাসনামলের সকল প্রমাণাদি নষ্ট করে ফেলেছিল। তথাপিও যতদূর সম্ভব 'কুতবা আল মুহাররির' এর মাধ্যমে কিছুটা জানা যায়। পাশাপাশি আরব সূত্র থেকেও কিছু জানা যায়। তিনি তুমার জালিল, নিমক, সুলস এবং সুলুসাইন লিপির উদ্ভাবক। তিনি উমাইয়া খেলাফত আমলের ক্যালিগ্রাফারদের একটি দীর্ঘ তালিকাও দিয়েছেন। উমাইয়া শাসনামলে মূলত Cursive তথা গোলায়িত ধারার উন্নয়ন ঘটে। এছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন হচ্ছে তাশকীলের প্রয়োগ। এ যুগে খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফার হিসেবে আবুল আসওয়াদ আদ দুয়াইলী (মৃত্যু-৬৮৮ খৃঃ), ইবনে আসীম (মৃত্যু-৭০৭ খৃঃ), হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আল সাকাফী (৬৯৪-৭১৪ খৃঃ), হাসান আল বসরী (মৃঃ ৭২৯ খৃঃ) প্রমুখ বিখ্যাত ছিলেন। ক্যালিগ্রাফির উন্নয়নে তাদের অবদান ছিল অবিস্মরণীয়।[৪০]

৩. আব্বাসীয় যুগ

আরবী ক্যালিগ্রাফির বিকাশে আব্বাসীয় আমলকে তৃতীয় পর্যায় হিসেবে গণ্য করা হয়। এ যুগ (৭৫০-১২৫৮ খৃঃ) ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ। এ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় আরবী লিপিরও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ যুগে প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ খলীল ইবনে আহমদ (মৃত্যু-৭৮৬ খৃঃ) এর

Dhaka University Institutional Repository

ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কুফী লিপিশৈলীর উৎকর্ষতার চরমশিখরে পৌছে। এ যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে সিরিয়ার দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তি লিপিশাস্ত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। তারা হলেন-

১. দাহহাক বিন আযলান- আস সাফ্ফা এর আমলে

২. ইসহাক বিন হাম্মাদ- খলিফা আল মানসুর ও মাহদীর আমলে [৪১]

আগের চেয়ে সরকারি কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এ আমলের শাসকগণ লিখনশিল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টিদান করেন। এ যুগে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে লিপিকলা পবিত্র কুরআন শরীফের আররী লিপি প্রকরণের ফলে ধর্মীয় ও সম্মানজনক শিল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া লিপিকলা অলঙ্করণ শিল্পের উপাদান হিসেবে স্থাপত্য, শিলালিপি, মুদ্রালিপি, পাণ্ডুলিপি, মৃৎপাত্র, বয়নশিল্প, ধাতবপাত্র, ফুলদানি, মোমাধার, ধোপদানি, কাঠ ও হাতির দাঁতের কাসকেট ইত্যাদিতে শিল্পের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বিদ্যমান। এভাবে এ সময় শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডল সম্প্রসারিত হতে থাকে। খলিফা আল মানসুরের 'দারুত তরজমা' এবং খলিফা আল মামুনের 'বায়তুল হিকমাহ' ব্যাপকভাবে বিদেশী ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি আরবীতে অনুবাদ করার কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং ব্যাপক পরিমাণে অনুলিপি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য হস্তলিখনে পারদর্শী শিল্পীদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাছাড়া জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক মৌলিক গ্রন্থাদি রচিত হতে থাকে। যেসব গ্রন্থের বহুল পরিমাণে পাণ্ডুলিপি অনুলিপি তৈরী করার জন্যও অনেক ক্যালিগ্রাফার নিয়োগ দিতে হয়।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লিখন শিল্পের গতি সম্প্রসারিত হতে থাকে এবং বিভিন্ন প্রকারের লিপি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। খৃস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। এ সময় থেকে এমন সব নব নব ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হয় যা ক্যালিগ্রাফি শিল্পের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ ব্যাপারে ইয়াসির তাব্বা রচিত এতদ্বিষয়ক গ্রন্থ থেকে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত ধারণা লাভ করা যায়। তখন বাগদাদ ছিল ইসলামী ক্যালিগ্রাফি উৎপাদনের বিরাট কারখানা স্বরূপ। সুদীর্ঘ ৫০০ বছর যাবত বাগদাদ ছিল আব্বাসীয় খলিফাদের রাজধানী। এসময় বাগদাদে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চারুকলা হিসেবে সুসংহত হয় এবং এ শিল্পের অনেক উস্তাদ শিল্পীর

Dhaka University Institutional Repository

আবির্ভাব ঘটে ও তাদের নিকট অসংখ্য শিক্ষার্থী উস্তাদদের অনুসারী হিসেবে তাদের প্রবর্তিত শিল্পরীতিকে এগিয়ে নেন। ফলে নতুন নতুন রীতির উদ্ভব ঘটতে থাকে এবং তা অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল পুরনো রীতিসমূহের উপর প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। এসব পরিবর্তন সাধারণত তিনটি পর্যায়ে সংঘটিত হয়। যথা-

প্রথমতঃ রাজনীতিবিদ, কবি ও ক্যালিগ্রাফি শিল্পী আবু আলী ইবনে মুকলা[৪২] (মৃত্যু- ৯৪০ খৃঃ) এবং তার ভাই আলেম ও ক্যালিগ্রাফি শিল্পী আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মুকলার (মৃত্যু-৯৪৯ খৃঃ) অবদান। এ ভ্রাতা শিল্পীদ্বয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে ক্যালিগ্রাফি ফর্মে অনুপাত বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি প্রদান করা যা লিপিকে পুনরাবৃত্তির উপযোগী করে তুলে এবং পঠনে অধিক সহজবোধ্য ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। যদিও এ ভ্রাতৃদ্বয় এ রীতি গড়ে তুলতে পুরোপুরি সফল হননি তথাপিও অনুপাত ভিত্তিক লিখনের বিষয়টি শুধুমাত্র তাদের দু'জনের সাথেই সম্পৃক্ত। এ ছাড়াও ক্যালিগ্রাফির জন্য গৃহীত ও সর্বজন স্বীকৃত 'আকলামুস সিত্তাহ' তথা মুহাক্কাক, রায়হানী, সুলুস, তাওকী, রিকা ও নাসখ এ ছয়টি লিপিশৈলী নির্বাচনও তাদের অবদান। যা পরবর্তীকালে ক্যালিগ্রাফির উন্নয়নে এ লিপিশৈলী গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থায়ী ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়।[৪৩]

দ্বিতীয়তঃ আব্বাসী আমলের প্রথম দিকের দু'জন ক্যালিগ্রাফার ছিলেন সিরীয় বংশোদ্ভুত আল দাহহাক ইবনে আযলান এবং ইসহাক ইবনে হাম্মাদ। শিল্পসম্মত উপস্থাপন এবং দক্ষ হাতের ক্যালিগ্রাফির জন্য তারা দু'জন সুপরিচিত ছিলেন। এর মধ্যে ইসহাক তাঁর হরফের তীক্ষ্ণতা ও স্পষ্ট লাইনের জন্য সুলুস লিপিতে বেশি নাম করেছিলেন। তিনি সুলস ও সুলুসাইন লিপিকে জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত করেছিলেন। তাঁর ছাত্র ইউসুফ আল সিজ্জী (মৃত্যু-৮২৫ খৃঃ) এ লিপির দু'টি নতুন ধারার উদ্ভাবন করেন। যাকে 'খফিফ আল সুলুস' এবং 'খফিফ আল সুলুসাইন' বলা হয়। তিনি জালিল লিপিরও সংস্কার করেন। এর লাইনের প্রশস্ততাকে মসৃণ এবং গোলায়িত অংশকে আরো সুন্দর করেন এবং বড় মাথাওয়ালা হরফকে একটু ডিম্বাকৃতি করে দেন। ফলে এটি একটি আকর্ষণীয় লিপিতে পরিণত হয় এবং এটি দ্রুত খলিফা আল মানসুরের (৮১৩-৮৩৩ খৃঃ) উজির ফাদল ইবনে সাহল এর নজর কাড়ে। তিনি এ লিপিকে সরকারি অফিসে ব্যবহারের নির্দেশ দেন এবং এর নাম দেন 'রিয়াসী' বা কার্যনির্বাহী।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়তঃ ইউসুফ আল সিজ্জীর ভাই ইবরাহীম আল সিজ্জীও (মৃত্যু-৮১৫ খৃঃ) একজন খ্যাতিমান ও বহুগুণ সম্পন্ন ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তিনি স্বীয় দক্ষতাকে বিশিষ্ট ক্যালিগ্রাফার ও তার প্রিয় ছাত্র আল আহওয়াল আল মুহাররিরকে দান করেছিলেন। আল আহওয়াল আল মুহারবির অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি রিয়াসী লিপিকে সংস্কার ও উপযোগী করে বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহার করেছেন। তার এ লিপিবৈচিত্রে গদ্য রচনা, কাব্য সংকলন, নিবন্ধ ও ধর্মীয়গ্রন্থ এমনকি কবুতর ডাকবার্তায় এক নতুন আবহ তৈরী করে। ফলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কারসিভ বা গোলায়িত ধারায় কয়েকটি নতুন শৈলীর আবির্ভাব ঘটে। অবশেষে এ শৈলীগুলো ছয়টি মূল ধারায় রূপান্তরিত হয়। যাকে 'আল আকলাম আস সিত্তাহ' বা সিত্ত কালাম অর্থাৎ ছয়টি কলম বা লিপিশৈলী নামে অভিহিত করা হয়।[৪৪]

আব্বাসীয় শাসনামলের সবচেয়ে কীর্তিমান ক্যালিগ্রাফার হচ্ছেন ইবনে মুকলা (মৃত্যু-৯৪০ খৃঃ)। তিনি আল আহওয়াল আল মুহাররিরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ইসলামী ক্যালিগ্রাফিতে চূড়ান্ত রূপ দান করেন। তার পরবর্তীকালের বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার হলেন আলী ইবনে হেলাল (মৃত্যু-১০২২ খৃঃ)। যিনি ইবনুল বাওয়াব নামে পরিচিত। তিনি ক্যালিগ্রাফি শিল্পে সৌন্দর্য বর্ধন করেন এবং ইবনে মুকলা ভ্রাতৃদ্বয়ের শিল্পরীতিতে অধিকতর পরিমার্জিত করেন। তাছাড়া 'আল মানসুব আল ফায়িক' বা স্বচ্ছন্দ মানসুব নামে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ অভ্যন্তরীণ চিত্রকর (Interior Painter)। তিনি পবিত্র কুরআন মজিদের ৬৪টি কপি নিজ হস্তে কপি করেছিলেন। এছাড়া তিনি শিক্ষার্থীদেরকে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের উন্নততর পদ্ধতি শিক্ষাদান, উদ্ভাবিত পদ্ধতিকে পূর্ণতাদান ও ব্যাপক প্রচলন করেন। তার লেখা ৬৪টি কপি কুরআন শরীফের মধ্যে নাসখ মতান্তরে রায়হানী লিপিতে লিখিত এক কপি কুরআন শরীফ ব্যাবিলনের চেষ্টার বিট্টী সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। এ আমলের আরেকজন কীর্তিমান ক্যালিগ্রাফার হচ্ছেন মাসুদ ইবনে মুহাম্মদ আল কাতিব আল ইস্পাহানী। যিনি মুহাক্কাক লিপিতে কুরআন শরীফ লিখেন।

আব্বাসীয় আমলের শেষ দিকের সবচেয়ে খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফার ছিলেন ইয়াকুত আল মুস্তাসিমী[৪৫] (মৃত্যু-১২৯৮ খৃঃ)। তাঁর পূর্ণনাম ইয়াকুত ইবনু আব্দুল্লাহ আল মুস্তাসিমী। তিনি রোমীয় বংশোদ্ভুত ছিলেন। খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহ তাকে ছোট বেলায় ক্রয় করে নিয়ে লালন পালন করেছিলেন বলে তাকে 'আল মুস্তাসিমী' বলা হয়। তিনি ইবনুল বাওয়াবের[৪৬] ঐতিহ্যিক ধারাকে আরও শাণিত করেন এবং ছয়টি

Dhaka University Institutional Repository

স্টাইলেরই পরিপূর্ণতা দান করেন। তিনি কলমের মাথাকে তীর্যকভাবে কাটেন এবং নতুন লেখা ও নতুন পদ্ধতিতে বিন্যাস করেন। তাই তাকে 'ক্যালিগ্রাফির আদর্শ' উপাধি দেওয়া হয়।[৪৭] অতীতকাল থেকেই ক্যালিগ্রাফি শিল্প যেমন একদিকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে অন্যদিকে একে কেন্দ্র করে অনেক কুটির শিল্পও গড়ে উঠেছে। ইয়াকুতের সময় থেকে মোটামুটি ১৪০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ক্যালিগ্রাফি শিল্পের পরিপক্কতা অব্যাহত থাকে। তবে এ সময় বড় ধরনের কোন অগ্রগতি না হলেও ইরানের নাসতা'লিক লিপির উদ্ভব হয়েছে। এটি ক্যালিগ্রাফি শিল্পের জগতে উদ্ভাবিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চমৎকার লিপি সমূহের অন্যতম। ফলে তৎকালে এ লিপিটির ব্যাপক বিস্তার লাভ করে।

তৎকালীন ইসলামী জাহানের কেন্দ্রীয় এলাকা ছাড়াও অন্যান্য এলাকায় বিচিত্র ধরণের ঐতিহ্যসহ এর উদ্ভব ঘটে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ও একক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রীতি ছিল উত্তর আফ্রিকান, আন্দালুসীয় ও পশ্চিম আফগানিস্তান রীতি। যা মূলত অনেকগুলো রীতির সমষ্টি। এগুলোর নাম বেশ জটিল হওয়ায় এগুলোকে 'মাগরিবী' রীতি নামেও অভিহিত করা হয়। যাতে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্রলিপি অন্তর্ভূক্ত আছে। সাধারণত ভোতা ডগা বিশিষ্ট কলম এবং বাদামী রংয়ের কালি দ্বারা এসব লিপি লেখা হয়। এছাড়া চীনা মুসলমানরাও ক্যালিগ্রাফির ক্ষেত্রে একটি নিজস্ব লিপিশৈলী উদ্ভাবন করেন যা মূলধারা থেকে স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে কলমের পরিবর্তে ব্রাশ ব্যবহার করা হয়। যা একটি জীবন্ত ঐতিহ্য হিসেবে আজও টিকে আছে। ১৩৮০ খৃস্টাব্দের দিকে 'সেইহ হামদুল্লাহ' নামক আনাতোলিয়ার একজন ক্যালিগ্রাফি শিল্পী এ শিল্পের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং মাত্র দু'বছরের মধ্যে এ কাজ সম্পাদন করেন।

৪. আধুনিক যুগ

উনবিংশ শতাব্দী থেকে আধুনিক যুগ শুরু হয়। এ শতাব্দীর শুরু হতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশের দশক পর্যন্ত সময়কালটি হচ্ছে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের পরিপূর্ণতা অর্জনের যুগ। এ সময় এমন সব শিল্পকর্ম তৈরী হয় যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল শিল্পকর্মকে ম্লান করে দেয়। এসব শিল্পকর্ম ক্যালিগ্রাফি শিল্পের জন্য একটি স্থায়ী মানদণ্ড স্থাপনে সক্ষম হয়। বিশেষ করে তুর্কী খেলাফতের অবসানের পর থেকে এর পুনরুজ্জীবন ঘটেছে প্রথমত আরব জাতীয়তাবাদের বহুধা বিভক্ত অঙ্গনে। আর তারই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ঘটেছে বিমূর্ত চিত্রাঙ্কনের পটভূমিকায় অক্ষর সৌন্দর্য বা কালিমার মহিমা আরোপের স্বার্থক সমন্বয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমে লেবাননের শিল্পীরা এবং পরবর্তীকালে জর্দান, মিশর, ইয়েমেন, ওমান, আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, এসব দেশের প্রতিভাবান কোন কোন শিল্পী এভাবেই আরবী রেখালিপির ট্রাডিশনকে পুনরুজ্জীবিত করার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লিপ্ত। আধ্যাত্মবোধের চেয়ে ঐতিহ্য চেতনাই তাদের উপজীব্য বলে অনেকেই মনে করেন। বিশেষত ইরানে আধুনিক ইসলামী ক্যালিগ্রাফি ঐতিহ্যগত শুদ্ধতা অনেক বেশি রেখেছে বলে অনেকেই মনে করেন।[৪৮]

ক্যালিগ্রাফি শিল্প বিষয়ক তুর্কী বিশেষজ্ঞ মরহুম মাহমুদ ইয়াযীর মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু আরবরাই নয় বরং তুর্কী, ইরানী, মিসরীয়, তিউনিসীয়, আলজেরীয়, মরক্কোন, আন্দালুসীয়, আফগান, মধ্য এশীয়, ভারতীয়, জাভানীজ, কুর্দী, লায, বুলগেরীয়, পোমাক, বসনীয়, আলবেনীয় ও সির্কাসীয় নির্বিশেষে সকল মুসলিম জাতির লোকেরাই ক্যালিগ্রাফি শিল্প তৈরী করেছেন। এসব জাতি ছাড়াও আরো অনেক জাতির মধ্যে এমন অসংখ্য মহান অলঙ্করণ শিল্পী, চিত্র শিল্পী, ধর্মীয় পণ্ডিত, দার্শনিক, কবি, বাদক, গায়ক, চিকিৎসক, শাসক, পীর, মাশায়েখ, ধর্মতাত্ত্বিক, বিচারক, মুফতী, পরামর্শক, সরকারের মন্ত্রী, পাশা, জেনারেল, শাহ ও সম্রাটের উদ্ভব ঘটে। যাদের সকলেই তাদের ক্যালিগ্রাফিক মাস্টার পিসের জন্যে তাদের গোটা জীবন ব্যয় করেছেন ও দৃষ্টিশক্তি ধ্বংস করেছেন। তিনি পরোক্ষভাবে এ মহান কর্মে ইস্ড়াম্বুলের অবস্থানের কথা উলে- খ করে বলেন- ইস্তাম্বুল নগরী শুধু তুর্কী শিল্পীদের বা ইসলামী জাহানেরই নয় বরং সমগ্র মানব জাতির সুন্দর ক্যালিগ্রাফি সমূহের প্রদর্শনী কেন্দ্রে পরিণত হয়। এটি নান্দনিকতার এক গৌরবময় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।[৪৯]

শিল্পকলার অন্যান্য শাখার মত হস্তশিল্প স্পেনে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। তাদের সর্বোৎকৃষ্ট স্থাপত্য ও অলঙ্করণ শিল্পের নিদর্শন হচ্ছে- আল হামরা প্রাসাদ। ধ্বংসাবস্থায়ও পৃথিবীতে যার কোন তুলনা নেই। জে স্টাইগসকি বলেন- শিল্পকলার ইতিহাসে এর মর্যাদা অপরিসীম। আল হামরা অদ্বিতীয় অতি সুক্ষ্ম কারুকার্য, জটিল খোদাই কাজ এবং অতি উজ্জ্বল মোজাইকের সঙ্গে মনোরম ও আকর্ষণীয় কুফী ও অন্যান্য লিপি স্টাইলের সংমিশ্রণে অলঙ্করণ এক অভিনব রূপ ধারণ করেছে।[৫০] লিপিমালা জ্যামিতিক নক্সার পেঁচান ব্যান্ডের সাথে এমন দক্ষতায় খোদাই করা হয়েছে যে, দর্শকদের নজরে রং-বেরংয়ের ধাঁধার সৃষ্টি করে। হরফগুলো পরস্পরকে জড়িয়ে এমন সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে যে, মনে হবে একটি ফোয়ারা হতে পানি নির্গত হচ্ছে। আরবী লিপিমালার খুব ঘন ঘন ও ঝুলন্ড় লতাপাতা এবং ছোট

Dhaka University Institutional Repository

ডালপালা দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা মুরদের শাসনামলে স্পেনে উৎকর্ষতার সর্ব্বোচ শিখরে আরোহন করেছিল। খিলনাকৃতি কুলুম্বিতে যে কলম আছে তাতেও শিলালিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। এরূপ একটি শিলালিপিতে লেখা আছে, 'এ জলধারাটি তুলনাবিহীন। মহান আল্লাহর ইচ্ছা এরূপ যে, অসাধারণ সৌন্দর্যে এটি অপরাপর সবকিছুকে অতিক্রম করে।' আল-হামরার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- কুলুঙ্গিতে স্থাপিত এবং লিপিমালা দ্বারা সুশোভিত কলামের চতুষ্পার্শ্বে এক সময় উৎকীর্ণ ছিল, 'আল্লাহ ব্যতীত অপর কেহ পরাক্রমশালী নয়।'

বর্তমান বিশ্বে যারা ক্যালিগ্রাফি চর্চা করছেন, তাদের প্রায় প্রত্যেকের কাজেই নিজ ধারা সৃষ্টির প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। এদের মধ্যে- আলজেরিয়ার রশিদ কোরেশী, জর্ডানের রফিক লোহান, প্যালেস্টাইনের ইয়াসির ডুইক, ইরানের এম এহসারী, আরমাফি, কাতারের আলী হাসান আল জাবের, ওমানের মুহাম্মদ বিন ফাদেল বিন সাঈদ আল হাসনী, সিরিয়ার আব্দুল লতিফ আল স্মৌদ এবং মালয়েশিয়ার পনিবিন আমিরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে রশিদ কোরেশী তার ক্যালিগ্রাফি প্রিন্টের জন্য সমগ্র বিশ্বে সুনাম অর্জন করেন। রশিদ কোরেশী সহ উল্লিখিত প্রত্যেক শিল্পীই আরবী লিপির সাহায্যে ক্যালিগ্রাফি চিত্র নির্মাণ এবং বিভিন্নভাবে বর্ণবিন্যাসের মাধ্যমে নিজ স্টাইল সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে যে সমস্ত ক্যালিগ্রাফি চিত্র নির্মিত হয়েছে তার সবই প্রায় আরবী হরফে।[৫১] এজন্য অঁরি মাতিস, পলক্লী, পাবলো পিকাসো, পিয়েত মন্ড্রিয়ানের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত কালজয়ী শিল্পীরা মুসলিম লিপিশৈলীর রং রেখার দ্যোতনায় আত্মস্থ হয়ে পাশ্চাত্যের শিল্পকলার আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।[৫২]

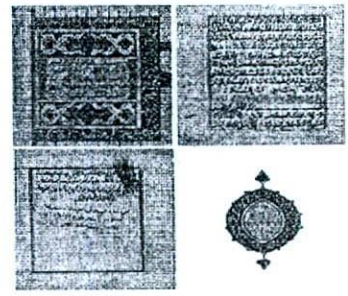

১৯৪৭ সালের পূর্বে বাংলাদেশে যে শিল্পধারার সন্ধান পাওয়া যায় তার বেশির ভাগই ইসলামী শিল্পকলার অন্তর্ভূক্ত। যেমন- রেহেল, শেরওয়ানী, কার্পেট ক্যালিগ্রাফি, মসজিদ গাত্রের অলঙ্করণ এবং ঈদ ও মহররম সংক্রান্ত চিত্রাবলী। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত ঢাকার বেচারাম দেউরীর মীর্জা গোলাম হোসেনের পুত্র মীর্জা বাহাদুর হোসেন অঙ্কিত ক্যালিগ্রাফি চিত্র নুসরত জং (১৭৯৬-১৮২৩ খৃঃ) এর পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পী আলম মুসাসহ আরো কয়েকজনের অঙ্কিত ঈদ ও মহররমের মিছিল সংক্রান্ত

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রাবলী এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যিনি শিল্প শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করেছেন[৫৩] তিনি হচ্ছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। যদিও তার শিল্পকর্মগুলো ইসলামী ভাবধরার সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির কর্মীগণ ষাটের দশকে বাংলায় ক্যালিগ্রাফি করা যায় কি না সে বিষয়ে পরীক্ষামূলক উদ্যোগ নেন। আবুল কালাম শামসুদ্দিন, মুজিবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, আখতারুল আলম, হেমায়েত হোসেন প্রমুখ এ সংগঠনে জড়িত ছিলেন। তাদের উৎসাহে শিল্পী আব্দুর রউফ রেনেসাঁ সোসাইটির রেনেসাঁ অংশটি ক্যালিগ্রাফি করে ষাটের দশকে অনেক কৌতুহল সৃষ্টি করেন।[৫৪] পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক শিল্পী সাদেকীন তার ছবির উপাদান নিয়েছেন ইসলামী ক্যালিগ্রাফি থেকে। অথচ আশ্চার্যের বিষয় হলো- একই সময় বাঙালী শিল্পীগণ প্রায় সজ্ঞানে ধর্ম উল্লেখ বর্জন করেছেন।[৫৫]

তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাংলাদেশের কতিপয় সমকালীন ক্যালিগ্রাফার ইসলামী লিপিকলার পুনরুজ্জীবিত করার নব প্রয়াসে ক্যালিগ্রাফির উপর অনবদ্য চর্চা ও সাধনা করে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে শিল্পী মুর্তজা বশির, শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী আবু তাহের, শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী, শিল্পী সবিহ-উল আলম, শিল্পী অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম, শিল্পী ভাস্কর রাসা, শিল্পী ফরেজ আলী, শিল্পী মনিরুল ইসলাম, শিল্পী এ.এইচ.এম. বশির উল্লাহ, শিল্পী সাইফুল ইসলাম, শিল্পী এনায়েত হোসেন, শিল্পী কামরুল হাসান কালন, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী, শিল্পী বশির মেসবাহ, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন, শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ, শিল্পী মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, শিল্পী নাসির উদ্দিন আহমেদ খান, শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ, শিল্পী আমিরুল হক, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার, শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী, শিল্পী মাসুম বিল্লাহ, শিল্পী আবুদ দারদা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, শিল্পী আতা ইমরান, শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল মারুফ, শিল্পী ইসহাক আহমেদ, শিল্পী মাসুম আখতার মিলি, শিল্পী আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরবী ক্যালিগ্রাফির শৈলী বা রীতিসমূহ

সপ্তম হতে অষ্টাদশ পর্যন্ত বারো শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ললিতকলা হিসেবে লিপি শিল্পের চর্চা হয়েছিল। স্থাপত্য, চিত্রকলা, মৃৎপাত্র, ধাতবপাত্র প্রভৃতি ইসলামী শিল্পকলার পাশাপাশি লিপিকলার যে উৎকর্ষ সাধিত হয় ও বিকাশ ঘটে তা বিশ্বের ললিতকলার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। আরবী হরফের অলঙ্করণ ও শিলালিপির নকশা প্রসঙ্গে Christi বলেন-Arabic script the sole contribution to Islamic art is a universal mark of muslim dominance of Influence wherever it spread. আলঙ্কারিক রীতিতে আরবী লিখন পদ্ধতি বায়জান্টাইন বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প, স্থাপত্য, অলঙ্করণ, এমনকি পাণ্ডুলিপি চিত্রায়নে প্রভাব বিস্তার করে। অষ্টম শতাব্দীতে মর্সিয়ার রাজা ওক্‌ফা তার স্বর্ণমুদ্রায় কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' মুদ্রিত করেন। বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত ব্রোঞ্জের একটি আইরিশ ক্রসে কুফী রীতিতে কালিমা খোদিত আছে।[৫৬]

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রথম লিপি হচ্ছে জযম লিপি। এ লিপির কয়েকটি আঞ্চলিক রূপ ছিল। যথা- আনবার অঞ্চলে আম্বরী, হিরাতে হিরী, মক্কায় মক্কী এবং মদীনায় মাদানী লিপি হিসেবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু মূলত সামান্য পার্থক্য বাদ দিলে ওগুলো জযম লিপি হিসেবে পরিচিত ছিল। মক্কা মদীনার কুরআন কপির জন্য এ লিপিকেই আদর্শ লিপি হিসেবে ধরা হয়েছিল। কুফা নগরীর প্রতিষ্ঠার পর এটি কুফী লিপিতে পরিণত হয় এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে কুরআনের এ লিপি ব্যবহার করা হয়। তৎকালীন সময়ে মদীনায় আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিন ধরনের লিপি ছিল। যথা-

১. মুদাওয়ার বা গোলায়িত
২. মুছাল্লাত বা কৌণিক
৩. তাঈম বা গোলায়িত ও কৌণিক লিপির মিশ্রিতরূপ

তবে এ তিনটি ধারাকে মূলত দু'টি ভাগেই ভাগ করা যায়। যথা-

১. মুকাওয়ার বা গোলায়িত ধারা
২. মাবসুত বা কৌণিক ধারা

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিকভাবে মক্কা মদীনায় এ ধারায় আরবী লিপির উন্নতি সাধিত হতে থাকে। এরপর কিছু ভিন্ন ধরণের ধারারও উদ্ভব হয়। এর মধ্যে মাইল তথা সামনে ঝোকপ্রবণ, মাসক তথা প্রসারিত এবং নাসখ তথা উৎকীর্ণ লিপি উল্লেখযোগ্য। যার মধ্যে প্রথম দু'টি কৌণিক ধারা ও শেষেরটি গোলায়িত ধারার অন্তর্ভূক্ত। মুসলিম সাম্রাজ্য ও সভ্যতা বিস্তারের সাথে সাথে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে লেখার পরিধি ব্যাপক পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় এবং অতি দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার জন্য কৌণিক পদ্ধতির পরিবর্তে গোলায়িত পদ্ধতির লেখা সামগ্রিকভাবে সমাদৃত হয়। ফলে গোলায়িত লিখন পদ্ধতি হতে অনুরূপ বেশি করে লিখন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে এবং লিপিকারদের দ্বারা তার বিকাশ ঘটে। গোলায়িত ও কৌণিক ধারার অনেকগুলো লিখন পদ্ধতি রয়েছে।

আরবী ক্যালিগ্রাফির কয়েকটি মৌলিক রীতি বা স্টাইল রয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটির আকৃতি ও চেহারা সুরত ভিন্ন ভিন্ন। কোনটি পেঁচানো, কোনটি মোটা; কোনটি বাঁকা, কোনটি সোজা; কোনটি সরল, কোনটি জটিল; কোনটি দীর্ঘ, কোনটি খাটো; আবার কোনটি সরু, কোনটি জ্যামিতিক আকৃতির। যেমন আরবী বর্ণমালার প্রথম হরফ আলিফ। এই আলিফকে বিভিন্ন স্টাইলে লেখলে বিভিন্নভাবে লিখা যায়। এভাবে বিভিন্ন অক্ষরের বিভিন্ন আকৃতি রয়েছে। যাদের কোনটি লম্বা, খাটো, সোজা, বাঁকা, মোটা, কিংবা পাতলা। কিন্তু এগুলোর কোনটিই নিয়মের বাইরে যায়নি। বরং এর বেশ কিছু নিয়ম কানুনও আছে। নির্দিষ্ট একটি বাক্য বিভিন্ন রীতি বা স্টাইলে লিখতে গেলে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় সেটাই হচ্ছে ঐ স্টাইলের নিয়ম বা কানুন। আর এ নিয়ম কানুন কতটুকু বিশুদ্ধভাবে পালন করা হয়েছে তা যাচাই করার জন্য নির্দিষ্ট মাপজোখ রয়েছে। এটাকে আরবী ক্যালিগ্রাফিতে বলা হয়- খাত আল মানসুব। অর্থাৎ আরবী লিপির মাপকাঠি বা মানদণ্ড। আর যে কলমে লেখা হয় সে কলমের একটা নোকতা বা ডট হচ্ছে ঐ মাপকাটির একক। নিম্নে তাদের বৈশিষ্ট্য, উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ চিত্রসহ উপস্থাপন করা হল।[৫৭]

১. কুফী লিপি

কুফী লিপি আরবী ক্যালিগ্রাফির প্রাচীনতম একটি ধারা। এ লিপি সুনির্দিষ্ট সৌষ্ঠব সম্পন্ন আনুপাতিক পরিমাপ এবং তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ ও চৌকোণা লম্বা ও খাটো উল্লম্ব রেখা এবং বিস্তৃত সমতল আনুভূমিক রেখার সমন্বয়ে গঠিত লিপি। কোন বিশিষ্ট অক্ষর এবং লম্বদণ্ডের ন্যায় খাঁড়া ও বক্ররেখা এ রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ লিপি তৎকালীন অন্যসব লিপিকে ছাড়িয়ে যায় এবং আরবী

Dhaka University Institutional Repository

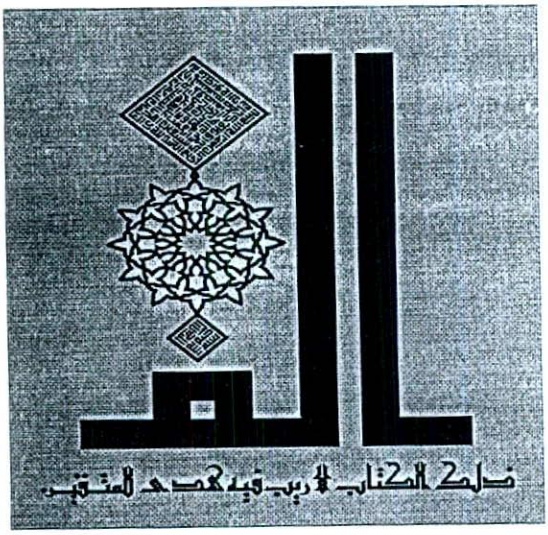

ক্যালিগ্রাফির উন্নয়নে সুগভীর প্রভাব ফেলে। ইরাকের প্রধান ব্যাবিলন শহরকে কেন্দ্র করে ৬৩০ খৃস্টাব্দে কুফা নগরীর গোড়াপত্তন হয়। এর নামকরণ নিয়ে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে-[৫৮] কাফেলার সাময়িক বিশ্রামের জন্য নির্বাচিত এ শহরটি নির্ভরযোগ্য ছিল। আরবী তাকাওফ হতে কুফা শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ- নির্ভরযোগ্য বিশ্রামস্থল। আগে থেকেই যেহেতু জায়গাটি বিখ্যাত ছিল। ফলে এখানকার সাংস্কৃতিক আবহটি দ্রুত মজবুত হতে থাকে এবং এ স্থানটি আরবী লিপি চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাছাড়া হযরত আলী (রাঃ) কুফা নগরীকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তিনি নিজে একজন ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। কুফী লিপির উন্নয়নে তার অবদান অনস্বীকার্য। তিনি লাম আলিফের মাথাকে দুই শিং বিশিষ্ট করে একটি নতুন ধারার কুফী লিপির প্রচলন করেন। প্রাচীন আরবী দলীল শিলালিপি ও মুদ্রায় এ লিপির ব্যবহার দেখা যায়। এ লিপির টানগুলি কৌণিক ও চোখা চোখা।[৫৯]

পবিত্র কুরআনের বাণীকে আরবী হরফে সর্বোচ্চ সতর্কতায় লিখা হয়। তাই যখন কুরআনের অনুলিপি করা হয় তখনি একে যতটা সম্ভব মনোমুগ্ধকর করে লিপিবদ্ধ করা হয়। সেই প্রাথমিক সময়ে ধর্মীয় বাণী লিপিবিদ্ধ করার জন্য এবং স্থাপত্যে ব্যবহারের জন্য উৎকীর্ণ লিপি হিসেবে ব্যবহার করা হত। সাধারণভাবে যাকে কুফী লিপি বলে আখ্যায়িত করা হয়। হিজরী ১৬৮ সনে কুরআন শরীফ অতি সাধারণ কুফীশৈলীতে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রথম যুগের মুসলমানদেরও ধর্মীয় অনুভূতি আরবদেরকে কুরআন শরীফের সুদৃঢ় ও লীলায়িত বাক্যালঙ্কারে অনুপ্রাণিত করে। তারা পবিত্র কুরআনের অমোঘ বাণীকে লিপিবদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত মনে করত। তাই যখন অহী নাজিল হত তখন তা সুদৃঢ় ও সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ করার জন্য তারা কুফী লিপি ব্যবহার করত। এভাবে পরবর্তীতে প্রায় ৫০০ বছর পর্যন্ত এ লিপিতে কুরআন লিখিত হয়েছে।[৬০]

Dhaka University Institutional Repository

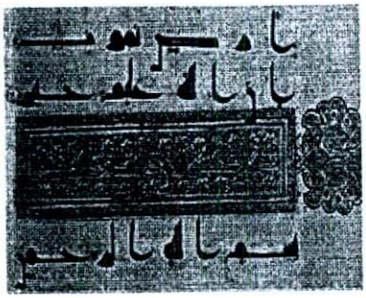

কুফী লিখন পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিরঃকোণ (Virtical) এবং তীর্যক রেখা (Oblique line)। প্রাক ইসলামী যুগে যে ধরণের প্রাচীন বক্রাকার লিখন ব্যবহৃত হতো তাতে আরবী লিপিমালার মূল আঙ্গিকে গঠনের উদ্ভব হয়। যেমন-একটি হরফের সাথে আরেকটি হরফের সংযোগরক্ষাকারী বন্ধনী (Ligature) এ ধরণের বন্ধনীর ব্যবহারে অক্ষরগুলো যে সাবলীল ও ছন্দময় গীতিময়তা লাভ করে তা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ লিপিগুলো ছিল বেশ ত্রুটিপূর্ণ। কেননা এতে না ছিল কোন স্বরচিহ্ন বা নোকতা, কিংবা এক অক্ষর থেকে অন্য অক্ষরের পার্থক্য বুঝার জন্য কোন হরকত (যবর, যের ও পেশ)। পরে হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীতে হরকতের প্রবর্তন হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে বিভিন্ন ধরনের জড়ানো, পাথরের সাথে বোনা, লতা-পাতা এবং জ্যামিতিক নকশায় কুফী লিপিশৈলীর অপূর্ব অলঙ্করণ রীতি প্রকাশ ঘটে।

হিজরীর পঞ্চম শতাব্দীতে কুফী লিপিশৈলী অন্যান্য দেশে বিলুপ্ত হলেও ককেসীয় লিপিকাররা হিজরী অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত এ রীতির চর্চা অব্যাহত রাখেন। তারা এ লিপিশৈলীকে অলঙ্করণের মাধ্যম হিসেবে একটি ভাষায় লিপিমালা অপেক্ষা অধিক সমাদর করতেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে- তারা শিলালিপির প্রচলিত লিখন পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে শিলালিপি গুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে শিল্পকলার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেন। ৬৭০ হিজরীতে উৎকীর্ণ একটি সমাধি ফলকে কুফী লিপিশৈলী এমন এক অভূতপূর্ব ও অসাধারণ রীতি উদ্ভাবন করেন যা দেখে মনে হবে যে এটি কোন দক্ষ শিল্পীর নিখুঁত বাটালীর কাজ নয় বরং সিমেন্টের মেঝের উপর ক্ষয়িষ্ণু প্রকৃতির স্বাভাবিক লীলাখেলা। প্রতিটি সারিতে অক্ষরগুলো বিচ্ছিন্ন করার ফলে লিপিমালার মূল প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য চাপা পড়ে গেছে। উপরন্তু এ সকল অক্ষর অস্বাভাবিক ও অপঠিতভাবে দীর্ঘায়িত করে এরূপ আকার ধারণ করেছে যে, মনে হয় যেন একজন অবোধ শিশু অন্যমনস্ক ভাবে অ ই ঈ লেখার চেষ্টা করছে।

চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) এর শিষ্য আবুল আসওয়াদ আদ দুয়াইলী কুরআন লিপিবদ্ধকরণে ব্যবহৃত কুফী লিপিশৈলীর উন্নতি সাধন করেন এবং বিন্দুর আকারে স্বরচিহ্ন প্রবর্তন করেন। তার

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ভাবিত এ পদ্ধতি এক শতাব্দী ধরে প্রচলিত ছিল। তার শিষ্যগণ তার এ লিপিশৈলীর বিকাশে ব্যাপক পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। আবুল আসওয়াদের পর কুতবাই ছিলেন প্রথিতযশা লিপিকার যিনি কুফী লিপির চারটি রীতি উদ্ভাবন করেন। তার পরের যুগে খালিদ ইবনে আহমদ এবং আলী ইবনে কুসাইয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা কুফী লিপিশৈলীর উৎকর্ষতা চরম শিখরে পৌছায়।

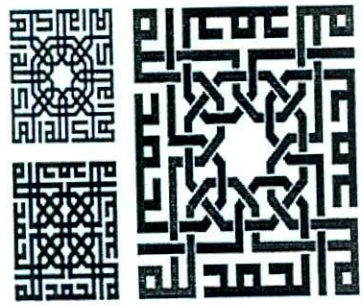

ছিলেন শ্রেষ্ঠ লিপিকার। রাসূল (সাঃ) এর মসজিদে সোনালী শিলালিপি তারই শৈল্পিক দক্ষতার পরিচায়ক। তিনি সর্বপ্রথম সোনালী হরফে কুরআন শরীফের অনুলিপি তৈরী করেন। আব্বাসী যুগে রাজবংশের মর্যাদা ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হতে থাকলে লিপিকলা একটি অনন্য সাধারণ শাখা হিসেবে সকল ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা পায়। ফলে মক্কা, মদীনা, বসরা, কুফা ও বাগদাদে নিজস্ব লিপিশৈলীর বিভিন্ন রীতি ও ধারা গড়ে উঠে। ব্যাকরণবিদ

অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এসে কুফী লিপিশৈলী একেবারে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ সময় মিহরাব, গম্বুজ, মিনার, মিম্বর, রিহাল, দরজা, জানালা, বাক্স, ধাতুর বর্ম, হেলমেট, তলোয়ার, বল্লম-কোঁচা, ঝুড়ি, গহনা ইত্যাদিতে এ লিপির চমৎকার সব শিল্পকর্ম সূচিত হয়।[৬১] তখন মুসলিম জীবনবোধ, যেমন সুষমা-বৈচিত্র জাঁকালো হতে থাকে তেমনি মুসলিম সংস্কৃতি ফুল ফসলে ভরে উঠে। ফলে কুফী লিপিশৈলীতেও জাঁকজমক আসতে থাকে এবং এর অলঙ্করণ প্রভা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। পঞ্চদশ শতকে ওসমানীয় ধারার ইস্টার্ণ কুফী যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণ কুফী লিপিতে আমরা নান্দনিকতা দেখতে পাই মিশরের রাজধানী কায়রোতে। এছাড়া ফাতেমী সেলজুক ও গজনী শাসনামলের বিলাস সৌন্দর্যবোধ কুফী লিপিতে যে নান্দকিতা আনয়ন করে তা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এদিকে আব্বাসীয় শাসনামলে (৭৫০-১২৫৮ খৃঃ) কুফী লিপির উন্নয়নের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌছায়। তবে এর চূড়ান্ড় উন্নয়ন সাধিত হয় সেলজুকদের হাতে।

কুফী একটি কৌণিক জ্যামিতিক ধারার উল্লম্ব-আনুভূমিক রেখা প্রধান লিপি। পবিত্র কুরআন কপি করার জন্য এ লিপিটি প্রায় তিনশত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে পৃথিবীর যে অঞ্চলে ইসলামের বাণী

Dhaka University Institutional Repository

পৌঁছেছে সেখানেই এ লিপিশৈলী পৌঁছেছে। তবে কুরআনের কপিতে পরবর্তীতে স্থানীয় ক্যালিগ্রাফারদের মাধ্যমে এ লিপির পরিবর্তন হতে থাকে এবং বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি হয়। মরক্কোয় এ লিপিটি মাগরিবী লিপি, সুদান ও ইথিওপিয়া থেকে পশ্চিম ইউরোপের দেশ সমূহে ওয়েস্টার্ন কুফী, স্পেন ও আলজেরীয় প্রভৃতি দেশে আন্দালুসিয়ান, কুফী ইরাকের পূর্বাঞ্চল, আরব উপদ্বীপ, পারস্য ও ভারতীয় উপমহাদেশে এ লিপি ইস্টার্ন কুফী নামে পরিচিত। এছাড়া আল জালী নামে এক ধরনের বলিষ্ট কুফী লিপি যা রাজকীয় চিঠিপত্র এবং শিলালিপিতে ব্যবহৃত হত। মাজালাত ছিল দলীল-দস্তাবেজে ব্যবহৃত কুফী। যা সালামী লিপিরীতি এবং এস্ট্রেনজেলো লিপিমালার মিশ্রণ। মহিলাদের লিপিশৈলীর নাম ছিল হারাম। বিখ্যাত লিপিকার ইবনে মুকলা (৩৩৮ খৃঃ) কুফী লিখন রীতির চরম উৎকর্ষতা সাধন করেন। তিনি আব্বাসীয় খলীফা আল কাহির বিল্লাহর দরবারের সুযোগ্য লিপিকার ছিলেন। কুফী লিপিশৈলীর প্রতি জনগণের আকর্ষণ কমে গেলেও ইবনে মুকলা কর্তৃক আবিস্কৃত পাঁচটি প্রধান লিপিকলার রীতি প্রকরণ অব্যাহত থাকে।

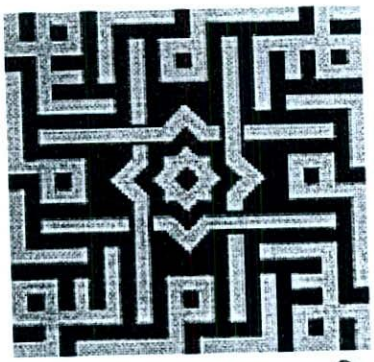

প্রথম যুগের কুফী লিপিতে সিরীয় লিপির মত হরফগুলো সমান্তরালভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, যার জন্য বৈশিষ্ট্যগতভাবে এ রীতির নাম, হয় 'আকুর' অর্থাৎ জীব জন্তুদের চার পায়ে হাঁটার শামিল।[৬২] ১৫৫ হিজরী (৭৭১ খৃঃ) আল মাহদীর মসজিদে মার্বেলে উৎকীর্ণ শিলালিপিটি আলঙ্কারিক কুফী রীতির প্রচলনের পূর্বে ব্যবহৃত চিরাচরিত কুফী শৈলীর নিদর্শন। খাঁড়া ও তীর্যক রেখাগুলোর শেষ ভাগে কোণাকৃতি এবং কখনও কখনও খাঁড়া দণ্ডের মাথা অলঙ্কৃত। ইউসুফ বিন কবীরের সমাধিতে উৎকীর্ণ ৫৫৭ হিজরীর একটি শিলালিপিতে কয়েকটি কুফী রীতির আরেকটি প্রকরণ দেখা যায়। এ লিপিকলার অভিনবত্ব হচ্ছে-এর প্রতিটি শব্দ সুস্পষ্ট ও নিখুঁত বিন্যাসে স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেছে। যেমন- প্রথম সারির শেষ শব্দ 'জাকী' আঁকা বাঁকা ভঙ্গিতে খোদিত হয়েছে। অনুরূপভাবে 'আল ইসলাম' শব্দটির চারটি লম্বা রেখা দু'টি সমান্তরাল রেখার সঙ্গে এমন ভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে যে, মাথার উপর দু'টি ত্রিকোণাকার ছাদের সৃষ্টি হয়েছিল।

দশম শতাব্দীতে আব্বাসীয় আমলে প্রাচ্যদেশীয় কুফী নামে একটি লিপিশৈলীর উদ্ভব হয় যার লম্বা লম্বা দণ্ডের মাথা তীর্যক ও নকশাকৃত এবং সমান্তরাল অক্ষরগুলো ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর। ইরানে কুফী

Dhaka University Institutional Repository

লিপির অলঙ্কৃত ধারাটি পৃথিবী বিখ্যাত। এ লিপিটিতে খাটো উল্লম্ব রেখাগুলো সামান্য বামে ঝুঁকে থাকে। লম্বা ও উল্লম্ব রেখা সোজা থাকে। আবার খাটো-লম্বা উভয় উল্লম্ব রেখা সামনে ঝুঁকে থাকে। পাশ্চাত্যের গবেষকগণ একে ঝোঁকপ্রবণ লিপি বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। এ লিপিতে যে সমস্ড় হরফের মাথা গোলাকার সেগুলোকে ফুল ও পাতা অলঙ্করণ করা হয় এবং নীচের জালগুলোকে গোলাকৃতি করা হয়।

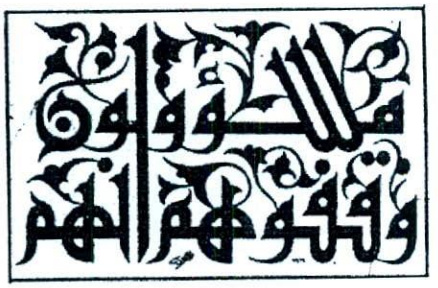

ইস্টার্ণ কুফীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ধারা হচ্ছে- কারামাতিয়ান কুফী। এ লিপির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে- মানসম্পন্ন অলঙ্করণের ব্যবহার। এটি খুবই উঁচুমানের অলঙ্করণ। যার মত সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় লেখা অন্য কোন লিপিতে হয়ে উঠেনা। এ লিপিতে প্রধানত ফুলের নক্সা ও জ্যামিতিক ডিজাইনের বৈচিত্র দেখা যায়। স্থাপত্যেও কুফী লিপি আজ সুষমা ছড়িয়ে চলছে। দিল্লীর কুতুব মিনার থেকে তুরস্কের ইনস মিনারেলী মাদরাসায়, এমনকি কর্ডোভা মসজিদের মিহরাবে এ লিপির অত্যাশ্চার্য কাজ আমাদের গৌরবগাঁথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আল আকলাম আস সিত্তাহ

কারসিভ তথা গোলায়িত ধারার প্রধান ছয়টি ধারাকে আল আকলাম আস সিত্তাহ বা সিস্ত কালাম বলে। এ ছয়টি ধারা হচ্ছে- সুলুস, নাসখী, মুহাক্কাক, তাওকী, রায়হানী ও রিকা। ইবনে মুকলা এ ছয়টি ধারার প্রবর্তক।[৬৩] তার হাতে কুফিক লিখন পদ্ধতি চরম বিকাশ লাভ করেছিল। তিনি একে সংশোধন করে জটিল, নিপুণ, জ্যামিতিক ও গাণিতিক পদ্ধতিতে বিন্যাস করেন এবং বিজ্ঞানসম্মত ধারায় দাঁড় করেন। এ ছয়টি লিপিশৈলীর অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধনের জন্য তাকে ক্যালিগ্রাফির গোলায়িত ধারার প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তবে লেখার পরিমাণ অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়ায় দ্রুততম ও সহজ গতিতে লেখার কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সম্ভবত ৩১০ হিজরী মোতাবেক ৯২৩ খৃস্টাব্দে ইবনে মুকলা বৃত্ত ও বিন্দুকে লেখার মূল সূত্র হিসেবে গ্রহণ করে আরবী লিখনের এ ছয়টি প্রধান পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং এগুলো সম্পর্কে পুনরায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।[৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

আকলামুস সিত্তাহ খ্যাত আবু আলী মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে মুকলার- রিকা, সুলুস, ঘুবার, রায়হানী, মুহাক্কাক, তাওকী পদ্ধতির ধারণা ও কুফী রীতির রিয়ালাইজেশন এবং পাহলভী ও এভেস্টা-ই হ্যান্ড রাইটিং এর প্রভাবজাত বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। আবুল ফজল মত প্রকাশ করেন যে, আল আকলাম আস সিত্তাহ ইবনে মুকলা কর্তৃক কুফিফ ও মাকালী লিখন পদ্ধতি হতে উৎসারিত হয়েছে।[৬৫] কিন্তু পূর্বাপর লেখার বর্ণ বিচিত্র বিশ্লেষণ করলে আবুল ফজলের মত সঠিক বলে গ্রহণ করা যায় না। কারণ কুফিক কৌণিক বর্ণমালায় ও মাকালী লম্বদণ্ড ও সরল রেখার প্রতিনিধিত্ব করে। অথচ ছয়টি লিখন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত অক্ষরে গোলায়িত বর্ণমালা ও উল্লম্ব দণ্ডের সমাবেশ আনুপাতিক হারে ঘটেছে। আধুনিক পণ্ডিতদের কেউ কেউ নাসখ ব্যতীত অপর পাঁচটি পদ্ধতিকে নাসখের ভিন্নরূপ এবং লিখন শিল্পের অলঙ্করণ পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করেন।[৬৬]

ইবনে মুকলার পরে ইবনে বাওয়াব এ ছয়টি লিপিকে ইবনে মুকলার পদ্ধতি অনুসারে আরো উৎকর্ষ প্রদান করেন এবং ইয়াকুত আল মুস্তাসিমী একে প্রভূত সৌন্দর্য প্রদান করেন। তার অপূর্ব লেখনির মাধ্যমে এবং বিশেষভাবে কলম কেটে ব্যবহারের জন্য এ ছয়টি লিপির অসাধারণ উন্নয়ন আসে। ধারণা করা হয় তার হাতেই এ লিপিগুলো পূর্ণতা লাভ করে।

২. সুলুস লিপি

الثلث Thuluth সুলুস শব্দের অর্থ এক তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ বক্রাকার অংশ খাড়াদণ্ডের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ। লিপি সমূহের মধ্যে সুলুস লিপি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ লিপিকে সুলতানুল খুতুত অর্থাৎ লিপিসমূহের বাদশা বা লিপি সমূহের জননী বলা হয়। এ লিপিটি আয়ত্ত করতে পারলে অন্যান্য লিপিগুলো আয়ত্ত করা সহজ হয়। রাসূল (সাঃ) এর সময় থেকে এ লিপির উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ পবিত্র কুরআন বেশির ভাগই এ লিপিতে লিখিত হয়। মূলত এ লিপিটি আয়ত্ত করার পরই কাউকে ক্যালিগ্রাফার হিসেবে গণ্য করা হয়। সুলুস লিপি স্থূল প্রকৃতির গোলায়িত ধারার লিপি। সুলুস লিপি তু'মার লিপির এক তৃতীয়াংশ হয়ে থাকে। তু'মার লিপিতে আলিফের বিস্তার ঘোড়ার ২৪টি পশমের বিস্তারের সমপরিমাণ। সে হিসেবে সুলুস লিপির আলিফের বিস্তার হবে ৮টি পশমের সমান।[৬৭] আবার

Dhaka University Institutional Repository

সুলুস লিপিতে লম্বদণ্ড গোলায়িত অংশের এক তৃতীয়াংশ হবে। তাছাড়া ইবনে মুকলার খত আল মানসুবের নিয়ম অনুসারে আলিফের পরিমাণ হবে, যে কলমের আলিফটি লিখা হবে ঐ কলমের ছয় বা সাতটি ফোটা বা নোকতা বরাবর লম্বা এবং আলিফটির বিস্তার হবে কলমের নিবের অর্ধ নোকতা বরাবর।

মুসলিম ক্যালিগ্রাফি গ্রন্থে ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান উল্লেখ করেছেন সুলুস লিপির লম্বালম্বি দণ্ড এবং বক্রাকার রেখার অনুপাত নাসখী লিপির তুলনায় তিন গুণ বড়। নাসখীতে যে খাড়াদণ্ড এবং বক্ররেখা যুক্ত হয়ে রয়েছে তা সুলুস লিখন পদ্ধতিতে প্রকাশ পেয়েছে। সুলুস রীতিতে খাড়াদণ্ড সমূহ ছোরার মত মনে হয় এবং জলস্রোতের মত সাবলীলভাবে নিম্নাংশে পরিসমাপ্তি ঘটে। যেহেতু এ লিখন পদ্ধতি মূলত স্থাপত্যিক অলঙ্করণ অথবা অন্য কোন লিপিমালায় ব্যবহৃত হয় সেহেতু এর হরফগুলো খুবই মোটা ও বলিষ্ট এবং সুপ্রশস্ত স্থিতি পেয়েছে।

সুলুস লিপি মোট দু'প্রকার। যথা-

১. ছাকিল তথা মোটা

২. খাফিফ তথা পাতলা

ছাকিল লিপিটি সুলুস রীতিতে পুরোপুরি মোটা যা ঘোড়ার আট পশমের বিস্তারের সমপরিমাণ আর খাফিফ সুলুস রীতিতে লিপিটির বিস্তার ছাকিলের তুলনায় সামান্য কম হয়।

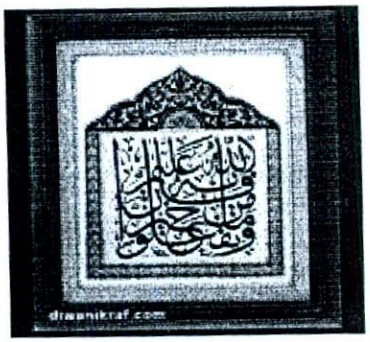

নাসখী লিপির মত সুলুস লিপিরও কতগুলো উপধারা লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জালী বা আলঙ্কারিক সুলুস লিপির লম্বালম্বি দণ্ডগুলো কখনো কখনো জীবজন্তু ও মানুষের মস্তকের আকৃতিতে রূপান্তরিত করা যায়। ওসমানীয় সাম্রাজ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে হাফিজ ওসমান 'জালী' লিপির গুণগত বৈশিষ্ট্য উপলব্দি করে এর প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে সুলুস লিপির আবিষ্কার হয়। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে গাণিতিক ও জ্যামিতিক পদ্ধতিতে বিস্তার করেন। ইবনে বাওয়াব একে আরও পরিশীলিত করেন এবং সবশেষে ইয়াকুত আল মুস্তাসিমী একে পরিপূর্ণতা দান করেন। তিনি একে ধর্মীয় গ্রন্থাবলী ও কুরআনে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেন। পরবর্তীতে এ লিপিটি পবিত্র কুরআন ও ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে এত বেশি ব্যবহার করা হয় যে, একে ধর্মীয় লিপির মর্যাদা দেওয়া হয়। ক্রমান্বয়ে এ লিপিতে আরো আলঙ্করিক সৌন্দর্য প্রদান করার ফলে আল কুরআনের সাধারণ লিপি থেকে সুরার হেডিং টাইটেল, ফলোকোণ প্রভৃতিতে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই এ লিপির কুরআনের কপি খুবই দুর্লভ। তবে ইবনে বাওয়াবের স্বহস্তে লিখিত সুলুসে জালী লিপিতে কুরআনের সাতটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।[৬৮]

সুলুস লিপিকে সাধারণ কাগজে ব্যবহার করা হয়। তবে উৎকীর্ণ লিপি এবং স্থাপত্যে একে ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপন করা হয়। এজন্য তুরস্ক ইন্দোপাক অঞ্চলের কারখানা গুলোর স্মৃতিফলকে লিপির ব্যবহারে স্থাপত্যের এক অন্যতম নিদর্শন পেশ করা হয়েছে। তবে এ লিপির ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। শিলালিপি মৃৎপাত্র, ধাতবপাত্র, কাষ্ঠখোদাই, মিনাকরাটালী, পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠায় ধর্মীয় লিপির মর্যাদা লাভ করে। নবম শতাব্দীর শেষার্ধে ইবনে মুকলা কর্তৃক সুলুস লিপিশৈলীর উৎকর্ষতা লাভ করে এবং একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইয়াকুত কর্তৃক অধিকতর সুষমামণ্ডিত হয়।

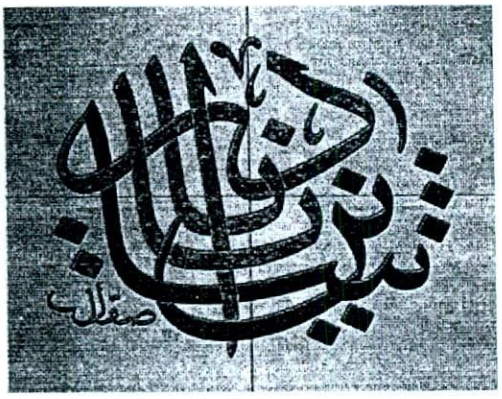

সুলুস লিপি এ উপমহাদেশে এসে স্থানীয় প্রভাবে কিছুটা প্রভাবিত হয়। কুতুব মিনারে উৎকীর্ণ সুলুস লিপিটি উপমহাদশের প্রভাবের উৎকৃষ্ট নজীর। তাই বলা যায়- সুলুস একটি নিশ্চল স্মারক লিপি যা প্রধানত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও উৎকীর্ণ লিপি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ লিপি সুলতানী আমলে বাংলায় বেশ জনপ্রিয় ছিল। এ স্টাইলের সাধারণ হস্তাক্ষরকে বিভিন্নভাবে বিন্যাসের মাধ্যমে যে অসাধারণ ক্যালিগ্রাফি শিল্প নির্মাণ করা হয় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে- আলজেরিয়ার রশিদ কোরেশী। তিনি সমগ্র ক্যানভাসকে অনেকগুলো ক্ষেত্রে বিভক্ত করে প্রতিটি ক্ষেত্রকে দৃষ্টিনন্দন করেন। তিনি কখনও সোজা হরফ কখনো উল্টোভাবে লিখে একঘেয়েমি পরিহার করে

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন এবং ছোট বড় অক্ষরের সমাবেশ ঘটিয়ে তার মাঝে শক্তিশালী বর্ণসাদৃশ্য ফর্ম সংযোজন করে চিত্রের কাজ সম্পন্ন করেন। তার বর্ণ বিন্যাসের অভিনব কৌশলের কারণে সাধারণ হস্তাক্ষরও আকর্ষণীয় শিল্পরূপ লাভ করে থাকে।

৩. নাসখী লিপি

النسخ Naskh নাসখ শব্দের অর্থ নকল করা বা অনুলেখন। সুলুস লিপির পরপরই সর্বাধিক ব্যবহারযোগ্য ও জনপ্রিয় শৈলী হচ্ছে- নাসখী লিপি। নাসখী এর সংজ্ঞায় ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী বলেন- বর্ণমালার লম্ব ও আনুভূমিক বাহু ঢালু করে যদি উপস্থাপন করা হয় এবং তাতে কোনরূপ কোণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে না হয় তাহলে তাকে নাসখী লিপি বলে।[৬৯] এ লিপিটি পবিত্র কুরআনের লিপি হিসেবে সমধিক পরিচিত। পৃথিবীর সবদেশেই এ লিপিতে কুরআন লেখা হয়েছে। এজন্য এর গুরুত্ব সমধিক। এ লিপির আনুভূমিক ও উল্লম্ব রেখাগুলো সামনে পেছনে সর্বত্র সমান। এ উল্লম্ব ও আনুভূমিক বক্রতাও গভীর ও সামান্তরাল। এর শব্দগুলো পরস্পর ফাঁক ফাঁক ও সুন্দরভাবে বিন্যস্ত। এ ধারার লিপি স্বভাবে শক্তিশালী (Bold) এবং এর হরফগুলো তুঘরার মত একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে এ ধারার ক্যালিগ্রাফিতে বিভিন্ন ধরণের জ্যমিতিক ফর্মের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এ লিপিশৈলীতে স্বরচিহ্ন বা হরকত ও বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এ লিপিশৈলী প্রবর্তনের ফলে আরবী বর্ণমালার লিপিকৌশলে যে সুপ্ত সম্ভাবনা ছিল তা উন্মোচিত হয় এবং সুস্পষ্টতা, সাবলীলতা ও সহজবোধ্যতার কারণে সবার নিকট গ্রহণীয় হয়ে উঠে।

নাসখী লিপি গোলায়িত ধারার অন্যতম সৌন্দর্যমণ্ডিত লিপি। এর আদি উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং তখন থেকে আজ অবধি এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নাসখের প্রাথমিক ধারাটি মূল গৃহাভ্যন্তরে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হত। যাকে চিঠিপত্র, চিরকুট লেখা ও টুকিটাকি

Dhaka University Institutional Repository

লেখালেখিতে ব্যাপক ব্যবহার হতে দেখা যায়। ওসমানীয় ক্যালিগ্রাফারগণ কুরআন অনুলিপি করার কাজে নাসখী লিপি সবচেয়ে উপযোগী করে ব্যবহার করেন। ফলে পরবর্তীতে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন লিপির সাথে নাসখী লিপিকে বহুল ব্যবহার করা হয়। শতাব্দী ধরে পৃথিবীর বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফারগণ নাসখী লিপিকে লালন, পরিচর্যা, উৎকর্ষ সাধন এবং ভবিষ্যতের জন্য ছাত্রদেরকে এর প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এ ঐতিহ্যিক ধারা আজও বহমান রয়েছে।

দশম শতাব্দীতে আবু আলী মুহাম্মদ ইবনে মুকলা (মৃত্যু-৯৪০খৃঃ) এ লিখন পদ্ধতির প্রচলন করেন। তাঁর জ্যামিতি বিজ্ঞানে এমন বুৎপত্তি ছিল যে, তিনি মুসলিম লিপিকলার বিকাশে এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। যার মূল ভিত্তি ছিল বিন্দু ও

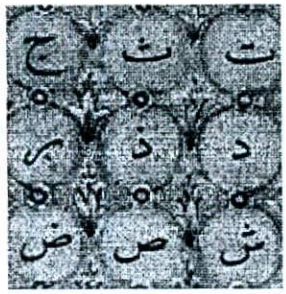

বৃত্ত। তিনি খাঁড়াভাবে সাজানো ৫/৭টি বিন্দুর সাহায্যে আলিফের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। আলিফের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য বৃত্তের মাধ্যমে অন্যান্য আরবী হরফের পরিমাপ নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ একটি আলিফে দৈর্ঘ্য একটি বৃত্তের ব্যাসের সমতুল্য হতে হবে। এভাবে বা, ওয়াও, ক্বাফ হরফগুলোর বক্রতা নির্ধারিত হয় সামঞ্জস্যতা, ভারসাম্য ও সাবলীল ছন্দ রক্ষার জন্য। লিপিকলার ক্রমবিকাশে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে উদ্ভুত এ কৌশল প্রয়োগ করেই ইবনে মুকলা বক্রাকার ছয়টি লিপিশৈলী আবিষ্কার করেন যা আল আকলাম আস সিত্তাহ নামে পরিচিত।[৭০]

বক্রাকার লিপিশৈলীর উৎকর্ষতায় বিশেষ অবদান রাখেন ইবনে মুকলার শিষ্য আবুল হাসান আলী ইবনে হিলাল। যিনি ইবনুল বাওয়াব নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর উস্তাদ কর্তৃক আবিস্কৃত ছয়টি লিপিশৈলীর এমন উন্নতি সাধন এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন যে তা আল মানসুব আল ফায়িক বা অতীব সুষমামণ্ডিত লিখন রীতি নামে অভিহিত করা হয়। কথিত আছে যে, তিনি বক্রাকার লিপিতে ৬৬ টি কুরআন শরীফের অনুলিপি প্রস্তুত করেন। তারপর আরবী হরফের লালিত্য ও সুষমা অধিকতর প্রকাশ পায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইয়াকুত আল মুস্তাসিমীর মাধ্যমে। তাকে নাসখী লিপিকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। লিপিকৃত গ্রন্থাবলী তাঁর জীবদ্দশাতেই মুসলিম বিশ্বে বিস্তার লাভ করে। তিনি লিখনশৈলীতে ব্যবহৃত কলমের উন্নতি সাধন করে হরফগুলোকে আরো সাবলীল ও ছন্দময় করে তুলেন। কথিত আছে যে, লিপিকলার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা একাগ্রতা ও ধর্মীয় অনুরাগ এমন ছিল যে, ১২৫৮ খৃস্টাব্দে হালাকু খান

Dhaka University Institutional Repository

বাগদাদ ধ্বংস করার সময় তিনি একটি মিনারের শীর্ষদেশে আত্মগোপন করে নিবিষ্টচিত্তে ও নির্বিঘ্নে লিপিচর্চা করতে থাকেন। এম. জিয়াউদ্দিন তাই যথার্থই বলেছেন- নাসখী স্টাইলের আবির্ভাব মুসলিম লিপিশিল্পের ইতিহাসের একটি রেনেসাঁ যুগের সূচনা করে।

শৈল্পিক আঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে লিপিকারগণ নানা প্রকার পরীক্ষা করেন। ফলশ্রুতিতে নানাবিধ রীতি ও উপরীতির প্রচলন হয় এবং শ্রী হীন, অপ্রয়োজনীয় এবং কল্পনা প্রসূত লিপি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনীয় এবং শক্তির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে লিপিকারগণ একটি মৌলিক লিপিরীতি থেকে বৈপরিত্য পেতে থাকে এবং এমন এক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, সেগুলো কোন ব্যক্তি বিশেষের সৃজনশীল শিল্পকর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা দুরূহ হয়ে পড়ে। মাগরিবী বা পশ্চিমী নামে নাসখীর যে উপরীতির প্রচলন হয় তা তৃতীয় হিজরীতে কুফী রীতি থেকে উদ্ভুত হয়েছে। এ রীতি আগলাভিদের রাজধানী কায়রোয়ান ছাড়াও আন্দালুসীয় কর্ডোভীয় নাসখী নামে স্পেনে আরেক ধরণের লিপিশৈলীর প্রচলন হয়, যা এর চেয়েও অধিক বক্রাকার। এছাড়া নাসখী লিপিকলার উপরীতির মধ্যে ফারসী, সুদানী, তিউনিসীয় ও আলজেরীয় সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

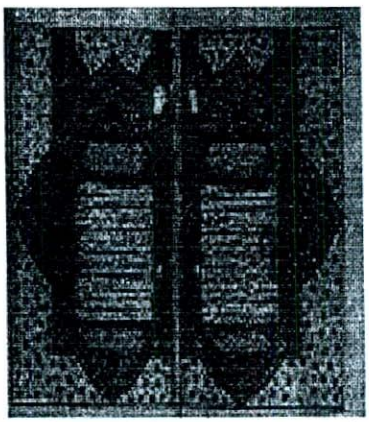

নাসখী লিপির অধিকাংশ নিদর্শন পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সময়ের কপিগুলোতে দেখা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর শেখ হামিদুল্লাহ আমাসী ওসমানীয় ক্যালিগ্রাফারদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর লিখিত নাসখী লিপির একটি কপি তুরস্কের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। বাংলার সুলতানী আমলে নাসখী লিপির অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। বানকীপুরের খোদাবখশ ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরিতে আরবী ও ফারসী পাণ্ডুলিপি সমূহের তালিকায় তিন খণ্ডে বুখারী শরীফের একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। এটি বাংলার সুলতান হুসাইন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ) মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযদান বখশ একডালা দূর্গ নাসখী লিপিতে রচনা করেন।[৭১]

Dhaka University Institutional Repository

৪. মুহাক্কাক লিপি

মুহাক্কাক শব্দের অর্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সৃষ্ট বা নির্ভুলভাবে উৎপন্ন রীতি। সুলুস ও নাসখী লিপির শৈল্পিক গুণাবলীর সমন্বয়েই এ লিপিশৈলীর উদ্ভব। নিঃসন্দেহে এটি একটি আলঙ্কারিক রীতি। এর উল্লম্ব রেখা একটু বেশি লম্বা এবং বক্র লম্বাভাবে হয়ে ঠিক প্রবাহের মত বক্রাকৃতি রেখা ও আনুভূমিক যথাক্রমে তিন চতুর্থাংশ ও এক বলিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট। তাছাড়া এ

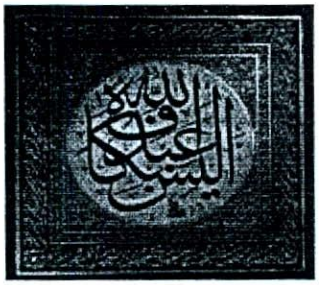

উপলাইনগুলো নমনীয় বক্রতায় সৃষ্টি করে। এর ঋজুদণ্ড এবং বাহুর আনুপাতিক ব্যবহার হয় চতুর্থাংশ। এর হরফগুলো বেশ লিপিশৈলীতে হরফগুলো সহসা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অগ্র ও শেষাংশ এক বা একাধিক সুতার মত মনে হয়। অপরাপর আক্ষরিক লিখনরীতির মতো লিপিকলার ইতিহাসে এটি খুবই বিরল। যা কোন বৈপরিত্য ও অভিনবত্ব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। খাড়া ও বক্রাকার রেখার অনুপাতে মহাক্কাকের হরফ গুলো স্থুল সুদৃঢ়। এছাড়া অন্য যে প্রভেদ রয়েছে তা হল মুহাক্কাকের রেখাগুলো খুব কমই বাঁকানো থাকে এবং সমান্তরাল রেখাগুলো সূচাগ্র হয় না।[৭২]

নাসখী ও সুলুসের শৈল্পিক গুণাবলীর সমন্বয়ে মুহাক্কাক লিপিশৈলীর জন্ম। বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার কুতবা আল মুহাররির প্রাথমিকভাবে এ লিপির রূপায়নের প্রচেষ্টা চালান। তবে ইবনে মুকলা এ লিপির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করেন এবং ইবনুল বাওয়াব ও ইয়াকুত আল মুস্তাসিমী একে শিল্পমানে উত্তীর্ণ করেন। একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ড় সময়ে এ লিপিতে প্রচুর সংখ্যক কুরআনের কপি করা হয়। তাই মাসাহিফ বা কুরআনের লিপিও বলা হয়ে থাকে। ১৩০৪ খৃস্টাব্দে ইয়াকুত আল মুস্তাসিমীর ছাত্র আহমদ আল সোহরাওয়ার্দী বাগদাদে কুরআনের একটি আয়াত মুহাক্কাক লিপিতে অলঙ্কৃত করেন। যার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল চমৎকার ফুলের নক্সায় সমৃদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

৫. রায়হানী লিপি

বক্রাকার ছয়টি লিপিশৈলীর অন্যতম রায়হানী লিপিশৈলী নাসখী লিপি হতে উদ্ভূত হলেও সুলুস ও মুহাক্কাক এর সাথে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এর উপলাইনগুলো নাসখীর মত। উল্লম্ব রেখাগুলো সুলস এবং বক্র ঢালগুলো মুহাক্কাক লিপির মত। এর সাথে স্বরচিহ্ন বা তাশকীলগুলো আলাদা ছন্দায়িত লালিত্যের জন্য অনেকে এর উৎস আল রায়হান বা কলমিলতা মনে করেন। নবম শতাব্দীতে আলী ইবনে উবায়দা আল রায়হানী কর্তৃক এ লিপিকলা আবিস্কৃত হয় এবং উদ্ভাবকের নাম থেকেই এ লিপির নামকরণ করা হয়। সুলুসের সাথে সুচাগ্র রেখার সাদৃশ্য থাকলেও রায়হানী লিপিশৈলীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এর খাঁড়া সরল রেখাগুলো জড়ানোভাবে শেষ হয় এবং কদাচিত বক্রাকার হয় যা সুলুস বা জুলফ-ই-আরুশ-এ লক্ষ্য করা যায়।

রায়হানী লিপিশৈলীতে হরফগুলোর মধ্যভাগ মোটা থাকে এবং ক্রমশ নিম্নভাগ সরু হয়ে শেষ হয়। কখনো কখনো সেগুলো খাঁড়া দণ্ডের মত হলেও বামে সামান্য হেলানো থাকে। অন্যকথায়, এ রেখাগুলো খুব কমই সমান্তরাল অবস্থায় থাকে। বক্রাকার ও খাড়া রেখাগুলোর অনুপাতের উপর সুলুসের সঙ্গে রায়হানীর পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। বিশাল আকৃতির কুরআন শরীফের অনুলিপি প্রস্তুতে রায়হানী লিপির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পারস্যে ইলখানী রাজত্বে এ লিপিতে কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন- আল হামাদানীর লিপিকলা। আল রায়হানী উদ্ভাবিত রায়হানী লিপি পদ্ধতি ইয়াকুতের দক্ষতা ও সৃজনশীলতার ফলে উৎকর্ষতা লাভ করে।[৭৩] চতুর্দশ শতাব্দীতে মামলুক সুলতান বারকুক ও তার পুত্র সুলতান ফারাজ কায়রোর একটি মসজিদে রায়হানী লিপির কুরআন শরীফের কপি উপহার পাঠান।

Dhaka University Institutional Repository

৬. তাওকী লিপি

আল আকলাম আস্ সিত্তাহ এর ছয়টি ধারায় শেষের দু'টি হচ্ছে- তাওকী ও রিকা। এ দুটো জমজ বোনের মত। তাওকী অর্থ-হাল্কা ছোট্ট বিশেষ, স্বাক্ষর বা Signature। আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৩৩ খৃঃ) এর সময়ে এ লিপির উদ্ভব বলে জানা যায়।[৭৪] আব্বাসীয় খলিফা ও কাজীগণ একে দলিল দস্তাবেজে স্বাক্ষর করার কাজে ব্যবহার করতেন। এ জন্য এটি তাওকী নামে পরিচিত। আবার একে ইযাযাও বলা হয়। কেননা ইযাযা অর্থ অনুমোদন। যেহেতু খলিফা ও কাজীগণ একে ব্যবহার করে স্বাক্ষর দানের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে অনুমোদন দিতেন। সেহেতু এ লিপিকে বলা হয় তাওকী লিপি।

এ লিপির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এর খাঁড়া দণ্ডগুলো রিকার দণ্ড অপেক্ষা প্রচলিত। হরফগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িত সুষম ও সমন্বিত। আনুপাতিক হারে সরল ও সোজা দণ্ডের ব্যবহার হবে শব্দ সমষ্টির এক চতুর্থাংশ। আর গোলায়িত অংশ ও আনুভূমিক বাহুর ব্যবহার হবে তিন চতুর্থাংশ। সুলুসের সাথে এর মৌলিক কোন পার্থক্য দেখা যায় না। তবে এর বর্ণ ও তার শীর্ষদেশ সুলুসের চেয়ে অধিক গোলাকার হয়ে থাকে। এছাড়া এর উল্লম্ব দণ্ডগুলো পরস্পরের সাথে জড়িত ও সমন্বিত হয়ে থাকে। এ লিপিকে রিয়াসী বা কার্যনির্বাহীও বলা হয়। উজির ফজল ইবনে হারুন এ লিপি দেখে মুগ্ধ হন এবং একে সরকারি দপ্তরের লিপি হিসেবে ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তিনি এর নাম রাখেন রিয়াসী।

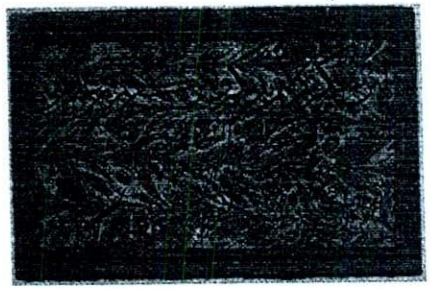

নবম শতাব্দীতে এ লিপির সর্বপ্রথম আবিষ্কার হয় ইউসুফ আল সিজ্জী (মৃত্যু-৮২৫ খৃঃ) এর হাতে। তবে এর মূল রূপকার হচ্ছেন ইবনে মুকলা (মৃত্যু-৮৪০ খৃঃ)। আব্বাসী আমলে খলিফাগণ কোন দলিল দস্তাবেজে স্বাক্ষর করার সময় এ লিপি ব্যবহার করতেন। তাওকী একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৌলিক লিপিশৈলী হিসেবে দ্বাদশ শতাব্দীতে মর্যাদা লাভ করেই লিপি উৎকর্ষতায় আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ওরফে ইবনে খাজিনের (মৃত্যু-১১২৪ খৃঃ) বিশেষ অবদান রয়েছে। মামলুক ও উসমানী শাসনাধীন অঞ্চলে

Dhaka University Institutional Repository

দলীলপত্র লিখনে ব্যবহৃত হত।[৭৫] সপ্তদশ শতাব্দীতে তুরস্কের প্রখ্যাত লিপিকার হাকিম ওসমান তাওকীর উৎখাত সাধন করতেন।[৭৬]

৭. রিকা লিপি

রিকা শব্দের অর্থ ক্ষুদ্রপাতা। এটিকে রুকয়া'হও বলা হয় যার অর্থ ছোট পরিমাপের কাগজ। এ ধারাটি সুলুস ও নাসখী থেকে সরাসরি এসেছে। এর হরফগুলো জ্যামিতিক গঠনের মত এবং পূর্ণ হরফগুলো তেজোদীপ্ত। এ লিপিটি সুলুসের সাথে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও এর আকৃতি সুলুসের চেয়ে বেশ সংক্ষিপ্ত এবং গোলায়িত অংশগুলো একটু বেশি পরিমাণে গোলায়িত হয়ে থাকে।

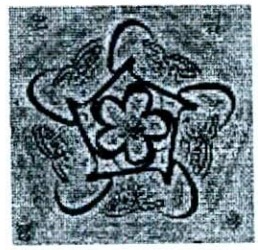

এ লিপির উল্লম্ব রেখার মাথায় আঁকশী বা কাটা থাকেনা। মাঝের কাঁসাকৃতি অংশগুলো ভরাট হয়ে থাকে। এর বন্ধনীগুলো পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ লিপিতে শব্দের শেষ হরফকে পরের শব্দের প্রথম হরফের সাথে মিলানোর বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এর রেখাগুলো সর্পিল সর্পের মত লীলায়িত ভঙ্গিতে অথবা জলধারার তরঙ্গের মত সাবলীল ছন্দে প্রসারিত।

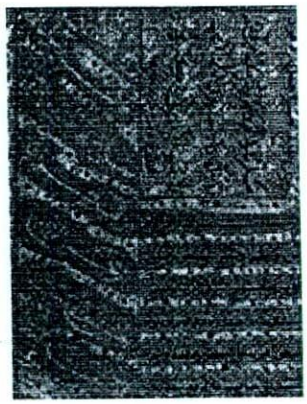

আক্ষরিক বিন্যাসের দিক থেকে সুলুসের সাথে রিকার সাদৃশ্য থাকলেও এর বক্ররেখাগুলো অধিকতর গোলাকৃতি এবং সমান্তরাল ও খাঁড়া হরফগুলো পরস্পর জড়িত। এ জন্য সুলুস অপেক্ষা রিকা লিপি বেশি আলঙ্কারিক। এম. জিয়াউদ্দিন বলেন- ইসলামী লিপিকলার আলঙ্কারিক শৈলীগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুষমামণ্ডিত হচ্ছে- রিকা।[৭৭] এ লিপিশৈলী টানা লেখার জন্য উপযোগী। তাই এটি ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লিখন এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বৈষয়িক গ্রন্থ লেখার কাজে ব্যবহৃত হয়। এ লিপিকে সাধারণত মধ্যম মাপের কাগজে ব্যবহার করা হয়। এটি ওসমানীয় ক্যালিগ্রাফারদের মাঝে বেশ জনপ্রিয় ছিল। এ জন্য এ লিপিতে বেশি উন্নতি সাধিত হয় বিখ্যাত ওসমানীয় ক্যালিগ্রাফার শেখ হামিদুল্লাহ আল আমাসী (মৃত্যু- ১৫২০ খৃঃ) এর সময়ে। অন্যান্য লিপি থেকে এটি সাধারণভাবে উন্নতি লাভ করে জনপ্রিয়তা অর্জন করে

Dhaka University Institutional Repository

এবং বৃহত্তর পরিসরে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানেও আরব বিশ্বে এ লিপিটি পরিমার্জিত ও সংশোধিত রূপে ব্যাপকভাবে চিঠিপত্র লেখার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কয়েকটি অপ্রধান ধারা

ইসলামী ক্যালিগ্রাফিতে প্রধান প্রধান ধারা বা লিপিশৈলীর পাশাপাশি আঞ্চলিক প্রভাবে আরও কতগুলো ধারার উন্মেষ ঘটেছে এবং এ গুলোর মাঝে কিছু ধারা ইতোমধ্যে বিলুপ্তও হয়ে গেছে। আবার কোন কোনটি সংস্কার হয়ে আজও টিকে আছে। এ অপ্রধান ধারাগুলির উদ্ভব ও এদের টিকে থাকার পেছনে কপিতপয় ক্যালিগ্রাফারের স্বকীয়তা, জনসাধারণের সৌন্দর্যপ্রিয়তা এবং পর্যায়ক্রমিক কয়েকজন উৎসর্গীকৃত ক্যালিগ্রাফারের অবদান রয়েছে। ওসমানীয় ক্যালিগ্রাফারগণ দু'টি ধারার আবিষ্কার ও জনপ্রিয় করে তুলেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে দিওয়ানী আর অপরটি হচ্ছে তুঘরা লিপি। নিম্নে এ দু'টি সহ বাকি অপ্রধান ধারাগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করতে প্রয়াস পাব।

৮. দিওয়ানী লিপি

শৈলী ও নান্দনিকতায় সমৃদ্ধ লিপি হিসেবে দিওয়ানী লিপি ক্যালিগ্রাফিতে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। শৈলীতে দক্ষতা অর্জন করার জন্য এ লিপিটি আত্মস্থ করা অতীব জরুরী। ১৬ শতকে ওসমানী তুর্কী ক্যালিগ্রাফারগণ এ লিপিটিকে আবিষ্কার ও ক্যালিগ্রাফির অন্যতম প্রধান লিপি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। দিওয়ানী লিপিও সাসানীয় শাসনামলে তুর্কী ক্যালিগ্রাফারদের উদ্ভাবিত গোলায়িত লিপির একটি ধারা। শৈলী ও নান্দনিকতায় সমৃদ্ধ লিপি হিসেবে ক্যালিগ্রাফিতে দিওয়ানী লিপি একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। শৈলীতে দক্ষতা অর্জন করার জন্য এ লিপিটি আয়ত্ত করা খুবই প্রয়োজন। এ ধারার লিপিতে ব্যবহৃত হরফগুলো পরস্পর পরস্পরের সাথে জড়ানো থাকে এবং এগুলো বক্রাকার হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের আমলে বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার মুহাম্মদ ইবরাহীম মুনিফ তুর্কী 'তা'লিক' থেকে এ লিপির

আবিষ্কার করেন। অতপর ক্যালিগ্রাফার হাফিজ উসমান একে শিল্পমানে উন্নীত করেন এবং পরবর্তীকালে শেখ হামিদুল্লাহ এ লিপির চরম উৎকর্ষ সাধন করেন। এ লিপির নাম থেকেই এর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। সরকারি অফিস-আদালতে এ লিপি ব্যবহৃত হয়। কারণ অত্যন্ত দ্রুত লেখার কাজে একে ব্যবহার করা যায়। আঞ্চলিক রীতিতে বিশেষ মোটিভে দিওয়ানী রীতির ব্যবহার হলে তা দিওয়ানী জালী নামে পরিচিত। এ লিপির আরেকটি নাম আছে যাকে হুমায়নি বা রাজকীয় লিপি বলা হয়।[৭৮]

৯. তুঘরা লিপি

তুঘরা আরবী লিপিকলার একটি সুষমামণ্ডিত ও সম্ভাবনাময় লিপিশৈলী। এর শাব্দিক অর্থ- স্বাক্ষর, মনোগ্রাম, লগো ইত্যাদি। এটি তাওকী এর সমার্থবোধক শব্দ। পবিত্র কুরআনের আয়াত বা সুরার অংশ বিশেষকে যে কোন প্রাণী যথা বাঘ, হাতি, ময়ুর ইত্যাদির আকৃতিতে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব। পাপাডোপোলা বলেন- আরবী লিপিকলার অসামান্য রৈখিক গুণাবলী এবং নির্বস্তুক বহিঃপ্রকাশের যে ধারা রয়েছে তা তরঙ্কে তুঘরা নামে এক আকর্ষণীয় লিপিশৈলীতে রূপান্তরিত হয়। মূলতঃ এটি আলাদা ধারায় কোন লিপিশৈলী নয়, বরং সুলুস, নাসখ প্রভৃতি লিপিকে চাতুর্যপূর্ণ বিশেষ কৌশলে ছাঁচে ফেলে এটি করা হয়। ভন হোমারের মতে- সুলতান প্রথম মুরাদ লিখনশাস্ত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন বিধায় তার হাতের অঙ্গুলিগুলোর বিভিন্ন নিদর্শনের অনুকরণে তুঘরার গোড়াপত্তন করেছিলেন।[৭৯] চারটি ধরনের তুঘরার কথা জানা যায়। যথা- সেলযুক বাংলার সুলতানী আমল, মিশরের মামলুক এবং ওসমানী আমলের তুঘরা।

তুঘরা লিপির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- পাশাপাশি সন্নিবেশিত হরফগুলো অত্যধিক লম্বা স্বভাবের এবং এর একটি বর্ণ অন্যটির মধ্যে প্রবেশ করে একটি সুন্দর দৃষ্টিনন্দন রূপ ধারণ করে এবং পাঠোদ্ধার কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ লিপিতে লেখার স্বাতন্ত্র্য ও মহত্ব ফুটে উঠে। একটি ক্যালিগ্রাফিতে আল্লাহ, মুহাম্মদ, (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের নাম এমন চাতুর্যের সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, তাতে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

গুণাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এ জন্য এম. জিয়াউদ্দিন যথার্থই বলেছেন- 'আরবী লিপিমালার সর্বাপেক্ষা চাতুর্যপূর্ণ কৌশল হচ্ছে তুঘরা।' এ লিপির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- কখনো কখনো নিম্নাংশে কুফী রীতিতে মানুষ ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি দ্বারা মনে হবে যে, সেগুলো উপরে নিম্নভাগে খুব ভারী ও মোটা জুতা

লিপিবদ্ধ হরফগুলোর উপরিভাগে অলঙ্কৃত। ফলে নিম্নাংশ দেখে অঙ্কিত প্রতিকৃতিগুলো দেহের পরিধান করে আছে। এরূপ অলঙ্কৃত প্যানেলটি দেখে একটি শোভাযাত্রা বলে মনে হতে পারে।

সিলমোহরের লিপি হিসেবে সুলতান উগুজ খানের আমলে তুঘরার প্রথম ব্যবহারের কথা জানা যায়। সেখান থেকে এশিয়া মাইনরের সেলযুকগণ এর রীতি ব্যবহার করেন এবং মিশরের মামলুকগণ আইয়ুবীদের (১১৭৪-১২৪৯ খৃঃ) মাধ্যমে সেলযুকীয় তুঘরার জ্ঞান লাভ করেন। আর মিশরের মামলুক শাসনামল ও বাংলার সুলতানী আমল প্রায় সমসাময়িক এবং তাদের মাঝে ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ছিল। তাই মামলুকীয় ও বাংলার তুঘরা প্রায় একই ধরনের। কিন্তু ওসমানীয় তুঘরা ওসমানীয় সুলতান প্রথম মুরাদ (১৩৫৯-১৩৮৯ খৃঃ) কয়েকটি মৌলিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে প্রবর্তন করেন। আর সেই ভিত্তিগুলো হলো-

১. আলিফ বা লামের তিনটি উল্লম্ব শিররেখা হবে যাদের দৈর্ঘ্য পর্যায়ক্রমে কমে আসবে।
২. ধনুক আকৃতির তিনটি রেখা থাকবে যার প্রথম অংশ সামান্য পিছনের দিকে গিয়ে পুনরায় সামনের দিকে গিয়ে এমনভাবে বেঁকে যাবে যাতে লম্বদণ্ডের সাথে এদের সুশৃংখল সামঞ্জস্য থাকবে।
৩. দু'টি ডিম্বাকৃতির রেখা থাকবে যাদের পিছনের দিকে ধনুকাকৃতির রূপ ধারণ করে সামনের দিকে বিকৃতভাবে গমন করবে।
৪. অন্য আরেকটি বক্ররেখা থাকবে যা পিছনের ধনুকাকৃতি দু'টি রেখাকে ভেদ করার উদ্দেশ্য উপরের দিকে উঠে হঠাৎ আবার নীচের দিকে নেমে যাবে।
৫. সবশেষে একটি ছোট আলিফ থাকবে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপরের দিক হতে ধনুক দু'টিকে ভেদ করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

কালকাশান্দীর মতানুসারে, তুঘরার পরিমাপ হবে- লম্বা ও চওড়ায় নিসফ যিরা (আধা হাত) হরফের অথবা কলমের মাপ খাঁড়া রেখার সংখ্যানুসারে বিভিন্ন ধরনের হবে।[৮০]

তুঘরা লিপির ব্যবহার বহুবিধ। বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সংঘের নাম কিংবা যেকোন সাইনবোর্ড লিখতে এ

পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। রাষ্ট্রের প্রতীক হিসেবে একে ব্যবহার করা হলেও অফিস-আদালতে, দলিল-দস্তাবেজে, স্মৃতিস্তম্ভ ও মুদ্রার গায়ে উৎকীর্ণ লিপি হিসেবে একে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। ব্যবসায় মনোগ্রাম, লগো, প্যাড, চুক্তিপত্র, ডাকটিকেট, ছাপচিত্র, পাসপোর্ট ও প্রত্যয়নপত্র ইত্যাদি তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ঘরের দেওয়ালে শোভাবৃদ্ধি, মসজিদ, ঘর-বাড়ি, হোটেল-রেস্তোরাঁ সহ প্রায় সর্বত্রই এ লিপির ব্যবহার দেখা যায়। কেহ কেহ এ লিপিকে মাদুলী হিসেবেও ব্যবহার করে থাকে। যেমন হযরত আলীর (রাঃ) শৌর্য বীর্যের প্রতীক সিংহ বা বাঘের আকৃতিতে তুঘরার প্রয়োগ হয়েছে। নাদ-ই-আলী নামে জীবজন্তুর আকৃতিতে যে সকল তুঘরার প্রয়োগ হয়েছে তা হযরত আলী (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করেই করা হয়েছে। এ সকল নিদর্শন ভূত-প্রেত এবং অশুভ প্রভা থেকে মুক্ত থাকার জন্য গৃহে রাখা হত। এ ব্যাপারে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এগুলোকে মুসলমানরাও গৃহসজ্জা ও অলঙ্করণ হিসেবে ব্যবহার করতেন। কেননা তুঘরা লিপিশৈলীতে লিপিবদ্ধ মোটিভ ঐন্দ্রজালিক নক্সার অধিকারী।[৮১]

তুঘরা লিপির ব্যবহার দেখা যায় সুলতানী আমলের স্থাপত্য রীতিতে। কম্পিউটারের খোদিত বিভিন্ন শিলালিপির বহু নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন- ৬৪৭ হিজরীতে দিন দুপুরে মাসুদ জানীর এবং ৭০৯ হিজরীতে বিহারে ফিরোজ

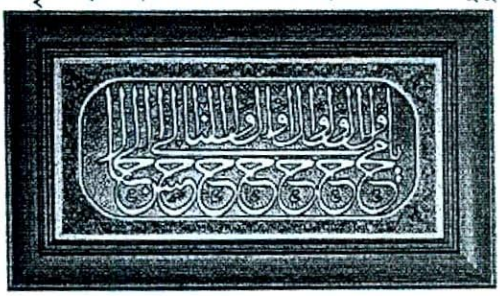

শাহের শিলালিপি, সুলতানী আমলের সমান্তরাল রেখা ও দণ্ডগুলো এমনভাবে বিন্যাস করা হয় যে, তা তীর, ধনুক, নৌকা ও দাঁড়, তরবারী হাতে কুচকাওয়াজরত সৈন্য বাহিনীর মত মনে হত। এজন্য সামসুদ্দীন আহমদ বলেছেন- 'মুসলিম লিপিকলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং আলঙ্করিক রীতিতে উদ্ভুত রীতি হচ্ছে তুঘরা।'[৮২] এছাড়া ৮৬০ হিজরীতে ভাগলপুরে মাহমুদ শাহের, ৮৭৯ হিজরীতে

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান গঞ্জে ইউসুফ শাহের, ৮৯৮ সালে মালদায় মুজাফ্ফর শাহের, ৮৮৪ সালে গৌড়ের দারসবাড়িতে ইউসুফ শাহের এবং ৯০৪ সালে রাজশাহীতে হোসেন শাহের শিলালিপি উল্লেখযোগ্য। তাই সামসুদ্দীন আহমদ যথার্থই বলেছেন- হোসেন শাহী আমলে আলঙ্করিক লিপিকলার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তুঘরা লিপিশৈলীর ব্যতিক্রমধর্মী অথচ সৃজনশীলতার শৈল্পিক প্রকাশ দেখা যায় 'বিসম আল্লাহ আর রাহমান আর রাহীম' দ্বারা গঠিত একটি নাশপাতিতে অথবা ঈমানে মুফাসসাল দ্বারা গঠিত একটি নৌকার আকৃতিতে।

১০. নাসতা'লিক লিপি

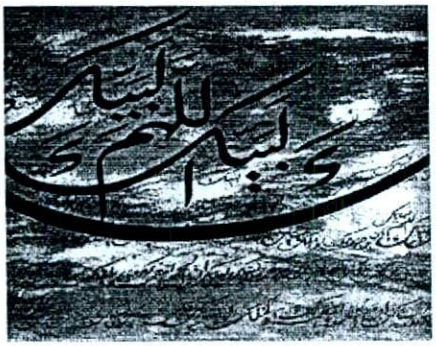

আরবী ক্যালিগ্রাফির অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হচ্ছে- নাসতা'লিক। যা লিপিকলাকে স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দিয়েছে। আরবী নাসখ এবং ফার্সী তা'লিক লিখন পদ্ধতির সংমিশ্রণে এ লিপির উদ্ভব হয়েছে বলে একে নাসতা'লিক বলা হয়। অথবা নাসখ-ই-তালিক এর শব্দগত অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার সংক্ষিপ্তরূপ নাসতা'লিক হয়েছে। অর্থাৎ নাসখ অর্থ রহিতকরণ, আর তা'লিক হচ্ছে- একটি পদ্ধতি। অতএব তা'লিক পদ্ধতি বাতিল করে যে পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে তাকে নাসতা'লিক বলা হয়। নাসখী ও তা'লিক লিপি পদ্ধতির মার্জিত ও সর্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ হিসেবে এবং বিশেষ করে কুফীর কোণাকৃতি নাসখের বিপরীতে সাবলীল, বক্রাকার, স্বাচ্ছন্দ্যময়, লীলায়িত ছন্দের প্রকাশে নাসতা'লিক সার্বজনীন জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ লিপি বিশেষভাবে গোলাকৃতি ও মসৃণ আরবী নাসখ ও ফারসী নাসতা'লিক লিপিতে লিখিত হয়ে থাকে।[৮৩]

নাসতা'লিক রীতির বিশেষজ্ঞদের মতে পারস্যের প্রখ্যাত লিপিকার মীর আলী সুলতান আত তাবরিজী (মৃত্যু-১৪১৬ খৃঃ) এ লিপিশৈলীর উদ্ভাবন করেন। তিনি মুসলিম লিপিকলার সর্বোৎকৃষ্ট ও সুষমামণ্ডিত শৈলীর গঠন ও ছন্দ বিন্যাসের জন্য কতিপয় নিয়ম প্রবর্তন করেন। কথিত আছে- তিনি স্বপ্নে হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক আদিষ্ট হন যে, তিনি যেন হরফগুলোকে এমনভাবে সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিন্যাস করেন যাতে সেগুলো একটি সুন্দর উড়ন্ত পাখির সুষমামণ্ডিত পালকের মত

Dhaka University Institutional Repository

মনে হয়। নাসতা'লিক পদ্ধতির সর্বপ্রাচীন লিপি হচ্ছে- ড. হোয়েনলে কর্তৃক আবিষ্কৃত জমি বিক্রয়ের ফারসী দলীল। ড. এস. মারগলিউথ কর্তৃক প্রকাশিত এ দলিলে সন তারিখ খুব স্পষ্ট না হলেও তিনি মনে করেন এটি হিজরী ৪০১ সালে লিপিবদ্ধ করা হয় এতে প্রমাণিত হয় যে ৪০১ হিজরীর পূর্বে নাসতা'লিক লিপির উদ্ভব হয়েছে। এম. জিয়াউদ্দিন বলেন- আর্মেনিয়ার একটি প্রাচীন মসজিদে উৎকীর্ণ ফারসী ভাষার শিলালিপিতে নাসখী বা নাসতা'লিক লিপি দেখা যায়, যা বেলিন কর্তৃক আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়।[৮৪] তিনি আরও বলেন- হিজরী ৩৫১ সালে কুফী রীতিতে উৎকীর্ণ এ শিলালিপিটি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে, গোলাকার নাসখী কিংবা নাসতা'লিক লিপিকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোণাকৃতি দেখানো হয়েছে।

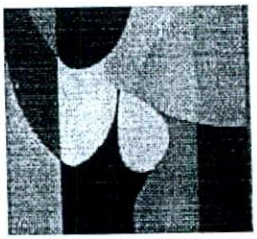

নাসতা'লিক রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- খাঁড়া দণ্ডগুলো দীর্ঘ এবং সমান্তরাল রেখাগুলো গোলাকৃতি। এর বক্রাকার রেখাগুলো সম্পূর্ণরূপে এমন গোলাকার রূপ ধারণ করে যে, তা একফালি চাঁদ বা ডিমের আকার ধারণ করে। সাফাদী বলেন- Its clarity and geometric purity combine to make Nastaliq seemingly casual elegance which belies its highly sophisticated and stricly applied rules.[৮৫] নাসতা'লিক পদ্ধতিতে শব্দে ব্যবহৃত বর্ণের গোলায়িত পরিসরকে বিস্তৃত করা হয় ও বাঁক সমূহ ঢালু করা হয় এবং তা বিশেষভাবে শব্দ ও বর্ণের শেষপ্রান্তে লক্ষ্য করা যায়। এর লিপিমালাকে উত্তাল তরঙ্গে মধ্যভাগের ঢালু পরিসরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। উপরন্তু সরলী করণের মাধ্যমে কোন কোন বর্ণের দাঁত লোপ করে কলম এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যে, তার ক্রমশ ঢালু রূপ লেখার তড়িৎ গতিতে সহায়তা দান করে। এ পর্যায়ে সিন (س) ও শিন (ش) বর্ণের উদাহরণ পেশ করা যায়। সাধারণভাবে লেখার সময় সিন ও শিন অক্ষরদ্বয়ের তিনটি মারকায বা খাড়া দাঁত থাকে। কিন্তু নাসতা'লিক লিখন পদ্ধতিতে তিনটি দাঁত লোপকরে ঢালুভাবে উক্ত বর্ণদ্বয়কে এভাবে (ـسـ) বিন্যাস করা হয় বর্ণের এ ঢালু বিন্যাসকে অনেক সময় আঁকা-বাঁকা ও তরঙ্গায়িত বলেও মনে হয়। এ পদ্ধতিতে লিখতে সময় কম লাগে এবং এর লিপিশৈলী সমঝদারের মনকে আকৃষ্ট করে।

নাসতা'লিক লিপিশৈলী পারস্য ও ভারত উপমহাদেশে সর্বাধিক মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর সৌন্দর্য, গীতিময়তা স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীল ভঙ্গি সহজেই অনুমেয়। এর হরফগুলোর পুনর্গঠন এবং গোলাকার আকৃতি এ লিপিশৈলীকে মাধুর্য দিয়েছে। এম. জিয়াউদ্দিন বলেন- এর পূর্ণাঙ্গ সমান্তরাল

Dhaka University Institutional Repository

রেখাকৃতি আরবদের দ্বারা পারস্য বিজয়ের বহু পূর্বে পাহলভী লিপি দীর্ঘকাল লিখনের ফলে সম্ভবপর হয়েছিল।[৮৬] নাসতা'লিক লিপি বহু শতাব্দীতে এ লিপি দিয়ে গ্রন্থাবলী কাব্যগ্রন্থ প্রথম এ লিপিতেই লিখিত ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী লিপিকরণ এবং পৃষ্ঠার প্রান্তদেশে লিখিত প্রমাণিত হয় যে, লিপিকলার

পূর্বে আবির্ভূত হলেও ত্রয়োদশ লিপিবদ্ধ করা হয়। ফারসী হয়। নাসখীতে কুরআন শরীফ এবং দু'টি পদ্ধতির মধ্যভাগে নাসতা'লিক এর ব্যবহারের দ্বারা ক্রমবিকাশের প্রথম স্তর হতেই নাসখ অপেক্ষা নাসতা'লিক পারস্যে অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[৮৭] কুণ্ডলাকৃতি মেঘের আবরণে নাসতা'লিক এবং সমান্তরাল দু'টি লাইনের লিপিবদ্ধ নাসতা'লিক বিশেষভাবে আকর্ষণীয়।

নাসতা'লিক লিপিশৈলী পারস্য ও ভারত উপমহাদেশে সার্বজনীনভাবে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। পারস্যের সাফাভী সুলতান শাহ তাহমাসপের রাজত্বে নাসখীর পরিবর্তে নাসতা'লিক অধিকতর মর্যাদা লাভ করে এবং শাহ আব্বাসের শাসনামলে অসংখ্য লিপিকার নাসতা'লিক লিপিশৈলী চর্চা করে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন। মীর আলী আল সুলতান আত তাবরিজী এ লিপি প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে ১৫৩৯ খৃস্টাব্দে শাহ মাহমুদ এ লিপিতে কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করেন। যে সকল খ্যাতনামা লিপিকার নাসতা'লিক লিপিশৈলীতে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন তাদের মধ্যে আব্দুর রহমান আল খাওয়ারেজমী, কাসেম সাদী, কামাল উদ্দিন হিরাতী, গিয়াস উদ্দিন আল ইস্পাহানী ও ইমাদ উদ্দিন আল হুসাইনী উল্লেখযোগ্য।[৮৮] আল হুসাইনী তার জীবদ্দশায় সর্বশ্রেষ্ঠ লিপিকার হিসেবে কিংবদন্তীতে পরিণত হন। মুঘল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় লিপিকলা চরম উৎকর্ষতা লাভ করে এবং পারস্যে লিপির অনুকরণে নাসতা'লিক লিপিশৈলী বিশেষ আঙ্গিক ও লিখনরীতির রূপ পরিগ্রহ করে। যে সমস্ত লিপিকার মুঘল দরবারে অসামান্য খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- আগা আব্দুর রশীদ, মুহাম্মদ হুসাইন কাশ্মীরী, আব্দুর রহমান খান-ই-খানান।

Dhaka University Institutional Repository

১১. তা'লিক লিপি

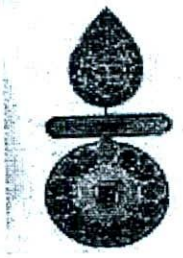

তা'লিক এর শাব্দিক অর্থ- ঝুলন্ত। আরব ঐতিহাসিকদের মতে এ লিপিশৈলী পারস্য লিপিকারদের ব্যবহৃত নবম শতাব্দীর বক্রাকার আরবী লিখন পদ্ধতি ফিরামুজ থেকে উদ্ভূত। অপরাপর বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন- তা'লিক নবম শতাব্দীতে প্রচলিত রিয়াসী লিপিশৈলী থেকে বিবর্তন হয়েছে। এর লিপিতে তাওকী ও রিকা লিপিশৈলীর প্রভাব খুবই স্পষ্ট। তা'লিক লিপির গঠনশৈলী ও বিন্যাস এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে, তা নাসখী ও নাসতা'লিক লিপি পদ্ধতির মধ্যবর্তী অবস্থানে বিরাজমান। আলঙ্কারিক পদ্ধতিতে তীর্যকভাবে লিখিত হয় বলে এটি ঝুলন্ত বলে মনে হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে সাফাভী আমলে তা'লিক লিপিশৈলীর চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। পারস্যের মৃৎপাত্রে তা'লিক রীতির ব্যবহার দেখা যায়।

তা'লিক লিপি পদ্ধতিতে সরল ও ঋজুদণ্ডের ব্যবহার অপ্রতুল। তাজ-ই-সালমানী ও আব্দুল হাই এ পদ্ধতির উদ্ভাবন ও এর বিন্যাসে বিশেষ অবদান রাখেন। কিন্তু তা'লিক লিখন পদ্ধতির প্রচলন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বরং খৃস্টীয় চর্তুদশ শতাব্দীতে নাসখ ও তা'লিক পদ্ধতির সংমিশ্রণের ফলে নাসতা'লিক নামের অধিক গোলায়িত ধারার সৃষ্টি হয়। শাহ ইসমাঈল (১৫০২-২৪ খৃঃ) এবং তার উত্তরাধিকারী শাহ তাহমাসপ সরকারি লিপি হিসেবে

তা'লিকের প্রচলনের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করেন। উল্লেখ্য যে, আরবদেশে তা'লিকের সার্বজনীন ব্যবহার না থাকলেও পারস্য, তুরস্ক ও মুঘল ভারতে এ লিপি সমধিক মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[৮৯] যেমন- পারস্যের বিখ্যাত লিপিকার ইমাদ আল হুসাইনীর লিপিকর্ম।

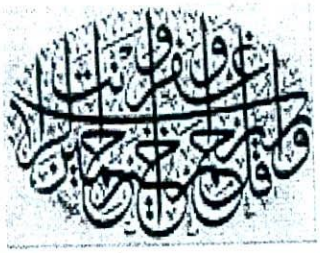

১২. শিকাসতা লিপি

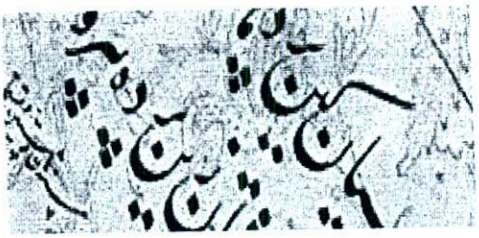

শিকাসতা শব্দের অর্থ ভঙ্গুর বা খাপছাড়া। তা'লিক ও নাসতা'লিক থেকে উদ্ভূত শিকাসতা লিপি মূলত এক ধরনের সংকেত লিপি। দ্রুত লিখনের জন্য উপযোগী এ

Dhaka University Institutional Repository

লিপি নাসতা'লিকের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এ লিপিতে ব্যবহৃত হরফ সমূহের একটিকে অপরটির সাথে এমনভাবে সংযোগ করা হয় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ণমালার আসল রূপ অবশিষ্ট থাকেনা বরং সেগুলোকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা আকৃতির মনে হয়। এ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ডানের হরফকে কাগজ হতে কলম না তুলে বামের হরফের সাথে যোগ করে দেয়া এবং এভাবে আগাগোড়া লেখার কাজ সম্পন্ন করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে বর্ণমালার নোকতা বা স্বরচিহ্ন ব্যবহার করা হয় না। এ লিখন পদ্ধতিতে আলিফ, দাল বা ওয়াওকে তাদের পরবর্তী হরফের সাথে যোগ করে দেয়া হয়। তাছাড়া প্রয়োজনবোধে বা, আইন, নুন, ইয়া ও লাম আলিফ বর্ণসমূহের আকৃতি পরিবর্তন করে লেখা হয়। আর বাকি হরফগুলো নাসতা'লিকের মতই লেখা হয়।[৯০]

এ পদ্ধতির লিপিতে হরফগুলো কদাচিত অসংলগ্ন থাকে। উপরন্তু হরকত ও স্বরচিহ্নের ব্যবহার দেখা যায় না। যদিও প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে যে, এটি খুবই অবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ তবুও এ প্রক্রিয়ায় লিপিকরণের জন্য যথেষ্ট অভ্যাস এবং মননশীলতার প্রয়োজন হয়। এ লিপির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এর হরফগুলো বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অন্যান্য শৈলীর মত থাকেনা। বরং বিক্ষিপ্ত এ হরফগুলো বিন্যস্ত থাকে। মুঘল ভারতেও দেখা যায়। যেমন- নওয়াব সুবিদ খ্যাতনামা লিপিকার ছিলেন দরবেশ সপ্তদশ শতাব্দীতে এ পদ্ধতি প্রচলিত লিখনরীতি সত্ত্বেও এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ

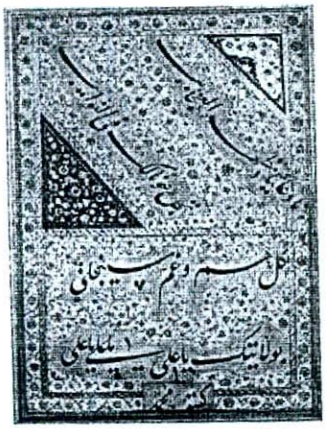

পরস্পরের সঙ্গে জড়িত সমান্তরাল অথবা লম্বালম্বিভাবে শিকাসতা লিপিরীতির প্রয়োগ খানের লিপিকর্ম। এ রীতির আব্দুল মজিদ তালিকানী। ছিল। তবে জটিলতা ও অসংলগ্ন লিপিশৈলীটি অতিদ্রুত লেখার জন্য বেশি উপযোগী। এ জন্য আদালত-সচিবালয় ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এ রীতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। এ লিপিতে বক্ররেখা গুলো কলমের দ্রুত আঁচড়ে অবিন্যস্ত রেখামালায় পরিণত হয়। সুদক্ষ লিপিকার হরফগুলোর অংশ বিশেষকে দ্রুত লিখন রীতি দ্বারা সুষমামণ্ডিত এক আলঙ্করিক লিপিতে রূপান্তরিত করেন। তবে পঠনের জন্য এ লিপিশৈলী খুবই জটিল।[৯১]

Dhaka University Institutional Repository

শিকাসতার একটি উপরীতি হচ্ছে 'শিকাসতা আসীজ'। অফিস-আদালতে বহুল প্রচলিত এ শৈলীতে হরফগুলো মূলরীতির হরফ অপেক্ষা দীর্ঘ এবং মাত্রাধিকভাবে অসংলগ্ন। সাধারণত 'শিকাসতা আসীজ' রঙিন অথবা অলঙ্কৃত কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়।

১৩. ঘুবার লিপি

ঘুবার শব্দের অর্থ- উড়ন্ত বালুকণা বা অতিক্ষুদ্র বালুকণা। এটি বক্রাকার লিপিকলার অন্যতম একটি প্রকরণ। এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত বর্ণমালার উল্লম্ব দণ্ড ও আনুভূমিক বাহু অতি ক্ষীণ ও সরু। অতি সাধারণ ও প্রাঞ্জল রীতিতে লিপিকৃত এ শৈলীর নামকরণ করা হয়েছে ঘুবার। কেননা এ লিপিতে লিখিত হরফগুলো এতই ক্ষুদ্র যে, তা দেখে মনে হবে যেন উড়ন্ত বালুকণা আর তা দেখতে আতশী কাঁচের সাহায্য নিতে হয়। এটি খুব ছোট কাগজে ক্ষুদ্র পরিসরে ক্ষুদ্রাকৃতির হরফে লিখতে হয়। আগে যুদ্ধের সময় এ লিপিতে লিখে

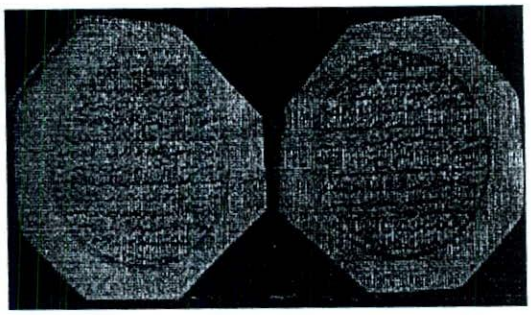

কবুতরের মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণ করা হতো। এর প্রকৃত নাম- ঘুবার-আল-হালবাহ। নবম শতাব্দীতে খলিফা আল-মামুনের রাজদরবারে দলিল দস্তাবেজে ব্যবহৃত রিয়াসী লিপি থেকে আল-আহওয়াল-আল-মুহাররির এ লিপিটির উদ্ভাবন করেন। এতে নাসখ ও সুলসের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগত ছাপ লক্ষ্য করা যায়। মূলতঃ অসাধারণ দক্ষতা ও শৈল্পিক গুণাবলী ব্যতীত কোন লিপিকারের পক্ষে এর ক্ষুদ্র হরফে কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধ বা রাজকীয় চিঠিপত্র লেখা সম্ভব নয়।

মুসলিম জাহানের অনেক লিপিকার এ লিপিশৈলীর চর্চায় সুনাম অর্জন করেন। ইসমাইল ইবনে আবদ আল্লাহ ওরফে ইবন আল জামাকজালী (মৃত্যু-১৩৮৬ খৃঃ) ও কাশিম ঘুবারি (মৃত্যু-১৬২৪ খৃঃ) এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তুরস্কের হাফিজ উসমান ঘুবার লিপিতে পবিত্র কুরআন ও আরও কিছু কথা সহ ৭৭,৯৩৪ টি শব্দ মাত্র একটি ডিমের খোলসে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাছাড়া মাত্র ৫০/৫৪ সেন্টিমিটার পরিমাপের একটি কাগজে সমগ্র কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করার নজিরও রয়েছে। শুধু তাই নয়, মিসরের হাসান আবদ আল জাওয়াদ একটি গমের দানায় কুরআন শরীফের তিনটি সুরা লিপিবদ্ধ করেছেন।[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

১৪. ইযাযা লিপি

ইযাযা শব্দের অর্থ অনুমতি, সম্মতি ইত্যাদি। এটিও গোলায়িত ধারার একটি লিপিশৈলী। আব্বাসীয় আমলে খলিফাগণ সরকারি অফিস-আদালতে, কাগজ-পত্রের মাধ্যমে কোন ব্যাপারে অনুমোদনের জন্য এ লিপিশৈলী ব্যবহার করার নির্দেশ দিতেন। এটি উল্লম্ব রেখার এক-চতুর্থাংশ এবং গোলায়িত বাহুতে তিন- চতুর্থাংশ অনুপাতে হয়ে থাকে। ব্যাপকভাবে লেখালেখির জন্য এ রীতির প্রচলন না থাকলেও বর্তমানে অলঙ্কৃত লিপি হিসেবে এটি বই-পত্রের প্রচ্ছদ ও টাইটেল পেজে স্বল্পমাত্রায় ব্যবহার করতে দেখা যায়।

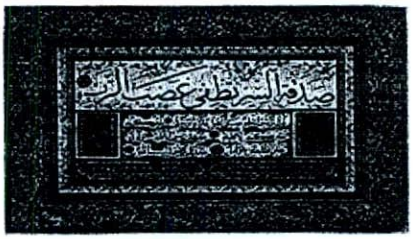

১৫. গুলজার লিপি

গুলজার লিপিটি মূলতঃ একটি ভিন্ন রকম লিখনশৈলী। যাতে কলমের আঁচড়ে হরফের পরিলেখ সৃষ্টি করে অলঙ্কার সম্বলিত ফুল, মাছ, বিভিন্ন প্রাণী ও নানাবিধ নকশার মাধ্যমে সাজানো হয়। যেমন- গুলজার (রেখা), মাহি (মাছ) ইত্যাদি। মুঘল আমলে ঢাকায় কাগজ কলমে এবং কিতাবের পাতায় এ রীতির চর্চা দেখা যায়। এতে স্বচ্ছন্দ কলমের টানে রচিত রেখালিপির মোটা দাগগুলোর মধ্যে কালি মুছে ছোট ছোট ফুলের রূপরেখা জুড়ে দিয়ে অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয় প্রতিটি হরফে। কিন্তু তার কলমের টানের স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষিত হয় মিহি রেখাগুলোর ধারাবাহিকতায়। স্বভাবত কাগজ কিংবা প্রস্তরফলকে এ রেখালিপির লিখন বা অনুকরণ চতুষ্কোণ আয়ত পরিধিতেই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

১৬. তাউস লিপি

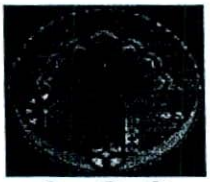

তাউস মূলতঃ কোন লিখনশৈলী নয়। কেননা এ রীতিতে প্রচলিত ধারায় কলম দিয়ে লেখা হয় না বরং কলমের আচঁড়ে প্রথমে হরফের একটি পরিলেখ সৃষ্টি করা হয় এবং পরে আলঙ্কারিক রেখা বা ফুল, লিপি, ময়ুর, জ্যামিতিক নকশা, মৃগয়ার দৃশ্য প্রভৃতি প্রতিকৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। আলঙ্কারিক মোটিভের উপর নির্ভর করে এর নামকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন- তাউস (ময়ুর) ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

লিপিশৈলীতে হরফগুলোকে সমান্তরাল ও খাঁড়াভাবে এরূপ বিন্যাস করা হয় যে, সামগ্রিকভাবে তা ময়ুরের আকৃতি ধারণ করে। রেখা দ্বারা সৃষ্ট হরফের অভ্যন্তরের খালি স্থান ময়ুরের পেখম ও পালক দ্বারা অলঙ্কৃত থাকে।[৯০] তাউস অর্থ ময়ুর। এ লেখন রীতি যেহেতু পুরোপুরি ময়ুরের মতো দেখা যায়, তাই একে তাউস বলা হয়।

১৭. সাক্কি বা লারজা লিপি

সাক্কি বা লারজাও তেমন কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বা লিপিশৈলী নয়। বরং গুলজার ও তাউস এর মতোই আরেকটি অভিনব অলঙ্কারিক শৈলী। এর হরফগুলো দেখতে দাঁতওয়ালা করাতের মতো এবং বাঁকানো পল্লবের মতো মনে হয়। এ ধরনের লিখন পদ্ধতিতে লিপিকরণের সময় উত্তেজিতভাবে কম্পমান হাতে কলম ব্যবহার করা ছাড়া আর তেমন কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না।

১৮. তাজ লিপি

তাজ অর্থ মুকুট বা শাহী টুপি। কিছু কিছু হরফ আছে যে গুলোর উপরিভাগকে গম্বুজের আকৃতির মতো রূপ দেওয়া যায়। এ রকম হরফগুলো দ্বারা যে লিপিশৈলীর সৃষ্টি হয় তাকে তাজ বলে। আবার কখনও কখনও এগুলোকে পাগড়ী বা শিরস্ত্রাণের মত দেখা যায়।

১৯. জুলফ-ই-আরুশ লিপি

জুলফ অর্থ বেণী আর আরুশ অর্থ বধু। সুতরাং জুলফ-ই-আরুশ অর্থ বধুর বেণী। এটি রায়হানী ও নাসতা'লিক লিপির সমন্বয়ে বিশেষ একধরনের লিপিশৈলী। লিপিতে হরফের সমান্তরাল রেখাগুলোর শেষপ্রান্ত থেকে বক্রাকারে কুণ্ডলাকৃতি হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত

Dhaka University Institutional Repository

হয় এবং খাঁড়া দণ্ডগুলো ৪৫ ডিগ্রি নাতিদীর্ঘ প্রস্থে ক্ষীণ পরিসর গ্রহণ করে এবং ৪৫ ডিগ্রি বরাবর নীচে নেমে আসে তাকে জুলফ-ই-আরুশ বলে। এটি নাসতা'লিক লিপিশৈলীর অধিকতর নিকটবর্তী একটি আলঙ্কারিক লিপিশৈলী।[৯৪]

২০. খত-আল-মানসুব

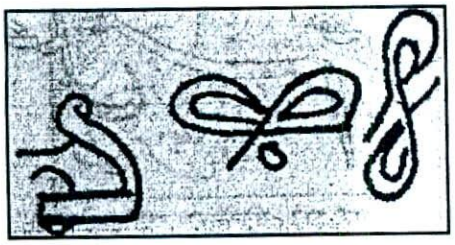

খত-আল-মানসুব হচ্ছে- অদ্ভুত ও ব্যতিক্রমধর্মী এক ধরনের লিপিশৈলী। এ লিপিতে হরফগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- ফিতা বা রিবনের মতো জড়ানো স্বভাবের। এ লিপির লেখা দেখলে মনে হবে ফিতা বা রবারকে জড়িয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া এ লিখন রীতিতে হরফগুলোর শেষপ্রান্তকে ফাঁসের মতো দেখা যায়।

২১. খত-আল-হুর

হুর শব্দের অর্থ স্বাধীন। এটিও খত-আল-মানসুব এর মতো একটি ফিতা লিপি। তবে এটি তার চেয়ে কিছুটা সংস্কারধর্মী ও আধুনিক লিপিশৈলী। এ রীতিতে ফিতার বাঁকগুলো দেখলে মনে হয় যেন ফিতা বা সুতা দিয়ে কোন কিছুকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

২২. খত-আল-সুম্বুল

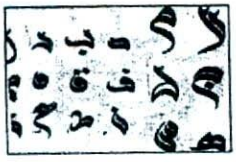

সুম্বুল অর্থ প্রতীক বা নমুনা। কোন অফিস, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের লগো বা মনোগ্রামের জন্য মনোনীত বিশেষ ধরনের এক লিপির প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় তাকে খত-আল-সুম্বুল বলা হয়। এ লিপির মাধ্যমে বিভিন্ন মনোগ্রাম বা লগো তৈরী করা হয়। এটি অনেকটাই তুঘরাশৈলীর মতই।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. মুসান্না বা আয়নালী

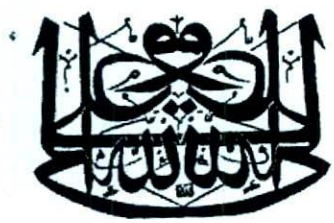

মিরর বা দর্পণ লিপিকে মুসান্না বা আয়নালী লিপিশৈলী বলে। এটি মূলত কোন লিপিকে সরাসরি উল্টো করে লেখা হয়। আয়না বা দর্পণের সামনে কোন সোজা লেখা ধরলে তা যেমন উল্টো দেখা যায় ঠিক তেমনি এ লিপি উল্টোভাবে লিখতে হয় বিধায় একে মুসান্না বা আয়নালী লিপিশৈলী বলে। আবার একে মাকুস বা Reflected তথা প্রতিফলিত লিপিও বলা হয়ে থাকে।

২৪. বিহারী লিপি

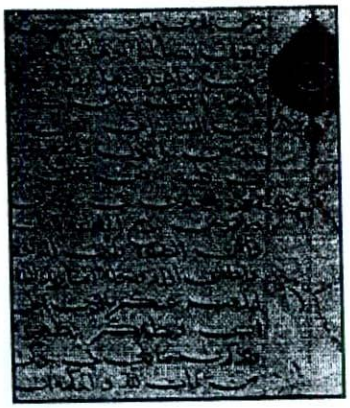

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম লিপিকলায় একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শৈলী হচ্ছে- বিহারী লিপি। চতুর্দশ শতাব্দীতে উদ্ভূত এ লিখন রীতির অলঙ্কারিক সৌন্দর্য বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। গঠনগত দিক থেকে এটি কিছুটা নাসখীর মতো। কিন্তু সমান্তরালভাবে লিখিত হরফগুলো প্রথমে ক্ষীণ হতে শুরু করে পরে বাম দিকে মোটা হতে থাকে। এর শেষাংশ রায়হানীর মতো সূচাগ্র অথবা নাসতা'লিকের মতো ভোতা বা স্থূল বিন্দুতে পরিসমাপ্তি ঘটে। এ লিখনশৈলী আফগানিস্থানেও প্রচলিত ছিল। সাফাদী মনে করেন- 'বিহারী' লিপিশৈলী পরবর্তীকালে ওসমানীয় সাম্রাজ্যে 'মিয়াকা' নামে এক লিখনরীতির উন্মেষের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে।

আর আরব বিশ্বে এর ব্যবহার খুব একটা দেখা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন, পূর্ব ভারতের বিহার প্রদেশের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে একে বিহারী লিপি নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ লিপির উৎপত্তিকালও সুনির্দিষ্ট করে বলা দুরূহ। বিভিন্ন জায়গা হতে প্রাপ্ত উপকরণের ভিত্তিতে ধারণা করা হয় যে, এ লিপিরীতি হিজরী ৭ম ও ৮ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ভারত বা এর পার্শ্ববর্তী আফগানিস্তানে উৎপত্তি লাভ করে।[৯৫] সাফাদী বলেন- A mirror script during Behari appeared in India during the fourteenth century. এ লিপির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- এতে অক্ষরগুলো প্রথমত ক্ষীণভাবে শুরু হয়ে ক্রমে ক্রমে মধ্যভাগে এসে মোটা রূপ ধারণ করে এবং পুনরায় ক্ষীণ হতে শুরু করে। আবার ক্রমে শেষ ভাগে গিয়ে ক্ষীণতর রূপ ধারণ করে।[৯৬]

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আরবী লিখন পদ্ধতিঃ

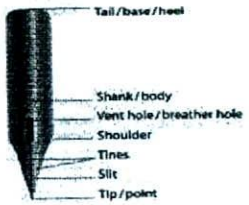

সারা বিশ্বে প্রায় ৫ হাজারেরও বেশি ভাষা বিদ্যমান। এসব ভাষার একেকটির লিখন পদ্ধতি একেক ধরণের। কোনটি ডান থেকে শুরু হয় আবার কোনটি বাম থেকে। আবার এদের অক্ষরের গঠন ও আঙ্গিক বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন- বাংলা হরফ লিখতে আমরা যেভাবে কলম ধরি এবং বাম থেকে ডান দিকে লিখে যাই আরবী হরফ লিখতে সেভাবে লেখা যায় না। আরবী হরফ লিখার জন্য মধ্যমা আঙ্গুলে কলমটি রেখে শাহাদাত ও বৃদ্ধ আঙ্গুলি দিয়ে যথাক্রমে ডান ও উপর থেকে চাপ দিয়ে অনামিকা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল গুলোকে বিছিয়ে দেই এরপর কলমের মাথাকে ৩৫ ডিগ্রি থেকে ৪৫ ডিগ্রি বরাবর রেখে ডান থেকে বামে লেখা শুরু করি। আরবী ভাষার বর্ণমালায় ১৮ টি স্বতন্ত্র আকৃতি আছে। যা নির্ভর করে একটি হরফের আগের ও পরের বর্ণমালার সাথে সংযোগের উপর। আরবী বর্ণমালায় কোন Capital letter নেই।[৯৭]

আরবী লিপির কলাকৌশলঃ

মানসম্পন্ন ক্যালিগ্রাফি করতে হলে এর কলাকৌশল ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে। উমাইয়া শাসনামল থেকে ব্যাপকভাবে এ বিষয়ে শিক্ষার শুরু হয়। আর ক্যালিগ্রাফি হচ্ছে উস্তাদ নির্ভর শিল্প। এজন্য যে সকল শিক্ষার্থী এ বিষয়টিতে দক্ষতা ও আগ্রহ বোধ করত তারা উস্তাদ ক্যালিগ্রাফারগণের কাছ থেকে বিশেষ পাঠ গ্রহণ করত। ক্যালিগ্রাফির কলাকৌশল প্রধানত মুখে মুখে এবং হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হতো। আর লেখার কলাকৌশল হচ্ছে রহস্যাবৃত ও ধারাবাহিক। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় ছাড়া এটা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। যতক্ষণ না উস্তাদ মুখে বলছেন ততক্ষণ তা স্বাচ্ছন্দ্যে লিখা সম্ভব হচ্ছে না।[৯৮] সুতরাং ক্যালিগ্রাফি শিখতে হলে মুখে বলে ও হাতে-কলমে চর্চা করতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কলম কাটার নিয়ম

কলম কাটার ৪টি নিয়ম রয়েছে। যেমন-

১. আল ফাত (সাধারণ নিয়ম- যা অনুশীলনের জন্য করা হয়)

২. আস সাক্ক (মাথা চেরা)

৩. আন নাথ (ছাটাই)

৪. আল ক্বাত (বিন্দু মাথায় কাটা)

আল ফাত: আলফাত হচ্ছে- প্রারম্ভিক অথবা স্বাক্ষর করার জন্য কিংবা অনুশীলনের জন্য কাটা পদ্ধতি। নলখাগড়ার ছালটা যদি শক্ত অথবা গর্ত গভীর হয় কিংবা নরম কিন্তু অগভীর বা মধ্যম আকৃতির হয়। সুলতান আলীর মতে- আল ফাত পদ্ধতিতে কাটা বেশি ভাল হয় না কারণসেখানে অতিরিক্ত মাতা কাটা যায় না।

আস সাক্ক: আস সাক্ক হচ্ছে- মাথা চিরে কলম কাটার পদ্ধতি। এ পদ্ধতিটি বেশি ফলদায়ক। সুলতান আলী কলমের মাথাকে মাঝ বরাবর কাটার উপদেশ দিয়েছেন, যেন কোন ভাবেই তীর্যকভাবে কাটা না হয়। এ পদ্ধতিতে জিলফার মাঝখানে কাটতে হয়।

আন নাথ: আন নাথ হচ্ছে- মাথা ছাটাই করে কাটার পদ্ধতি। এটি দু' ধরণের হতে পারে। একটি হচ্ছে পার্শ্ব ছাঁটাই আরেকটি হচ্ছে মধ্য ছাঁটাই। পার্শ্ব ছাঁটাইতে দু'পাশেই সমভাবে ছাঁটতে হয়। আর মধ্য ছাঁটাইতে খাগের মধ্যাংশে ছাঁটাই করতে হয়।

আল ক্বাত: আল ক্বাত অর্থ হচ্ছে- সুচালো মাথার নিব। এটা বেশ জটিল পদ্ধতি। কলমকে মিকাতের পিঠে রেখে কাটতে হয়। এক্ষেত্রে মিকাতটি গোলাকার হওয়া বাঞ্চনীয়। সুচালো মাতা কাটার কয়েকটি নিয়ম আছে। যেমন- তীর্যক, মসৃণ, ঋজু বা ঈষৎ বাকা পদ্ধতি।[৯৯]

বিখ্যাত ফারসী ক্যালিগ্রাফার মীর আলী হেরাত (মৃত্যু-১৫৫৬ খৃঃ) ক্যালিগ্রাফির শিক্ষানবীশদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি পরামর্শ দিয়েছেন। তাহলো- একজন ক্যালিগ্রাফারের জন্য পাঁচটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য: ১. সুদূরপ্রসারী মানসিকতা ২. ক্যালিগ্রাফির সুক্ষ্ম কারুকাজ ৩. একটি চমৎকার নমনীয় হাত ৪. প্রচণ্ড ধৈর্য ও কষ্টসহিষ্ণু সামর্থ ৫. সঠিকভাবে ক্যালিগ্রাফি করার জন্য যথাযথ যন্ত্রপাতি ও উপকরণ। এ বক্তব্য থেকেই ভাল

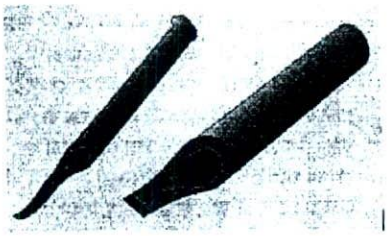

Dhaka University Institutional Repository

ক্যালিগ্রাফির জন্য মানসিকতা, সুক্ষ্ম কারুকাজ, নমনীয় হাত, ধৈর্য ও কষ্ট সহিষ্ণুতার পাশাপাশি ক্যালিগ্রাফি করার যন্ত্রপাতি বা উপকরণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। এ ক্যালিগ্রাফির উপকরণের মধ্যে কলমই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর কলমের মধ্যে হাতে তৈরী কলম দিয়ে ক্যালিগ্রাফি করাই উত্তম। তবে ফ্লাট মারকার, অথবা ধাতব কলম দিয়েও ক্যালিগ্রাফি করা যায়। কেউ কেউ তুলি দিয়ে হরফ লিখে থাকেন। ক্যালিগ্রাফি করার জন্য কলম তৈরি ও ব্যবহারের পদ্ধতি জানাটা খুবই প্রয়োজন। পাশের ছবি অনুযায়ী কলম তৈরি করে মাথাটাকে এক কোপে ৩৫ থেকে ৪৫ বরাবর কাটতে হবে। এরপর চৌকোণা নোকতা দিয়ে দেখতে হবে কলমটি সঠিক হলো কি না। ক্যালিগ্রাফার আল দাহহাকের অভ্যাস ছিল- তিনি কলমের নিব কাটার সময় আড়ালে চলে যেতেন। তাই তাঁর নিব কাটার কলা-কৌশল কেউ জানতে পারত না। ইবনে বাওয়াব কলমের নিব কাটার কলা-কৌশল সম্পর্কে বলেছেন- তোমরা এর কলা-কৌশল সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চেয়ো না। কারণ এটা আমি সযত্নে লুকিয়ে রাখি।[১০০]

কালির ব্যবহার:

ক্যালিগ্রাফি শিখতে হলে কলম কাটার নিয়মের পাশাপাশি কালির ব্যবহার জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। ক্যালিগ্রাফিতে সাধারণত কালো কালি ব্যবহার করা হয়। তবে অন্যান্য রংয়ের কালিও ব্যবহার করা যায়। চাইনিজ অথবা ইন্ডিয়ান কালো কালি লেখার জন্য বেশ ভাল। কালির সঠিক ব্যবহারের জন্য দোয়াতের ভেতরে এক টুকরো স্পঞ্জ অথবা রেশমী সুতার দলা রেখে দিতে হয়। যাতে করে দোয়াতে কলম চুবানোর সময় কলমে সমপরিমাণ কালি আসে এবং কালির অতিরিক্ত ফোঁটা পড়ে লেখা নষ্ট হয় না। এভাবে সতর্কতার সাথে ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে ক্যালিগ্রাফি করতে সহজ সুন্দর ও সাবলীল হওয়া সম্ভব।

রংয়ের অন্তর্নিহিত ভাব

ছবি আঁকা বা ক্যালিগ্রাফি যাই করি না কেন রং এর গুরুত্ব অপরিসীম। কোন বস্তুকে চিহ্নিত করার মাধ্যম হল রং। আবার রং এর মাধ্যমে মনের ভাবও প্রকাশ করা যায়। কারণ প্রত্যেকটা রংয়ের একেকটা অন্তর্নিহিত ভাবার্থ বিদ্যমান। রং

Dhaka University Institutional Repository

ছবির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং হৃদয়কে নাড়া দেয়। কারণ হৃদয়ের সাথে রং এর একটা সম্পর্ক আছে। কোন ব্যক্তির রং এর পছন্দের সূত্র ধরে তার আচরণ বলে দেওয়া যায়। তাই বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে রংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ নির্ণয় এবং তার চিকিৎসা করা হয়।

আমরা জানি প্রাথমিক বা মৌলিক রং মোট তিনটি। যথা- লাল, নীল, হলুদ। এ তিনটি রংকে প্রাথমিক রং বা অবিমিশ্র রং বলে। এ তিনটি রংয়ের আনুপাতিক মিশ্রণে মোট ৭২ টি রং তৈরি করা যায়। এসব রংকে আমরা প্রথমত ২ ভাগে ভাগ করতে পারি- উষ্ণ (Hot colour) ও শীতল রং (Cold colour)। লাল, হলুদ, কমলা, বাসন্তী এগুলো উষ্ণ রংয়ের আওতাভূক্ত এবং সবুজ, নীল, বেগুনী, ফিরোজা এগুলো শীতল রংয়ের আওতাভূক্ত। উষ্ণ রং মনকে নাচায়, চঞ্চল করে তুলে। শীতল রং মনকে স্থীর করে। উষ্ণ রংয়ের প্রবণতা সামনে এগিয়ে আসা এবং শীতল রংয়ের প্রবণতা পিছিয়ে যাওয়া। এর মধ্যে লাল রংয়ের একটা সন্মুখবর্তিতা আছে। অর্থাৎ সবগুলো রং একসাথে রাখলে লাল রং বেশি চোখে পড়ে এবং সামনের দিকে চলে আসে। লাল রং দেখলে শরীরও গরম হয়ে উঠে। যেমন- আগুন, রক্ত ইত্যাদি লাল।

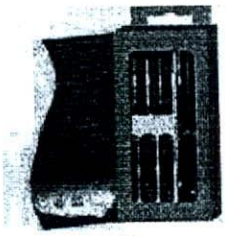

সবুজ রং উর্বরতার প্রতীক। গাছের রং এবং ফসলের মাঠের রং সবুজ। বীজ থেকে নতুন অঙ্কুর গজায়, পাতা গজায় এসব পাতার রং সবুজ। তাই সৃষ্টির প্রতীক সবুজ। সাগরের রং নীল, মেঘমুক্ত আকাশের রং নীল। এ নীলের মধ্যে প্রশান্তি আছে। তাই নদী বা সাগর মেঘমুক্ত নীল আকাশের দিকে তাকালে আমরা প্রশান্তি অনুভব করি। কিছুক্ষণের জন্য হলেও মনটা মুক্ত হয়ে যায়। গাঢ় হলুদ রং হলো আবেগের রং। তাই বাউলদের পরণের কাপড়ের রং হলুদ। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরণের বস্ত্রের রংও গাঢ় হলুদ। এরা বৈবাহিক জীবনের সব কিছু ত্যাগ করে বৈরাগ্যবাদ ধারণ করে। আবার ভালবাসার রং গোলাপী। তাই গোলাপী রং মানুষকে কাছে টানে। অবসাদ, বিষণ্নতা ও শোকের রং কালো। অন্ধকারের কোন রং নেই। তাই অন্ধকার ও মৃত্যুর রং কালো।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুকে চিহ্নিত করার জন্য, মনের আবেগকে প্রকাশ করার জন্য, ক্যালিগ্রাফির অর্থের সাথে সাদৃশ্য রেখে ব্যবহার করা যেতে পারে। মুঘল আমলে মত প্রকাশ করার জন্য রং এর রং ব্যবহার করতো। ছবি আঁকার জন্য মুসলিম শিল্পীরা সোনালী ও রূপালী থাকি। নীচে রং মিশ্রণের একটি তালিকা বাজারে আমরা বিভিন্ন রং পেয়ে প্রদত্ত হলো-

হলুদ ও নীল রং মিলে সবুজ হয়। সাদা আর লাল রং মিশালে হয় গোলাপী। লাল আর নীল রং মিশালে হয় খয়েরী। লাল আর নীল রং মিলে হয় বেগুনী। হলুদ আর লাল মিলে হয় কমলা রং। সবুজের সাথে হলুদ মিশালে হয় কলাপাতা। নীলের সাথে অল্প লাল মিশালে হয় ডীপ নীল। হলুদের সাথে হালকা লাল মিশালে হয় ডীপ হলুদ। লাল, নীল আর হলুদ মিলে হয় কালো রং। সূর্যের আলো থেকে রংধনুর সাতটি ছিটকে পড়ে। সাদা কোন জিনিসে সাতটি রং-ই পাওয়া যায়।[১০১]

বিভিন্ন ধরণের রং

ছবি বা ক্যালিগ্রাফি করার জন্য বিভিন্ন ধরণের রং ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার এসব রং ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কাগজ, কাপড়, ক্যানভাস কিংবা অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন-

১. পানি রং: কাগজে আঁকার জন্য (হ্যান্ডমেড পেপার/ কার্টিজ পেপার)
২. তেল রং: মোটা কাপড়ে বা ক্যানভাসে আঁকার জন্য ব্যবহৃত রং
৩. এক্রেলিক: কাগজে বা ক্যানভাসে আঁকার জন্য ব্যবহৃত রং
৪. বাটিক রং: সুতি বা সিল্ক কাপড়ে আঁকার জন্য ব্যবহৃত রং
৫. টেম্পরা: ডিমের ভেতরের সাদা তরল পদার্থের সাথে অক্সাই রং মিশিয়ে বোর্ডে আকার রং
৬. ফ্রেস্কো রং: দেয়াল চিত্র অঙ্কনে ব্যবহারের রং
৭. গোয়াস: কাগজে পানি রং দিয়ে তেল রংয়ের মত কাজ করাই গোয়াস

Dhaka University Institutional Repository

রংয়ের ব্যবহার

পানি রং: মনে রাখতে হবে পানি রং হলো স্বচ্ছ রং। এ রংয়ের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো- একটি রং আরেকটি রংয়ের সাথে সুন্দরভাবে মিশ্রণ হয়। এ রংয়ে দুইয়ের অধিক রং না মিশানোই ভালো। মিশালে রং ময়লা অথবা মারা যেতে পারে এবং একটি তুলি ১ম, ২য়, ৩য় বারের বেশি না চালানোই ভালো। চালালে ছবি নষ্ট হয়ে যায় এবং রং ময়লা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তেল রং: তেল রং কাপড়ের ক্যানভাসে আঁকার রং তিশির তেল, তারপিন দিয়ে রং মিশিয়ে আঁকতে হয়। রং শুকানোর পর আবার তুলি চালাতে হয়। ভেজা অবস্থায় কাজ করা যায় না। তার সুবিধা হলো যতদিন মনমত না হয় ততদিন কাজ করা যায়। তেল রং এর ছবি ওয়াটার প্রুফ হয়, দীর্ঘস্থায়ী হয়।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যপঞ্জি

১. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ১৯৯৫

২. Mediavilla-1996:17

৩. Encyclopedia of World Art

৪. আল মাওরিদ- ইংরেজি-আরবী অভিধান-১৯৬৭, বৈরুত, লেবানন

৫. خالد محمد المصرى الخطاط . مراجع للطلاب الخط العربى

৬. Mediavilla-1996:17

৭. Oxford Advanced learners Dictionery

৮. Illustrated Oxford Dictionery, Oxford, Newyork

৯. Encyclopedia Britanica

১০. শিল্পী আরিফুর রহমানের ক্যালিগ্রাফি- নাসির মাহমুদ (জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি-২০০০ প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগ)

১১. Bloom1999, P-218

১২. মুসলিম ক্যালিগ্রাফি- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-১৩

১৩. প্রবন্ধঃ ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও বিকাশ- নাছির উদ্দিন আহমদ খাঁন

১৪. প্রবন্ধঃ ইসলামী শিল্পকলা ও ক্যালিগ্রাফি- ইব্রাহীম মন্ডল, ছাত্র সংবাদ, সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা-২০০০

১৫. Islamic Calligraphy in the Medieval India-P I S Mustafizur Rahman,1979, P.-5

১৬. An Introductin to parsian art. 1930, P-102.

১৭. Parsian art- Edited by Sir E Denison Ross, P.-34

১৮. সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাতুন্নবী (সা:) স্মারক-২০০১, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

১৯. আরবী সাহিত্যের ইতিহাস- আ ত ম মুসলেহ উদ্দিন, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ-১১১

২০. মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা- ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, রাজশাহী, ১৯৯৬, পৃ-২৫৯

২১. Encyclopedia Britanica Vol.-11, P-547

২২. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, যোগাযোগ পাবলিশার্স, ঢাকা, অক্টোবর-২০০২, পৃ-১৬

Dhaka University Institutional Repository

২৩. আরবী হরফের জন্মকথা, পৃ-৩

২৪. History of the Arabs- P K Hitti, P-70-71

২৫. Ibid

২৬. আল কুরতবী- আল কাসদ, পৃ-১৭

২৭. আল খাত্তুল আরাবী- কামিল সালমান জাবুরী, দারুল মাকতাব হেলাল, লেবানন, ১৯৯৯

২৮. আল কুরতবী- আল কাসদ, পৃ-১৭

২৯. তালাতাবে- তারিখ দুয়াল-ই-আরব, পৃ-৫৮

৩০. মাহজুবাহ, জানুয়ারি-২০০৬

৩১. প্রাগুক্ত

৩২. প্রবন্ধঃ ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্পের বিকাশ, ইব্রাহীম মন্ডল

৩৩. মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখনশিল্প- ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ-৩১৬

৩৪. Ibn Ishaq- Sirat Rasul Allah, Tr. Copy, P-504

৩৫. প্রবন্ধঃ সমকালীন ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- মোহাম্মদ আবদুর রহীম, দৈনিক সংগ্রাম, ১৪ অক্টোবর-২০০৫

৩৬. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা- ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, পৃ-২৫৫-২৫৬

৩৭. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- এনামারী শিমেল, লিওজেন, ১৯৭০

৩৮. কুফী লিপি রীতি, উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য, নূরুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানুয়ারি-মার্চ-২০০৪, পৃ-৩৮

৩৯. P K Hitti,op cit. P-217

৪০. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, যোগাযোগ পাবলিশার্স, ঢাকা, অক্টোবর-২০০২, পৃ-১৯

৪১. মুসলিম ক্যালিগ্রাফি- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-৬৩

৪২. ইবনে মুকলার পূর্ণনাম আবু আলী মুহাম্মদ আলী বিন হাসান বিন মুকলা। তিনি হিজরী ২৭২ মোতাবেক ৮৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ৩২৮ মোতাবেক ৯৩৯/৪০ সালে মৃত্যুবরণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। আব্বাসীয় খলিফাগণের অধীনে তিনি কয়েকবার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি খলিফা আল-মুকতাদির, আল কাহির এবং আর রাযীর মন্ত্রী ছিলেন।

৪৩. ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ইতিহাস- ইরানী সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন

৪৪. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, যোগাযোগ পাবলিশার্স, ঢাকা, অক্টোবর-২০০২

৪৫. ইয়াকুতের পূর্ণনাম শাইখ জামাল ইয়াকুব আল মুস্তাসিমী। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং আব্বাসীয় শেষ খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর গ্রন্থাগারিক ছিলেন। শিয়া মতবাদের অনুসারী হওয়ার জন্য খলিফা কিছু সময় তাকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। ১২৫৮ খৃস্টাব্দে হালাকুখানের বাগদাদ ধ্বংসের হত্যালীলা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন এবং ১২০ বছর বয়সে গাযান খানের শাসনামলে (১২৯৭ সালে) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৪৬. ইবনুল বাওয়াবের পূর্ণনাম -আবুল হাসান আলী বিন হিলাল। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ঘরবাড়ি সজ্জাকারী ও অলঙ্করণ শিল্পী ছিলেন। তারপর তিনি হস্তলিখিত শিল্পে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করেন। তিনি আব্বাসীয় পঞ্চবিংশ খলিফা আল কাদির বিল্লাহ এবং গজনীর সুলতান মাহমুদের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি হিজরী ৪১১ / ১২০৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

৪৭. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি-মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, যোগাযোগ পাবলিশার্স, ঢাকা, অক্টোবর-২০০২, পৃ-২২

৪৮. ক্যাটালগঃ নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৬, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা।

৪৯. মাহজুবাহ- জানুয়ারি-২০০৬, অনুবাদ- নূর হোসেন মজিদী

৫০. Encyclopedia of Islam, Vol.-1, P.-278

৫১. প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধানে- ড. আব্দুস সাত্তার, ঢাকা, পৃ-১৭১

৫২. ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত তৃতীয় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে ড. নাজমা খান মজলিসের ক্যালিগ্রাফির উপর লিখিত অভিভাষণ

৫৩. বাংলাদেশেক্যালিগ্রাফি চর্চা- ড. আব্দুস সাত্তার, সাহিত্য সংস্কৃতি, সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা, ঢাকা, পৃ-৫৭

৫৪. প্রবন্ধঃ বাংলা ক্যালিগ্রাফি ও ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক ভাবনা- মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, স্মারক-ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা, পৃ-১২৮

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. প্রবন্ধঃ সমকালীন শিল্প ও শিল্পী- নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ-১৮

৫৬. মুসলিম ক্যালিগ্রাফি- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-২৫

৫৭. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, যোগাযোগ পাবলিশার্স, ঢাকা, অক্টোবর-২০০২

৫৮. মুসেআহ খত আল আরাবী- কামেল সালমান জাবুরী, পৃ-৫৫

৫৯. ইসলামী শিল্পকলা- এবনে গোলাম সামাদ, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮

৬০. ইসলামী বিশ্বকোষ- ৯ম খণ্ড, পৃ-২৪৯

৬১. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, যোগাযোগ পাবলিশার্স, ঢাকা, অক্টোবর-২০০২

৬২. Ibid, Janurary-1885, P.-44

৬৩. Al Nadim, , Kitab Al fihrist, P-125 & 130. Qadi Ahmed op. cit. P. 56.

৬৪. Qadi Ahmad op.cit P-56

৬৫. Ain-I-Akbari Vol-1 P -991

৬৬. M Ziauddin- Muslim Calligraphy. P -60

৬৭. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি-মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, যোগাযোগ পাবলিশার্স, ঢাকা, অক্টোবর-২০০২, পৃ-৫১

৬৮. প্রাগুক্ত

৬৯. মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা- ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, রাজশাহী, ১৯৯৬, পৃ-৩০৫

৭০. Islamic Calligraphy- Y H Safadi, London, 1978, P.-17-21

৭১. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি-মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, যোগাযোগ পাবলিশার্স, ঢাকা, অক্টোবর-২০০২, পৃ-৫৩

৭২. Safadi op. Cit-17-20-68-71.

৭৩. প্রাগুক্ত

৭৪. Islamic Calligraphy- Yasin Hamid Safadi. P-20

৭৫. ইসলামী বিশ্বকোষ- দ্বাদশ খণ্ড, পৃ-৭৬

৭৬. Ziauddin up cit. P-63, Safadi, P-20, 110-111

৭৭. Ziaudddin op. cit. P-63

৭৮. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি-মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, যোগাযোগ পাবলিশার্স, ঢাকা, অক্টোবর-২০০২, পৃ-৫৭

Dhaka University Institutional Repository

৭৯. প্রবন্ধ: ক্যালিগ্রাফিতে তুগরা শৈলী- মুসবাহ আমীন, ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি, জুন-২০০৬ সংখ্যা

৮০. ইসলামী বিশ্বকোষ- দ্বাদশ খণ্ড, পৃ-৫৭৬

৮১. মুসলিম ক্যালিগ্রাফি- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-৪৮

৮২. Shamsuddin Ahmad –Inscription of Bangal, Vol-11, Rajshahi, 1960, P-17

৮৩. ইসলামী শিল্পকলা- এবনে গোলাম সামাদ, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮

৮৪. Safacli op- cit, P-25-27-31

৮৫. Ibid, P-58

৮৬. প্রাগুক্ত

৮৭. Safadi op cit P-22-31, 110-111

৮৮. Ibid P-27-28 & Ziauddin op cit P-55-56

৮৯. Safadi op cit P-25, 27-31

৯০. E H Palmer, Oriental Penmanship (London-1889) P-24 & S M Rahman op cit. P-9

৯১. M Ziauddin op. Cit. P-63 & Safadi P-30, 84-85

৯২. Ibid P- 60 & Safadi. op. P-21-25

৯৩. M Ziauddin OP at P-63-64 & Safadi. op. cit P-31,110-111

৯৪. M Ziauddin op . cit. P-63 & Safadi P-35

৯৫. আল খাত্তুল আরাবী ওয়া আসারুল হাদারী, মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দীক, আল জামেয়াতুল আলামিয়্যাহ লিল উলুমুল ইসলামিয়্যাহ, লন্ডন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৯৪, পৃ-১৭৮

৯৬. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি, ইয়াসিন হামিদ সাফাদী, পৃ-২৮

৯৭. www.islamicart.com

৯৮. মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা- ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, রাজশাহী, ১৯৯৬, পৃ-৩০৪

৯৯. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি-মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, যোগাযোগ পাবলিশার্স, ঢাকা, অক্টোবর-২০০২, পৃ-২৮

১০০. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি-মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, যোগাযোগ পাবলিশার্স,ঢাকা, অক্টোবর-২০০২, পৃ-২৪

১০১. হাতে কলমে ক্যালিগ্রাফি- ইব্রাহীম মন্ডল, শহীদুল্লাহ এফ. বারী ও মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, দারুল আরকাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃ-৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে আরবী ক্যালিগ্রাফি চর্চা

ক্যালিগ্রাফারদের চর্চা ও অবদান

প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা ও অবদান

সাংগঠনিক চর্চা ও অবদান

ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা সমূহ

লোকজ ক্যালিগ্রাফি

ভাস্কর্যে ক্যালিগ্রাফি

বিমূর্ত ক্যালিগ্রাফি

পাণ্ডুলিপিতে ক্যালিগ্রাফি

উৎকীর্ণ লিপি

মুদ্রা লিপি

গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা, পত্রিকা-ম্যাগাজিন, প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে আরবী ক্যালিগ্রাফি চর্চা

বাংলাদেশে আরবী ক্যালিগ্রাফির আগমন ঘটে দ্বাদশ শতাব্দীর সুলতানী আমলে। সে সময়ের স্বাধীন সুলতানগণ এ বাংলা মুল্লুকের রাজনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করেছিলেন। তারা বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার সাথে সাথে ইসলামী শিল্পকলার প্রধান উপাদান ক্যালিগ্রাফির উন্নয়নে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলে এ সময় ক্যালিগ্রাফির ব্যাপক বিকাশ হয়েছিল। তাই প্রাচীন স্থাপত্যের গায়ে, মসজিদে, মাজারে, মেহরাবে উন্নত ক্যালিগ্রাফি চোখে পড়ে। মসজিদের শহর ঢাকাসহ সারাদেশে বড় বড় মেহরাবের পার্শ্বদেশে,

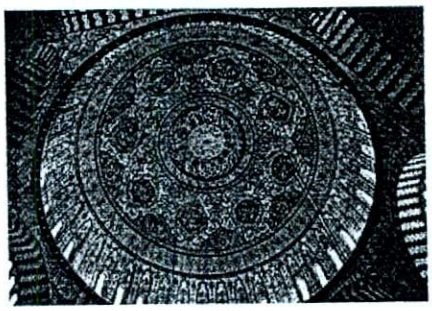

প্রবেশদ্বারের বাইরে ও ভেতরে, গম্বুজের গায়ে কালিমা, কুরআনের আয়াত, হাদীসের উদ্বৃতি ও বিভিন্ন দোয়ার ক্যালিগ্রাফি দেখা যায়। এ আমলে তুর্কী বংশোদ্ভুত হস্তলিখন শিল্পীদেরকেও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করা হতো। মধ্য এশিয়া ও এশিয়া মাইনর হতে অনেক খ্যাতিমান শিল্পী এদেশে এসে ক্যালিগ্রাফির বিকাশ সাধনের জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

দিল্লীর মামলুক সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ একজন উঁচুমানের ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তিনি নিজে সুন্দর হস্তাক্ষরে কুরআন অনুলিপি করে বিক্রি করতেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে সংসারের ব্যয়ভার বহন করতেন। তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে এক কপর্দকও গ্রহণ করতেন না। সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বের প্রায় এক শতাব্দী পর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা যখন দিল্লী এসেছিলেন তখন দিল্লীর প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দিন তাকে সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের হস্তাক্ষরে লিখিত কুরআনের একটি কপি দেখান।[১] দিল্লীর মসজিদ কুওয়াতুল ইসলাম থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইমারত গাত্রে উৎকীর্ণ লিপির লিখন পদ্ধতি এবং গুণগত মান বিচার করে সে যুগের ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে উন্নত ধারণা পোষণ করা যায়। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক একজন বিদ্যান ও দক্ষ লিপিকার হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি খত-ই-বিহার বা বিহার লিখন পদ্ধতিতে কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করেন এবং একটি কপি দিল্লীর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে সংরক্ষণ করেন।[২] এ আমলে স্বাধীন প্রদেশগুলোতে হস্তলিখন শিল্পের চর্চা অব্যাহত ছিল এবং শিল্পীদেরকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হতো।

বাংলার সুলতান আমলে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সব শিলালিপি-ই আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ করা হয়েছে। আরবী বর্ণমালার উল্লম্ব দণ্ড এবং সমান্তরাল বক্রাকৃতি রেখার সম্প্রসারণ ও সংকোচন করে ভিন্ন ভিন্ন বিমূর্ত অলঙ্করণ মোটিভকে শিল্পীগণ অবয়ব সাজসজ্জা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। লিপির অন্তর্ভূক্ত হরফের উল্লম্ব দণ্ড অথবা সমান্তরাল বাহু অন্য অক্ষরের অনুরূপ দণ্ড অথবা বাহুর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে কিংবা লিপিসারীর উপরাংশে, মধ্যাংশে ও নিম্নাংশে হরফ অথবা হরফ সমষ্টির উৎকীর্ণের দ্বারা লিপি শিল্পীগণ যে প্রাণবন্ত ও গতিময় লিখনশৈলীর সৃষ্টি করেন তা লিপিকলার পরিভাষায় তুঘরা পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়। যা স্বতন্ত্র ধারার কোন লিখন পদ্ধতি নয় বরং প্রচলিত লিখন পদ্ধতির একটি বিশেষ অলঙ্করণ প্রক্রিয়া। বাংলার স্থাপত্যে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে অলঙ্করণ মোটিভ হিসেবে ধনুক, সাঁতাররত হংসপাল ও চালঘর ইত্যাদি প্রতীক উপস্থাপিত হয়। ধনুক বক্র তুঘরার বৈশিষ্ট্য হিসেবে লিপিকারীর লম্বদণ্ডের বাক্যে ব্যবহৃত আরবী হরফ 'নুন' অথবা 'ইয়া' কোন কোন ক্ষেত্রে গভীর বাঁক সৃষ্টি করে। আবার কখনও বাঁকা নতুন চাঁদের মতো উপস্থাপিত হয়।

বাংলার পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমলে সুলতান গঞ্জের শিলালিপিতে ধনুক বক্র তুঘরার উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়।[৩] অনুরূপভাবে শামসুদ্দিন মুজাফফর শাহের শাসনামলে মালদহের শিলালিপিতে ধনুক কে তুঘরা পদ্ধতি কল্পনা করা যায়। শামসুদ্দিন মুজাফফর শাহের হযরত পাণ্ডুয়ায় অপর একটি শিলালিপিতে সারিবদ্ধভাবে নির্মিত দোচালা ঘরের প্রতিচ্ছবি কল্পনা করা যায়। এটি তুঘরার অলঙ্করণ প্রক্রিয়ার একটি মনোরম উদাহরণ। এটিকে তীরের ফলার ন্যায় আলিফ ও লাম এর উল্লম্ব দণ্ডের উর্ধ্বাংশ নতুন বাঁকা চাদের ন্যায় 'নুন' ও 'ইয়া' কে অতীব সুন্দরভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। উল্লম্ব দণ্ড ও আনুভূমিক বাহুর সমানুপাতিক উপস্থাপনের ফলে বাঁশ নির্মিত কুটির সারির দোচালা ছাঁদের ন্যায় শিলালিপিটির অলঙ্করণ প্রক্রিয়া অনুমিত হয়।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান আলাউদ্দিন হোসাইন শাহের আমলের কান্তাদুয়ার শিলালিপিতে উৎকীর্ণ বিষয়বস্তুকে ব্যারাকে অবস্থানরত সৈন্যদল হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এটি একটি অভিনব তুঘরার উদাহরণ। এ লিপিতে ব্যবহৃত 'আলিফ' ও 'লাম' এর লম্বদণ্ডের উপরিভাগকে তরবারীর বাঁট এবং তার নীচেই অবতল হরফ 'নুন' ও 'ইয়া' কে সেনা ছাউনির ক্যানভাস ছাদ হিসেবে গণ্য করা যায়। অবতল হরফের নিম্নাংশে লিপির মূল বিষয়বস্তু যোদ্ধা সৈন্যের প্রতিনিধিত্ব করে। উপরন্তু হরফের উল্লম্ব দণ্ড সমূহ তাঁবুর ভার রক্ষাকারী খুঁটি হিসেবে বিবেচিত হয়।[৫] এ পদ্ধতির অনুরূপ অলঙ্করণ পরিকল্পনা সুলতান আলাউদ্দিন হোসাইন শাহের চম্পাতলীর শিলালিপিতে প্রত্যক্ষ করা যায়। এতে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু অলঙ্করণ প্রক্রিয়াকে সেনাবাহিনীর পাঁচটি সনাতন দলে বিন্যস্ত হয়ে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযানের সাথে তুলনা করা যায়।

একই সুলতানের আমলে আরশনগর শিলালিপির উৎকীর্ণ মূল বিষয়বস্তুকে বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের শত্রু বাহিনীর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কেননা 'নুন' ও 'ইয়া' দু'টি অবতল হরফের সংযোগ সাধন করে জল-জাহাজের ছাউনী সৃষ্টি করেছে। এখানে মূল বিষয়বস্তুর নীচে আনুভূমিক বলিষ্ঠ রেখাকে পাটাতন রূপে অনুমান করা যায়। তবে এ লিপিতে সুলতানকে অর্থাৎ জলে ও স্থলের সম্মানিত সুলতান হিসেবে আখ্যায়িত করার ফলে জলযানের সাথে তুলনা অনেকটা যুক্তিসঙ্গত। বাংলার শিলালিপিতে এরূপ অলঙ্করণের উপস্থাপন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। আরবী বর্ণমালার সম্প্রসারণ ও সংকোচন বিধি এবং হরফের লালিত্য বিমূর্ত অলঙ্করণ প্রক্রিয়া হিসেবে শিলালিপিতে উপস্থাপিত হয়ে মানুষের শিল্পমনের বিকাশ সাধনে সহায়তা করেছে। লিপিকলার উৎকর্ষ সাধনে ক্যালিগ্রাফারদের নিরলস প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে।

মুঘল আমলে উপমহাদেশে হস্তলিখন শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। মুঘল সম্রাটরা লিপিকলার মহান পৃষ্ঠপোষক এবং তাদের মধ্যে অনেকেই নিপুণ ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। সম্রাট জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবুর নিজেই একজন দক্ষ ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। ১৫০৪ খৃস্টাব্দে খত-ই-বাবুরী নামে তিনি এক প্রকার হস্তলিপি প্রচলন করেন। ঐতিহাসিক বাদায়ুনীর মতে- তিনি নিজ হাতে বাবুরী লিপিতে এক জিলদ কুরআন শরীফ নকল করে মক্কা শরীফে পাঠান। তার পৌত্র সম্রাট আকবর ছিলেন শিল্পের পরম সমঝদার ও জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। বহু চিত্রকর ও লিপিকার তার দরবার অলঙ্কৃত করতেন। তাদেরকে অনেক গুণ ও নৈপুণ্যের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য অকাতরে পুরস্কৃত করতেন এবং সম্মানজনক খেতাব দান করতেন। জায়গীর রূপে ভূ-সম্পত্তি এবং মাঝে মাঝে সরকারি উচ্চপদও দান করতেন। তার সময়ে যে ক'জন লিপিকার খ্যাতি লাভ করেন তাদের মধ্যে মীর মুহাম্মদ হুমায়ুন, গোলাম আলী খান, হাফিজ ইব্রাহীম, হাফিজ বাকাউল্লাহ্, মীর আবুল হামাম, মীর যয়নুল আবেদিন, মীর মাহদী এবং গোলাম নকশাবন্দ খান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সম্রাট জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবুর হতে শুরু করে শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ পর্যন্ত সব সম্রাটই ক্যালিগ্রাফি শিল্পে বেশ পারদর্শী ছিলেন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আকবর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের শাসনামলে হস্তলিপি শিল্পীগণ বিভিন্ন লিখন পদ্ধতি বিশেষ করে নাসতা'লিক লিখন পদ্ধতির বিকাশ সাধন করেন। এ শিল্পের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে মুঘল সম্রাটগণ ইকতা ও জায়গীর বরাদ্দ করতেন এবং তাদের লিপির মান অনুসারে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করেন। যেমন- মুহাম্মদ হুসাইন কাশ্মীরীকে 'যররীন কালাম', মীর খলিলুল্লাহ শাহকে 'বাদশাহ কালাম', আব্দুস সামাদকে 'শিরীন কালাম', আব্দুর রহীমকে 'আনবারীন কালাম', মীর আব্দুল্লাহ সিরাজীকে 'মুশকীন কালাম' ও সুলতান বায়েজীদকে 'কাতিবুল মুলক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সম্ভবত সপ্তলিখন পদ্ধতিতে (হাফতি কালামি) পারদর্শী মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ দেহলভী মুঘল আমলের শেষের দিকে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হস্তশিল্পীদের উপর তার লিখিত গ্রন্থ 'তাযকীয়া-ই-খুশনবীশ' সম্রাট আকবরের রাজত্ব পর্যন্ত সময়কালের শিল্পীদের আলোচনা অন্তর্ভূক্ত করেছে।[৬] অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন- মোল্লা মীর আলী, তার শিষ্য মোল্লা মীর আলী ও তার শিষ্য মাওলানা বাকী, মাশহাদের মুহাম্মদ আমীন, মীর হুসাইনী কুলানকী, মাওলানা আব্দুল হাই, মাওলানা দাওরী, সুলতান বায়েজীদ, মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রসিদ্ধ নাসতা'লিক লেখক ছিলেন এবং পারস্য কবি নিজামীর খামসা নকল করেছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর লিপিশৈলীতে দক্ষ ছিলেন। তার আত্মজীবনী থেকে জানা যায়- তিনি ফারসী ভাষায় সুলেখক এবং পূর্ববর্তীদের ন্যায় লিপিকারদের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রথম দিকে তিনি নাসতা'লিক লিখন রীতির প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, যারা তার অনুসরণ করতো তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করতেন। তাযকীয়ায়ে খুশনবীশ পুস্তকে লিখিত আছে- সম্রাট এ অনুকরণকারীদেরকে একশ ঘোড়ার সওয়ারের পরিচালনায় নিযুক্ত করতেন। তার সময়ে অনেক অভিজ্ঞ লিপিকার ছিলেন। আব্দুল হাই ওরফে আমানত খান, মীর

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল্লাহর পুত্র মীর সালেহ প্রমুখ লিপিশৈলীতে পারদর্শী ছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের আমলে আব্দুর রশীদ দায়লামী যিনি আকা রশিদ নামে অধিক পরিচিত; হস্তলিখন শিল্পে অভূতপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। আকা রশিদ হস্তলিখন শিল্পে অনেক ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেন। সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো এবং সম্রাট আলমগীরের কন্যা জেবুন্নেসা তার নিকট হস্তলিখন শিল্পের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং এতে দক্ষতা অর্জন করেন। সম্রাট শাহজাহানের সময় মীর সাইয়েদ আলী তাবরিযী 'জাওয়াহির-ই-রকম' উপাধিতে ভূষিত হন।

সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন ঈমান আকীদার দিক দিয়ে প্রকৃত মুসলমান। এজন্য তিনি প্রাণী চিত্রাঙ্কনের ধারা বন্ধ করে দিয়ে লিপিকলায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তিনি তার গ্রন্থাগারিক ও দরবারী লিপিকার সাইয়েদ আলী খান এর নিকট লিপিশিল্প আয়ত্ত করেন। আওরঙ্গজেব সম্রাট হওয়ার পর তাকে রাজকীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ বা গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করেন। তিনি সম্রাটের সন্তানদেরকে হস্তলিখন শিল্পে প্রশিক্ষণ দেন। তাছাড়া আওরঙ্গজেবের আরেকজন গৃহশিক্ষক ছিলেন। তার নাম ছিল আব্দুল বাকী। যিনি মাত্র ৩০ পাতায় সম্পূর্ণ কুরআন লিপিবদ্ধ করার কৃতিত্বের জন্য সম্রাটের নিকট 'য়াকুত রকম' বা রত্ন-লেখনী ধারক উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তার আরও গ্রন্থাগারিক ছিলেন মীর ইয়াদ, কমল হিদায়াতুল্লাহ ও শামসুদ্দিন আলী খান। এ সময় কয়েকজন হিন্দু লিপিকারও ছিলেন। যথা- পণ্ডিত লক্ষ্মীরাম লাল, মুখরাম মুন্সী, মাহবুব রায়, মুনশী কমল রায়। মুঘল সম্রাজ্যের পতনের সময়েও লিপিকলার উন্নতি অব্যাহত থাকে। এ সময় বিখ্যাত আলেম, গুণী, কবি, লাখনৌতে চলে যান। ফলে সেখানে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৭৯২ সালে দিল্লীতে যে ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপিত হয় এর পাঠ্যসূচির মধ্যে লিপিকলা বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভূক্ত হয়।[৭]

সম্রাট আলমগীর একজন উঁচুমানের লিখনশিল্পী ছিলেন। সুন্দর হস্তাক্ষরে কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করে তিনি বিক্রয় করতেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে সংসারের খরচ চালাতেন। প্রতি বছর সুন্দর হস্তাক্ষরে নিজ হাতে কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করতেন এবং মনোরম বাঁধাই করে দু'টি কপি তিনি মদিনায় পাঠিয়ে দিতেন। প্রতিটি কপির মূল্য ছিল ৫,০০০ টাকা। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় লিখনশিল্পী হিদায়াতুল্লাহ 'যররীন রাকাম' এবং পরবর্তী সময়ে সম্রাট প্রথম শাহ আমলের রাজত্বকালে শিল্পী মুহাম্মদ আতা 'মুরাসসা রাকাম' এবং সাইয়েদ ইজাজ রাকাম খান 'রওশন কালাম' উপাধিতে ভূষিত হন। মুঘল

Dhaka University Institutional Repository

শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহও একজন শিল্পী, কবি ও লিপিকার ছিলেন। দিল্লীতে যীনত মহলের ও হামীম আহসানুল্লাহ খানের হাম্মামের শিলালিপিতে রক্ষিত আছে। এগুলো অপূর্ব নৈপুণ্যের স্বাক্ষর হিসেবে দিল্লীর জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। তার সময়ে নিপুণ লিপিকার ছিলেন- মুহাম্মদ জান, মীর ইমাম আলী ও তদীয় পুত্র মীর জালালুদ্দীন।

প্রখ্যাত হস্তশিল্পীগণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে লিখন শিল্পকে বিভিন্নভাবে সুষমামণ্ডিত করে তুলেছেন এবং পরবর্তী শিল্পকলার দিগন্তে এর চর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করে গিয়েছেন। এ সমীক্ষার পর হস্তলিখন শিল্পের ব্যাপক প্রয়োগ এবং শিল্পীদের উন্নত মর্যাদা লাভ সম্পর্কে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। তবে মুদ্রণযন্ত্র ও লিথোটাইপ পদ্ধতির আবির্ভাবের ফলে লিপিকলার প্রয়োগ ও কার্যকারিতা হ্রাস পেতে শুরু করে এবং উন্নত মানের একটি শিল্প হিসেবে তার গুরুত্ব কমে যায়। এতদসত্বেও সভ্যতার ধারায় লিপিকলা সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ হিসেবে মুসলমানদের অতীত গৌরব বিঘোষিত করছে।

বৃটিশ শাসনামলের গোড়ার দিকেও ঢাকায় ক্যালিগ্রাফির চর্চা ছিল উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্যালিগ্রাফি শিল্পীরা অনুপ্রাণিত হন এবং তাদের প্রচেষ্টায় কিছু কিছু ধারা যেমন গুলজার, তা'লিক প্রভৃতির প্রচলন ছিল। কিন্তু পরে ধীরে তা ধীরে সীমাবদ্ধ হয়ে আসে। এ সময়ে কলকাতায় ছাপার যন্ত্রে একটি সুদুরপ্রসারী ধারা এদেশে প্রচলিত হয়। তাই সাধারণ মুসলিম জনগণ এটিতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে আরবীর মূল ধারাগুলোর অনেকটাই বিলুপ্তি ঘটে। এতকিছুর মধ্যেও লৌখনু ছাপা যা আরবী লেখনী ধারার এদেশীয় প্রকরণ। সুলতানী আমলে ফরমান,দলীল-দস্তাবেজ, দাওয়াত নামা ও কুরআনের কপিকরণে মুদ্রা ও শিলালিপিতে, গৃহসজ্জায়, মসজিদ, মাদরাসা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন বাসগৃহে ক্যালিগ্রাফির শিল্পসম্মত ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও ইংরেজ আমলে তা হয়নি। তাই এ আমলে ইসলামী শিল্পকলার বিকাশে তো তেমন কোন অবদান

Dhaka University Institutional Repository

রাখেইনি বরং ক্যালিগ্রাফির জনপ্রিয় ধারাগুলোর বিলুপ্তি ঘটতে থাকে। অবশ্য বর্তমানে ইসলামী শিল্পকলার বৃহদাংশ উপাদান, প্রমাণাদি ও জনপ্রিয় দলিল সমূহ ইংরেজিতে সংরক্ষিত রয়েছে।[৮]

বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর বিভিন্ন মুসলিম দেশের মতো ক্যালিগ্রাফি চিত্রকর্ম তেমন প্রাধান্য না পেলেও ট্রাডিশনাল এবং আধুনিক চিত্রকর্মের ধারায় বাংলাদেশের শিল্পীরা ক্যালিগ্রাফি চর্চা শুরু করেন। তখন থেকে গত তিন দশকে এ শিল্পটি একটি মানসম্মত পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান থেকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আবহে এটি একটি পরিচিত বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি জনপ্রিয়তা ও মানসম্পন্ন অবস্থানে উপনীত হওয়ার জন্য যে সকল ক্যালিগ্রাফার, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, প্রদর্শনী, গবেষণা ও গ্রন্থ রচনায় ভূমিকা রেখেছেন নিম্নে তা তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্যালিগ্রাফারদের চর্চা ও অবদান

শিল্পী মুর্তজা বশীর

শিল্পী মুর্তজা বশীর বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে একটি বটবৃক্ষের নাম। তিনি দেশের প্রথিতযশা, প্রবীন ও শ্রেষ্ঠ ক্যালিগ্রাফার। দেশের প্রথম সারির ক্ষণজন্মা শিল্পীদের মধ্যে তাঁর শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য ও সৃজনশীলতা এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থান দখল করে আছে। তিনি বিমূর্ত চিত্রকর্মে যেমন সিদ্ধহস্ত তেমনি ফিগারেটিভ শিল্পকলায় তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। বাংলাদেশের শিল্পকলার পথিকৃৎ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, সুলতান, কামরুল, সফিউদ্দিন, আনোয়ারুল হকের উত্তরসুরীদের মাঝে তার অবস্থান শীর্ষে। তাঁকে বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি শিল্পের পথিকৃৎও বলা হয়ে থাকে। মুর্তজা বশীর ১৯৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটকাল থেকেই তিনি শিল্পচর্চায় আগ্রহী ছিলেন। তাই তিনি এ বিষয়ে একাডেমিক অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে 'গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস এন্ড পেইন্টিং' এ ভর্তি হয়ে ১৯৫৪ সালে সফলতার সাথে তাঁর শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন। অতঃপর সে বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোশ মিউজিয়ামে অনুষ্ঠিত আর্টের উপর সার্টিফিকেট কোর্সের প্রশিক্ষক হন। ১৯৫৬-৫৭ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের 'একাডোমিয়া ডেলে বেলে আর্ট' এবং ১৯৭২-৭৩ সালে 'একাডেমিক ডোয়েজ' এ শিক্ষকতা করেন।[৯]

মুর্তজা বশীর তাঁর বর্ণাঢ্য শিল্পীজীবনে দেশে বিদেশে অনেকগুলো একক ও যৌথ প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে যেমন ক্যালিগ্রাফি চর্চায় অবদান রেখেছেন তেমনি তার সৃজনশীল শিল্পপ্রতিভাকে রং তুলিতে ফুটিয়ে তুলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ১৯৫৯ সালে ঢাকা, ১৯৫৮ সালে করাচী, ১৯৬০-৬১ সালে লাহোর, ১৯৬২ সালে রাওয়াল পিন্ডি, ১৯৯৬ সালে আবার করাচী, ১৯৬৭ সালে ঢাকা, লাহোর, রাওয়াল পিন্ডি, ১৯৬৮ সালে ঢাকা, ১৯৭০ সালে করাচীসহ ১৯৭৬, ৭৯, ৮৪, ৯৩, ৯৯ ও ২০০০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত একক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬১ সালে লন্ডনের কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউটে 'কমনওয়েলথ আর্ট টুডে', ১৯৬২ সালে তিউনিসিয়ায় 'ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন অব পেইন্টিং', ১৯৬৫ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'কমন ওয়েলথ আর্ট ফেস্টিভ্যাল, ১৯৬৬ সালে

. Dhaka University Institutional Repository

ইরানের তেহরানে 'পঞ্চম তেহরান (আঞ্চলিক) প্রদর্শনী', ১৯৭২ সালে ফ্রান্সে 'ফোর্থ ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল অব আর্টস', একই বছরে ফ্রান্সে 'নবম বাইনেল অব মেনটনে', ১৯৭৮ সালে ভারতের নয়াদিল্লীতে 'চতুর্থ টাইনাল ইন্ডিয়া', ১৯৭৯ সালে ব্রাজিল, এশিয়ান আর্ট শো, এশিয়ান আর্ট শো, এশিয়ান আর্ট এক্সিবিশন পার্ট-১১, ১৯৮০ সালে জাপানের Fukoka city, ১৯৮১ সালে হংকংয়ে 'ষষ্ঠ ফেস্টিভ্যাল অব এশিয়ান আর্ট', ১৯৮৬ সালে নয়াদিল্লীতে 'টাইনেল ইন্ডিয়া', ১৯৯৮ সালে মালেশিয়ার কুয়ালালামপুরে 'কমনওয়েলথ অব আর্ট', ১৯৮১, ৮৩ ও ১৯৮৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'এশিয়ান আর্ট বাইনেল' এ অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও তিনি ২০০২ ও ২০০৩ সালে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ২০০২ সালে মাহে রমজান উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে তাঁর একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ সালে শিল্পচর্চায় তাঁর ৩০ বছর উপলক্ষে তাঁর বেশ কিছু ক্যালিগ্রাফি কর্ম শিল্পকলা একাডেমীতে প্রদর্শিত হয়।[১০] তিনি ১৯৯৮ সালে চট্টগ্রামের আনিসুজ্জামানের বাসায় ৭´১২ ফুট মাপের সিরামিক্স, ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিলেট শাখায় ২১´৪২ ফুট সাইজের সিরামিক মোজাইক, ১৯৭৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩´৩২ ফুট সাইজের টেরাকোটা মোজাইক 'শহীদী বৃক্ষ', ১৯৭২ সালে সোনালী ব্যাংকের ৬´৮ সাইজের এক্রিলিক 'মাই ক্যান্ট্রি', ১৯৬৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৭´১২ ফুট সাইজের তৈলচিত্র, 'ইভালুয়েশন অব মানি',

১৯৬৬ সালে অগ্রণী ব্যাংকে ৪´৩২ ফুট সাইজের তৈলশিল্প 'দি ট্রি' নামক বিখ্যাত শিল্পকর্ম নির্মাণ করেন। মুর্তজা বশীর তাঁর অসামান্য শিল্পচর্চার জন্য অনেক পুরস্কার বা এ্যাওয়ার্ডও লাভ করেন। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক, ১৯৭২ ও ৭৩ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একডেমীর 'একাডেমী এ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন। তিনি ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশের উপদেষ্টা।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত ৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তাঁর তিনটি মূল্যবান ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। তিনি একটি শিল্পকর্মে আলিফ-লাম-মীম কুরআনের এ্যাবস্ট্রাক্ট আয়াতকে নির্বস্তুক পেইন্টিং এ এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যে, তা শিল্পবোদ্ধাদের নতুন করে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে ক্যানভাসে অঙ্কিত তেল রং মাধ্যমে কালেমা তাইয়েবার উপস্থাপন ছিল যেন রং আঁধারে অস্তমিত বর্ণমালা। যা রহস্যময়তার মোহাচ্ছন্ন নান্দনিকতায় চৈতন্য সৃষ্টি করে। তার রঙিন আলো আঁধারের

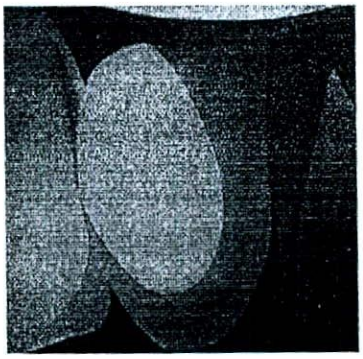

চিত্রপটে স্বতস্ফূর্ত অথচ মাধুর্যমণ্ডিত শিল্পটি বেঙ্গল তুঘরায় নির্মিত। যাতে ছিল তুলির আঁচড়ে ধর্মের উপলব্ধি। কালিমা তাইয়েবাকে ১২+১২টি অক্ষরে দু'ভাগে বিভক্ত করে রং ও তুলির যাদুময়ী স্পর্শে এক অবিশ্বাস্য শিল্পজগত সৃষ্টি করেন। এ উপলক্ষে প্রকাশিত একটি পুস্তিকার ভূমিকায় এম. হারুনুর রশীদ বলেন- "Murtajas Brush has lauished all its love on the secred letter of the kalima." তিনি অন্য এক জায়গায় তার ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য পেশ করেছেন-"But those who have followed Murtaja all know that a sense of spritaulisen is pervasive" অর্থাৎ যে সমস্ত সমঝদার মুর্তজার শিল্পকর্ম সম্বন্ধে অবহিত আছেন তারা সহজেই উপলব্ধি করতেন যে, তাঁর লিপিকর্মে অধ্যাত্মিকতা বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে।[১১]

১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে তিনি 'জ্যোতি' নূর বা The light শিরোনামে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন যাতে অনেকগুলো ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং ছিল। তিনি এসব চিত্রকর্মে ধর্মীয় মোটিভ, যেমন- জায়নামাজ ও তসবীহ তাছাড়া তাবিজ প্রভৃতি লোকজ মোটিফ ও সোলেমানী মোটিফকে জ্যামিতিক প্যাটার্নে ব্যবহার করেছেন। যাতে তার শিল্পকর্মে নিজস্ব ক্রিয়েটিভিটি লক্ষ করা যায়। শুধু তাই নয় ২০০২ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে তেল রংয়ের নির্মিত ৩৭টি ক্যালিগ্রাফির প্রদর্শনী চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এ প্রদর্শনী ছিল রেখা ও রংয়ের মহামেলা। যাতে একক বা যুক্তভাবে আরবী হরফগুলো প্রাধান্য পায়, এতে তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো শিল্পোত্তীর্ণ এবস্ট্রাকশনে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন তা বর্ণনাতীত।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও জীবন ভাবনার উৎকর্ষের প্রতি আন্তরিক প্রেম ও উৎকণ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় মুর্তজা বশীরের আজীবনের চিন্তা ও শিল্পভাবনায়। শিল্পকর্মে বিবর্তন ও উৎকর্ষের পথ ধরেই তিনি হেটে চলেছেন দৃঢ় পদক্ষেপে। বিষয় বিবেচ্য পরিবর্তনের পথচলায় তিনি সবসময় বিচিত্র কাব্যময়তায় সকল শিল্পীকে অতিক্রম করেছেন। তাঁর 'জ্যোতি' শিরোনামের ক্যালিগ্রাফিগুলো ছিল ইসলামী ইমেজ নির্ভর। তিনি সেখানে পাটির নকশা কিংবা তাবিজের মধ্যে জ্যামিতিক ফর্মের মাঝে আল্লাহ ও মুহাম্মদ শব্দদ্বয় ফুটিয়ে তুলেন। তাঁর এ শিল্পকর্মের জন্য অবশ্য সমালোচনার এবং মৌলবাদী অভিযোগের শিকার হন। তিনি এর জবাবে বলেছিলেন- লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি যখন 'লাস্টসাপার' আঁকেন, রাফায়েল যখন ম্যাডোনা আঁকেন অথবা একজন খৃস্টান পেইন্টার যখন ক্রুশিফিকশনের ছবি আঁকে আমরা তাকে মৌলবাদী বলিনা। একজন হিন্দু পেইন্টার যখন তন্ত্রকে কেন্দ্র করে ছবি আঁকে, নীরব চৌধুরীর মত লোক যখন স্বরস্বতী কিংবা দূর্গা আঁকে কিংবা বিকাশ ভট্টাচার্য যখন দূর্গাকে আঁকে তখন তো আমরা সমালোচনা করিনা। তাহলে আমাদের শিল্পকর্মে আমাদের ধর্মের প্রতিফলন ঘটলে সমালোচনা হবে কেন? এভাবে তিনি আত্ম আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সর্বদাই বিশ্বাসদীপ্ত উচ্চারণ করেছেন। আর তাই তিনি যখন দৃষ্টির স্বভাবকে ব্যবহার করে তীক্ষ্ণ সরল রেখার বিচিত্র কৌণিক প্রয়োগে আবেগময়তার উদ্ভাস আঁকেন তখন তাঁর সেই শিল্পকর্মে সুমহানের সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়।[১২]

শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার

ড. আব্দুস সাত্তার বাংলাদেশের শিল্পর্চচার আন্দোলনে একটি পরিচিত নাম। তিনি ১৯৪৮ সালে নাটোর জেলার বড়াইগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট থেকেই শিল্পচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি আমেরিকার নিউইর্য়কে প্রাট ইনস্টিটিউট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট হতে মাস্টার্স পাশ করেন এবং ভারতের শান্তি নিকেতনে বিশ্বভারতী হতে পিজিএস ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পী এবং বাংলাদেশের ছাপচিত্র অঙ্গনে একজন পথিকৃৎ। তাঁর শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- তিনি আরবীর সাথে বাংলা বর্ণমালার মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি করেন। বিশ পঁচিশ বছর পূর্ব থেকে তাঁর এ ঝোঁক দেখা যায়। তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে রংয়ের উজ্জ্বলতা ও বৈপরিত্ব ছাড়াও পটপ্রেক্ষিতে কারুকাজ সহজে নজরে পড়ে। আবার শব্দ বা হরফগুলোর কম্পোজিশনে তিনি আধ্যাত্মিক

Dhaka University Institutional Repository

পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর উদারতার ফলেই তিনি অ, আ, ক, খ অক্ষরগুলো আরবী কুফী রীতিতে সৃষ্ট ক্যালিগ্রাফির সাথে সম্পৃক্ত করেন।[১৩]

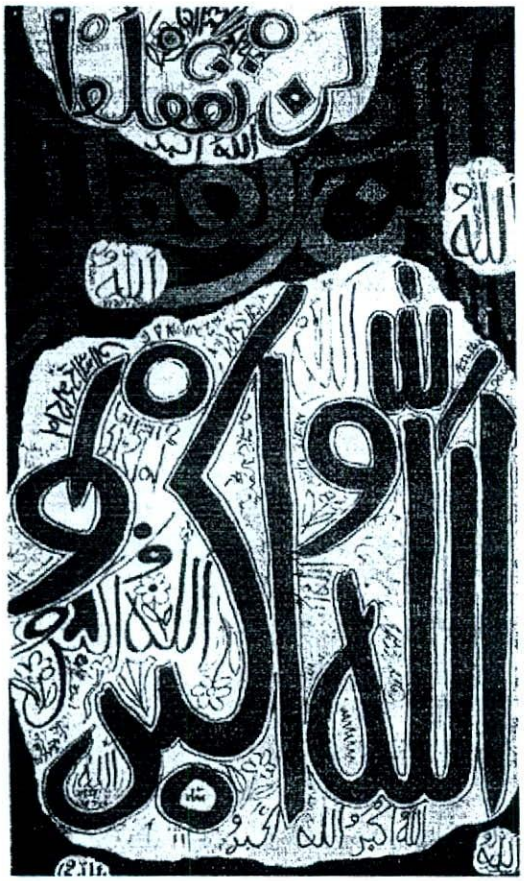

তিনি ঢাকা চট্টগ্রাম ও নিউইয়র্কে মোট ১৮টি একক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ২০০২, ০৩, ০৪ ও ০৫ সালে যথাক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে আয়োজিত প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তাঁর পদচারণা ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। মিসর, বুলগেরিয়া, কোরিয়া, সুইডেন, শ্লোভাকিয়া, জাপান, যুগোস্লোভিয়া, পোল্যান্ড, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, তাইওয়ান, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, কানাডা, মালয়েশিয়া, হাঙ্গেরী, বিটলা, আরব আমিরাত, ইউক্রেন, জাগরেব, জার্মানী, পাকিস্তান, ভারত, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের আয়োজিত প্রদর্শনী সমূহেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। তাঁর নির্মিত শিল্পকর্ম আমেরিকার 'পোর্টল্যান্ড আর্ট মিউজিয়াম', আমেরিকার 'থালামার অবর্ণ ইউনিভার্সিটি মিউজিয়াম', যুগোস্লোভিয়ার 'কন্টেম্পরারী আর্ট মিউজিয়াম', মালয়েশিয়ার 'ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারী', যুগোস্লোভিয়ার 'দি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর পাবলিক এন্টারপ্রাইজেস ইন ডেভেলপিং কান্ট্রি', নরওয়ের 'মিউজিয়াম অব কন্টেম্পরারি গ্রাফিক আর্ট', 'ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারী' ইউক্রেন, যুগোস্লোভিয়ার 'মিউজে আর্ট কন্টেম্পারেইন', মিশরের 'কনটেম্পরারী গ্রাফিক প্রিন্টস মিউজিয়াম', যুগোস্লোভিয়ার তুজলায় 'দ্যা গ্যালারী অব যুগোস্লোভিয়া পোট্রেইট', 'কেবিনেট অব গ্রাফিক আর্ট', 'যুগোস্লাভ একাডেমী

Dhaka University Institutional Repository

অব আর্টস এন্ড সায়েন্স' সহ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে।

ড. আব্দুস সাত্তার তাঁর অসাধারণ শিল্পকর্ম নির্মাণের জন্য দেশে ও বিদেশে অনেক পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে প্রিন্টের জন্য 'বেস্ট এ্যাওয়ার্ড', ১৯৮০ সালে 'গোল্ড মেডেল', ১৯৮১ সালে 'বেস্ট এ্যাওয়ার্ড ফর প্রিন্ট' এবং ১৯৯২ ও ৯৪ সালে 'অনারেবল মেনশন' লাভ করেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আর্ট বাইনেল, পাকিস্তানের প্রথম আর্ট বাইনেল, যুগোস্লোভিয়ায় অনুষ্ঠিত ১৯৮১, ৮৫ ও ৮৯ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল বাইনেল অব গ্রাফিক আর্ট', ১৯৯৩ সালে মিশরের প্রথম 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রেইনিয়াল ফর প্রিন্ট' এবং ১৯৯৭ সালে আমেরিকার 'পোর্টল্যান্ড আর্ট মিউজিয়ামে অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টস এক্সিবিশন' পদক লাভ করেন।[১৪]

465114

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক এবং বর্তমানে বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি সোসাইটির উপদেষ্টা। ড. আব্দুস সাত্তার আরবী ও বাংলা হরফের সহযোগে ২০/২৫ বছর পূর্ব থেকেই ক্যালিগ্রাফি শিল্প নির্মাণ করেছেন। চারুকলার পরিচালকের দায়িত্ব পালন করার সময়ও তাঁর ক্যালিগ্রাফি চর্চা অব্যাহত ছিল। তিনি কাঠ খোদাই এক্রিলিক, পানি রং এবং এচিং এর মাধ্যমে বহু ক্যালিগ্রাফি এঁকেছেন। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে এ শিল্পীর আরবী বর্ণমালায় বিশালাকৃতির কাঠখোদাই ক্যালিগ্রাফি চিত্র মালেশিয়ার ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারিতে সংরক্ষিত আছে। তাঁর ক্যালিগ্রাফি চর্চা বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফির উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক। তিনি ওরিয়েন্টাল আর্ট নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে আসছেন। ক্যালিগ্রাফি যেহেতু ওরিয়েন্টাল ধারায় পরিগণিত হয় সেহেতু এ শিল্পের স্বভাব বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁকে সবসময় ভাবতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী আবু তাহের

শিল্পী আবু তাহেরও বাংলাদেশের প্রবীণ ও খ্যাতনামা ক্যালিগ্রাফার। তিনি ১৯৩৬ সালে কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট হতে ১৯৬৩ সালে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি একজন এবস্ট্রাক্ট শিল্পী হিসেবে বিখ্যাত। তিনি বিমূর্ত ধারায় ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করে থাকেন। তাঁর লেটারিজম এর উপর একটি শিল্পকর্ম আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জন করেছে। রং ও রেখার ভারসাম্য ও লালিত্যে তাঁর বিমূর্ত ধারার ক্যালিগ্রাফি গুলোতে তিনি প্রাণের সঞ্চার করেছে। তিনি পলক্লীর মত হরফ এবং শব্দগুলোকে এলোমেলো ভাবে সাজিয়ে একটি গোলাকার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন।[১৫]

শিল্পী আবু তাহের দেশে ও বিদেশে একক ও যৌথ অনেকগুলো প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ১৯৯৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১০ টি একক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষত ১৯৮৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনী সমূহে অংশগ্রহণ করে। তিনি লন্ডন, তেহরান, বার্লিন, বার্ন, দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতা, ফুকুয়াকা, কুয়ালালামপুর, শিমলা, করাচী, ইসলামাবাদ, মস্কো, টোকিও, কোপেন হেগেন, ঢাকার সাজু আর্ট গ্যালারিতে নিয়মিত আয়োজন বার্ষিক প্রদর্শনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ৫০তম বার্ষিকী, ঢাকা আর্ট সার্কেলে আয়োজিত পরপর সাতটি প্রদর্শনী এবং ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তাঁর সরব অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

সপ্তম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তিনি যে লিপিশিল্প প্রদর্শন করেন তাতে কুফী রীতিতে অঙ্কিত আল্লাহ ও মুহাম্মদ শব্দটি বেশি প্রাধান্য পায়। তেল রংয়ের এ শিল্পকর্মটিতে সৃজনশীলতা এবং প্রেক্ষিত দেখা যায়। কুফীর সাথে নাসখের সংমিশ্রণ এক আধ্যাত্মিক মোহজালের সৃষ্টি করেছে। তিনি অল এশিয়ান বাইনেল এর ৩য় ও ৮ম ইন্টারন্যাশনাল 'আর্টিস্ট ক্যাম্প ইন শিমলা' (১৯৮৯), ২০০২ সালে বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী এবং একই বছরে চট্টগ্রামের কাব্যকলা আয়োজিত ২৫টি দেশের শিল্পীদের

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে অনুষ্ঠিত আর্টিস্ট ক্যাম্প-এও অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। বর্তমানে তিনি ঢাকার দক্ষিণ কাফরুলে শৈবাল নামক এডফার্মে কর্মরত আছেন এবং নিরবে নিভৃতে শিল্পচর্চা করে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যের জন্য ১৯৭৪ সালে শিল্পকলা পুরস্কার, ১৯৯৪ সালে অনারেবল এ্যাওয়ার্ড এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একুশে পদক লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি সোসাইটির অন্যতম উপদেষ্টা। তাছাড়া তিনি শিল্পের বিকাশ সাধনের লক্ষে ১৯৯৫ সালে রাজধানী ঢাকায় ঢাকা আর্ট সার্কেল নামক একটি শিল্পচর্চার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। শিল্পচর্চায় তিনি বিমূর্ত প্রকাশবাদী তাই তিনি বিমূর্ততার বিমুগ্ধতায় আরবী হরফগুলো বিন্যস্ত করে থাকেন।[১৬]

শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী

শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ছিলেন। ১৯৩৭ সালে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের লালনগর শেখেরহাটে জন্মগ্রহণকারী শিল্পী নিজামী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৫৮ সালে ড্রইং ও পেইন্টিং-এ মাস্টার্স, ১৯৬৯ সালে কমনওয়েলথ এর বৃত্তির অধীনে পেইন্টিং এর উপর ব্রোটন কলেজ অব এডুকেশন ইউকে তে শিক্ষালাভ করেন এবং বারনসলী কলেজ অব ইউকে তে সিরামিকে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৬৯ সালে বৃত্তি নিয়ে বিভিন্ন দেশের শিক্ষার উপর কাজ শুরু করলে তার ছবিতেও নির্বস্তুতা আসে। তবে ৭০ দশকের মাঝামাঝিতে তাঁর ছবিতে পুরো বিমূর্ততা জুড়ে বসে। ১৯৭৯ সালে তিন সদস্যের সাংস্কৃতিক দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে জিডি আর ভ্রমণ ও ব্যক্তিগত শিক্ষা সফরে ইউকে ভ্রমণ করেন।

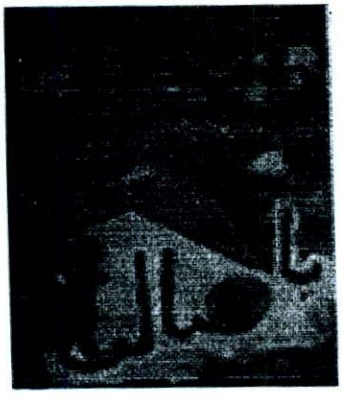

১৯৭০ সালে জাপানে, ১৯৮১ সালে হংকংয়ে, ১৯৯০ সালে জিম্বাবুয়ে, ১৯৯৪ সালে ভারতে ও ১৯৯৫ সালে নেপালে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর নির্মিত শিল্পকর্ম আমেরিকা, জাপান, বৃটেন, জার্মান, ইরান, কানাডা, জ্যামাইকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পাকিস্তান, ফ্রান্স, পূর্ব বার্লিন এবং বাংলাদেশের জাতীয় চিত্রশালা ও জাদুঘরে তাঁর ছবি সংরক্ষিত আছে। শিল্পী নিজামী ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সবক'টি গ্রুপ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে নতুন শিল্পীদের উৎসাহিত করেছেন এবং তাঁর ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং দর্শক মহলে প্রশংসিত হয়েছে। তিনি ৭০ এর দশকে ক্যালিগ্রাফি

Dhaka University Institutional Repository

পেইন্টিং শুরু করে আমাদের পথ উন্মোচন করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট এর সার্থক পরিচালক ছিলেন।[১৭] তিনি শিল্পের নান্দনিক বিষয়গুলো নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করছেন এবং অপূর্ব সুন্দর স্বার্থক ছবির জন্ম দিয়েছেন। তাঁর এমন স্বার্থক শিল্পের সংখ্যাও যথেষ্ট। তৈলচিত্র ছাড়াও তিনি মৃৎশিল্পে কাজ করে থাকেন। যা আকার আকৃতিতে চকচকে বর্ণ প্রলেপ সমন্বিত হয়েছে তাঁর বিশিষ্ট চিহ্নিত মনোভঙ্গি।

তিনি দেশে বিদেশে অসংখ্য প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর শিল্পকর্ম দেশ বিদেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। তাঁর শিল্পকর্ম প্রসঙ্গে ড. আব্দুস সাত্তার বলেন- তার ব্যবহৃত রংয়ের সংমিশ্রণ, বিষয়ের উপস্থাপনা সব কিছুতেই সরলতার ছাপ বিদ্যমান।" তাঁর অনেক ক্যানভাসে বিষয়ের আধ্যাত্মিক আলোর সমন্বয় ঘটেছে। এ সকল ক্যানভাসে রং ও ফর্মের সাথে যেভাবে আলোর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে, তাতে প্রাচীন স্পিরিচুয়াল বা ঐশ্বরিক ভাবাপন্ন চিত্রাবলীর অনুরূপ আবহের সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পীর কন্সট্রেশন, কম্পজিশনসহ বিভিন্ন চিত্রাবলী এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বিমূর্ত ধারার

এ সকল চিত্রাবলী ছাড়াও তিনি ইসলামের সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তাঁর ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনের আরবী হরফ বিন্যাস ও আয়াত ব্যবহারের মাধ্যমে বেশ কিছু শিল্পকর্ম তিনি তৈরী করেছেন।[১৮]

তিনি পেইন্টিং ও সিরামিকে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর বিমূর্ত পেইন্টিং সর্বজন বিদিত। তিনি ক্যালিগ্রাফিকে বিমূর্ত ধারায় পেইন্টিংয়ে প্রকাশ করেছেন। গভীর মমত্ববোধ, গীতিময়তা, ছন্দ ও সৌকর্য দিয়ে আরবী হরফের লালনে তিনি কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন। আধুনিক শিল্পকলা চর্চা করে তিনি এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। সপ্তম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তাঁর শিল্পকর্মে গতানুগতিক বা ট্রাডিশনাল এবং আধুনিক রীতিকৌশলের সংমিশ্রণ ঘটেছে। তিনি তাঁর উজ্জ্বল বর্ণের আধিপত্যে নির্মিত বিমূর্ত চিত্রে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ভাবমূর্ছনায় চিত্রিত করেছেন ঐশীবাণীর ক্যালিগ্রাফির স্ফুরণ। সপ্তম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে প্রদত্ত শিল্পকর্মে তিনি স্বভাবসুলভ মনের ব্যবহারে উল্লম্ব আকৃতির আরবী ক্যালিগ্রাফি

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। ফলে তিনি 'ক্যালিগ্রাফি পদক-২০০৪' লাভ করেন। শিল্পাচার্য হিসেবে তাঁর এ চিত্রকে সুন্দর ও সাবলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায়।[১৯]

শিল্পী সবিহ-উল আলম

শিল্পী সবিহ উল আলম বাংলাদেশে আরবী ক্যালিগ্রাফির অন্যতম পুরোধা। তিনি একাধারে শিল্পী, লেখক ও শিল্পতাত্ত্বিক। তিনি ১৯৪০ সালে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা- মাহবুবুল আলম চট্টলার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি ১৯৬৩ সালে এশিয়া ফাউন্ডেশন স্কলারশীপের মাধ্যমে লাহোরের 'ন্যাশনাল কলেজ অব আর্ট' থেকে ডিজাইনের উপর স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং ডিজাইন পেশায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। বই পুস্তক, ম্যাগাজিন ইত্যাদির প্রচ্ছদ শিল্পী হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। ১৯৬৪ সালে তিনি নিখিল পাকিস্তানে 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার এ্যাওয়ার্ড', 'কামরুল হাসান এ্যাওয়ার্ড, এবং 'বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ এ্যাওয়ার্ড' পান। ১৯৭৫ সালে জেনেভা সুইজারাল্যান্ডে UNOP/ UNCTAD/ GATT আয়োজিত মাসব্যাপি 'ডিজাইন ফর এক্সপোর্ট' শীর্ষক সেমিনারে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং এ লক্ষ্যে ফিল্ড রিসার্চ এর আওতায় যুক্তরাজ্য, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইডেন ও ডেনমার্ক ভ্রমণ করেন। তিনি পরিকল্পনা ও বাংলাদেশের রপ্তানীতে একজন পথিকৃৎ। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের উৎপাদিত দ্রব্য রপ্তানীতে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি হস্তলিপি রপ্তানীর জন্য ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মালেশিয়া, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব ভ্রমণ করেন।[২০]

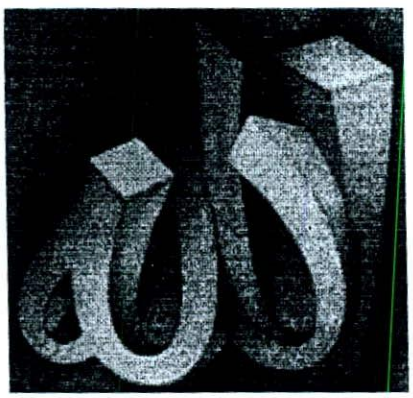

শিল্পী সবিহ-উল আলম বাল্যকাল থেকেই ব্যাপক লেখালেখি করেছেন। তাঁর রসাত্মক গল্প পাঠক মহলে বেশ সমাদৃত হয়। ১৯৭৫ সালে তাঁর প্রথম বই 'পিমপেরী নেকলেস ও অন্যান্য' এছাড়া হাস্যরসের উপর তার আরো তিনটি বই রয়েছে। শিশুদের উপযোগী করে লেখা 'লেখা থেকে রেখা', নামক ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক এবং 'কারুকাজে জাদুকর' শীর্ষক ইসলামী ডিজাইন বিষয়ক আরো দু'টি বই প্রকাশ করেন। তরুণ পাঠকদের জন্য আনন্দদায়ক বিষয় নিয়ে 'পিকনিক' নামে একটি বই লিখেন। ১৯৯২ সালে

Dhaka University Institutional Repository

শিশুপ্রেমিক একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দেন এবং শিশু-কিশোর পত্রিকা মাসিক টুইটুম্বুরে নিয়মিত লিখতেন এবং তাদের উপযোগী ছবি আঁকতেন।

মসজিদের ডিজাইনেও তার সৃজনশীল হাত রয়েছে। ফেনী জেলার বল্লভপুরে 'জোসনে আরা কাশেম মসজিদ' ও নোয়াখালীর 'শরীফপুরে বায়তুশ শরীফ মসজিদ' তার অনন্য নিদর্শন। তিনি 'রোটারি ক্লাব অব ঢাকা ওয়েস্ট' এর সাবেক সভাপতি, কক্সবাজার বায়তুশ শরফ হাসাপাতালের প্রধান উপদেষ্টা, চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের আজীবন সদস্য ও ফাতেহবাদ ফাউন্ডেশন ফর এডুকেশন এন্ড ওয়ার্ক এর সভাপতি। তার স্ত্রী সেলিমা সবিহ 'মাসিক টাইটুম্বুর' এর সম্পাদক ছিলেন। যিনি মাত্র কয়েক বছর আগে পরলোকে গমন করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত কমিউনিকেন্টস এ মাল্টিডিসিপিনারী কনসাল্টিং অর্গানাইজেশন এর চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি সোসাইটির অন্যতম উপদেষ্টা।

সবিহ-উল আলম ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ২০০২ ও ২০০৩ সালে যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফি স্কেচ চিত্রকলায় ত্রিমাত্রিক ধারাকে পরিপুষ্ট করেছে। দৃষ্টি বিভ্রমের মাধ্যমে তিনি ত্রি-মাত্রিক ক্যালিগ্রাফি চিত্র নির্মাণ করে এক নতুন ধারার প্রচলন করেন। ২০০২ সালে পঞ্চম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত 'আল্লাহ' ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্মটি একটি নতুন ধারার কাজ। এতে ত্রিমাত্রিক ধারা (Three dimensional) লক্ষ্য করা যায়। জল রংয়ে তিনি আল্লাহ শব্দ নিয়ে যে অসাধারণ ক্যালিগ্রাফি করেছেন তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি ক্যালিগ্রাফি কলমের স্পর্শকাতর প্রয়োগে ক্যালিগ্রাফি ইমেজ সৃষ্টি করেছেন।[২১] তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দ্বিবিধ ভূমিকায় বিভাজিত হতে থাকে রহস্যের প্রাবল্য। উপরিভাগ তার অনেক উঁচুতে হলেও গভীরতার একান্তে তার সূচনা কেননা গভীরতায় তিনি বুঝিয়ে থাকেন অনুভবের তারতম্য।

তাঁর আরেক শিল্পকর্ম 'আলিফ-লাম-মীম' এর অর্থগত উন্মেষ চির রহস্যাবৃত হলেও অনুভবের বিচরণে তিনি প্রকাশ করেছেন নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং আত্মমগ্ন নির্জনতা থেকেই একক বর্ণে তিনি বৈচিত্র সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু হঠাৎ দেখে রংয়ের তাৎপর্য উপলব্দি করা যায় না। বোধ উজানিয়া বিমূর্ত কাজ বলে কখনো তা মনে হলেও মূর্ততা

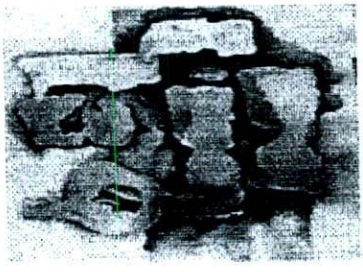

Dhaka University Institutional Repository

বিরাজ করে বিমূর্তের মধ্যে। উচ্চতায় প্রবল অধিকারে হাল্কা রেখার ইশারার মত যেখানে রহস্যের অমোঘ বিশ্লেষণ সৃষ্টি হয়। তাই বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে সৃজনশীল শিল্পী ও ডিজাইনার হিসেবে সবিহ-উল আলমের নাম ভাস্বর হয়ে থাকবে।

শিল্পী অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম

অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম ১৯৪২ সালে কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের একজন প্রধান শিল্পী ও লেখক। তিনি ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানের 'কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফটস' (যা বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে রূপান্তরিত হয়েছে) হতে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ, বিএড, এম.এড ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। বর্তমানে তিনি কিশোরগঞ্জ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের একজন অধ্যাপক।

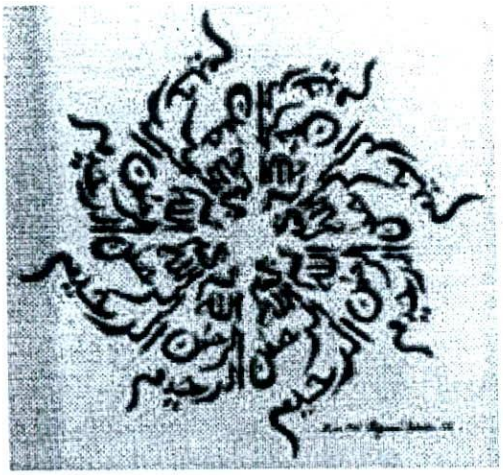

অধ্যাপক রেজাউল করিম ১৯৯২ সালে ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবে এবং ১৯৯৪ সালে কিশোরগঞ্জ প্রেস ক্লাবে পেইন্টিং এর একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। তাছাড়া তিনি ১৯৬৩ সালে রমনা গ্রীন, ১৯৬৪ সালে ঢাকা আর্টস কাউন্সিল আয়োজিত 'ন্যাশনাল পেইন্টিং এক্সিবিশন', ঢাকা লুব্ধক গ্যালারী, ১৯৬৫ সালে ঢাকা আর্ট এসেম্বল গ্যালারী, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ পরিষদ ময়মনসিংহ কর্তৃক আয়োজিত 'গ্রুপ পেইন্টিং প্রদর্শনী', ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত 'ন্যাশনাল আর্ট এন্ড ক্রাফট এক্সিবিশন' এবং ২০০২ ও ২০০৩ সালে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত পঞ্চম ও ষষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশের অন্যতম উপদেষ্টা।

তাঁর 'বিসমিল্লাহ আর রাহমান আর রাহীম' শীর্ষক শিল্পকর্ম ২০০২ সালে পঞ্চম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছিল যা গোলায়িত বৃত্ত ঘুর্ণায়মান ঘুর্ণির মত মনে হয়। তিনি একে অপূর্ব নন্দনতাত্ত্বিক

Dhaka University Institutional Repository

মোহজালে আবদ্ধ করেছেন। তিনি তাঁর শিল্পকর্মে একটি ইল্যুশন তৈরী করলেও সহজে তা পড়া যায়। মোহাম্মদ আব্দুর রহীম তার 'ইসলামী ক্যালিগ্রাফি' বইতে রেজাউল করিম সম্পর্কে বলেন- তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে একটি অপার্থিব ব্যাঞ্জনা দর্শককে আন্দোলিত করে।

ভাস্কর রাসা

১৯৫৭ সালে কুমিল্লায় জন্ম গ্রহণকারী রাসা একজন ব্যতিক্রমধর্মী ক্যালিগ্রাফার। তিনি বুলবুল ললিতকলা একাডেমী থেকে ভাস্কর্যে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করে মূলত ভাস্কর্য নির্মাণে ব্যস্ত রয়েছেন। তিনি দেশে বিদেশে আয়োজিত শিল্পকলার বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বহুবার পুরস্কৃতও হয়েছেন। শিল্পনির্মাণে তিনি যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। ক্যানভাস ছাড়াও ভাস্কর্য ও ম্যুরালে তাঁর ক্যালিগ্রাফি পরিলক্ষিত হয়। তাঁর ত্রি-মাত্রিক ধারায় নির্মিত 'মুহাম্মদ' শীর্ষক ভাস্কর্যরূপ ক্যালিগ্রাফি শিল্পাঙ্গনে বেশ আলোড়িত হয়েছে। ২০০২ সালে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে ভাস্কর রাসা ভাস্কর্যের রূপায়নে নির্মিত ক্যালিগ্রাফি দর্শক মহলে সাড়া ফেলে।[২৩]

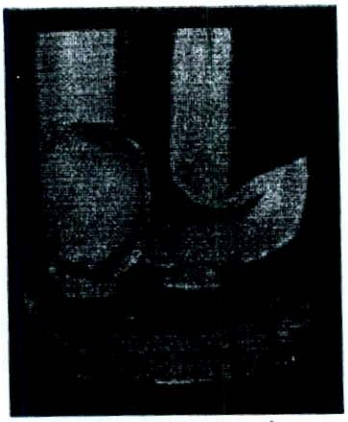

তিনি ভাস্কর্যকে শিল্পমাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে ক্যালিগ্রাফিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন এবং এ বিষয়ে অনেক লেখাও রচনা করেছেন। ঢাকা ও চট্টগ্রামে অনেক মসজিদে রাসা আরবী ক্যালিগ্রাফি অলঙ্করণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত বাংলা হরফ নিয়েও ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন। শিল্পের আদিম এ বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে তিনি এককভাবে মনোসংযোগ করেছেন এবং তিনি এর ব্যবহারে অনবরত সৃষ্টি করে চলেছেন মহান সব শিল্পকর্ম। অ, আ থেকে শুরু করে সকল বাংলা অক্ষর দিয়ে তিনি ভাস্কর্য গড়েছেন এবং আকার কিংবা একার কিছুই তার কাছে নগণ্য নয়। এভাবে অপশিল্পের বিপরীতে তিনি পরিশীলিত ও বিশুদ্ধ ধারার শিল্প নির্মাণে আপ্রাণ সাধনা করে যাচ্ছেন। সৃজনশীল এ শিল্পী বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে বেশ নাম করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী ফরেজ আলী

শিল্পী ফরেজ আলী ১৯৫৭ সালে নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট হতে ড্রইং ও পেইন্টিং এর উপর এম.এফ.এ পাশ করেন। তিনি বর্তমানে ঢাকার ক্যান্টনমেন্টস্থ আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনস্টিটিউটের ডিজাইনার CGO-1 এবং আজিমপুর প্রভাতি আর্ট স্কুলের খণ্ডকালীন শিক্ষক। তিনি ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের প্রবীণ মাঝে অন্যতম। তিনি মিক্সড মাধ্যমে মুহাক্কাক ও রায়হানী লিপিতে মোট ২৫টি শিল্পকর্ম নির্মাণ করেছেন। তার শিল্পকর্ম মাধুর্যমণ্ডিত ও প্রতিভাদীপ্ত। তেলরংয়ে ক্যানভাসে তিনি নির্মাণ

করেছেন বাংলা ও আরবী হরফের একটি অনুপম ক্যালিগ্রাফি। যেখানে রয়েছে জ্যামিতিক ও কুফিক রীতি। তিনি সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পকর্মে সিদ্ধহস্ত। তিনি অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। ২০০৫ সালে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত শিল্পকর্ম বেশ চমক সৃষ্টি করে। তিনি পেইন্টিং-এ ক্যালিগ্রাফির জিওমেট্রিক ফর্মের সমন্বয় করেছেন। তার শিল্পকর্মে নৈসর্গিক আবহ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রংয়ের ব্যবহার খুবই চমৎকার।[২৪] রেখালিপির পটভূমিতে দৃশ্যগুণের রূপনির্ভর বা বর্ণস্পর্শ বৈচিত্র নির্ভর সমারোহ তাঁর কর্মে গুরুত্ব লাভ করেছে। বর্ণাঢ্য ক্যানভাসে অপরূপ ভঙ্গিমায় অঙ্কিত 'ইকরা বিসমি রাব্বি কাল্লাযি খালাক' শীর্ষক ক্যালিগ্রাফি এক অন্যরকম দ্যোতনা সৃষ্টি করে।

শিল্পী মনিরুল ইসলাম

শিল্পী মনিরুল ইসলাম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্পেন প্রবাসী একজন চিত্রশিল্পী। তিনি ১৯৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ থেকেও বাংলাদেশের প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন কয়েকটি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। তেমনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিচরণ ও ক্যালিগ্রাফি চর্চা করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তিনি জাপানের কিয়োটোতে 'ইন্টারন্যাশনাল ইমপেক্ট আর্ট' ও 'ফেস্টিভ্যাল মিউনিসিপাল আমেরিকা'র ক্যালিফোর্নিয়া ও সানফ্রান্সিসকোর 'মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট'-

Dhaka University Institutional Repository

এ অনুষ্ঠিত 'এশিয়ান কনটেম্পরারি গ্রাফিক বাইনেল', ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত গ্রান্ড প্যালেসে অনুষ্ঠিত SAGA -88, স্পেনের মাদ্রিদে, সেন্ট্রো আয়োজিত 'প্রিন্ট আর্ট ফেয়ার', ইন্ডিয়ার ভূপালের মিউজিয়াম অব আর্ট একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত প্রথম 'ইন্টারন্যাশনাল বাইনেল', বুলগোরিয়ায় গ্রাফিক্সের উপর আন্তর্জাতিক দ্বি-বার্ষিক বাইনেল 'VARNA-43' বার্লিনে অনুষ্ঠিত 'ইন্টারগ্রাফিক-৯০' সুইজারল্যান্ডের বাসালে অনুষ্ঠিত 'জার্মানী এডিশন ৩/৯২', মরক্কোর আসিলায় অনুষ্ঠিত 'ARCO-94', গ্যালারী স্ট্যাম্প, গ্যালারী BAT ইত্যাদির যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া মিশরের কায়য়োয় অনুষ্ঠিত 'ট্রেইনিয়াল অব গ্রাফিক্স' এবং 'ইজিপশিয়ান বাইনেল' এ বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।

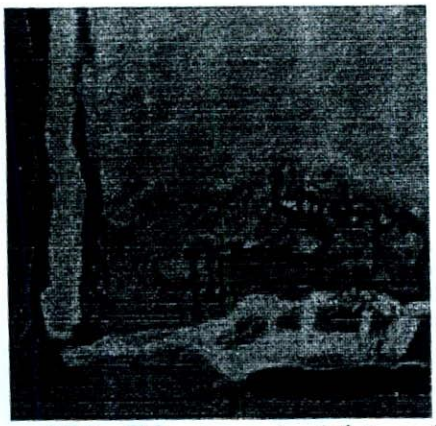

শিল্পী মনিরুল ইসলাম শুধু যৌথই নয় বরং দেশে বিদেশে অনেকগুলো একক প্রদর্শনীতেও অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮০ সালে হল্যান্ডের আমস্টারডামের 'কুন্সথলে রয়েরেন্ট', ১৯৮১ সালে কুয়েতের 'সুলতান গ্যালারী', ১৯৮৪ সালে কানাডার মন্ট্রিলে 'ন্যাশনাল ম্যালন অব দ্যা আর্ট মিউজিয়াম', ১৯৮৫ সালে যুক্তরাজ্যের 'অক্সফোর্ড গ্যালারী', ১৯৮৬ সালে নিউইয়র্কে 'ব্রানক্স মিউজিয়াম অব দ্যা আর্ট', ১৯৮৭ সালে ওয়াশিংটন ডিসির 'অব দ্যা আর্ট', 'সোসাইটি অব ইন্টারন্যাশনাল মনিটরিং ফান্ড', ১৯৮৮ সালে স্পেনের সেভিলা, পাপেল ও লিয়োনকার 'গ্রাফিক আর্ট সেন্টার', ১৯৮৯ সালে কুয়েতের 'সুলতান গ্যালারী', স্পেনের মাদ্রিদে 'গ্যালারী BAT' ও লাস পালমাস এর 'গ্যালারী আটির', ১৯৯০ সালে ইন্ডিয়ার 'বারোডা ইউনিভার্সিটি আর্ট একাডেমী', ১৯৯১ সালে মাদ্রিদে 'গ্যালারী টুর্কুলো' ও ৯২ সালে টলোডোর 'গ্যালারী টলমো', 'গ্যালারী ট্রিনটা', 'মন্টিয়াগো ডি কম্পোস্টিলা', 'গ্যালারী ভারণ' , ১৯৯৩ সালে ঢাকার গ্যালারী 'শিল্পাঙ্গন', স্পেনের মাদ্রিদে 'গ্যালারী ইসটেম্প', ১৯৯৪ সালে 'সালা গার্কাই ফস্টেনিয়ন', 'কাজা ডি', 'আহোরস', 'মিউনিসিপ্যাল ডি পামলোনা', 'গ্যালারী জাপানী', ১৯৯৫ সালে স্পেনের বিলবাউয়ের 'গ্যালারী এমাস্তে, 'মিউজিয়াম অব গয়া', ১৯৯৬ সালে 'গ্যালারী এ ইসটেম্পা', 'গ্যালারী তেমা', ১৯৯৭ সালে ঢাকার গ্যালারী 'শিল্পাঙ্গন', মিশরের কায়রোর 'অনার অব দ্যা ট্রাইনেল', ১৯৯৮ সালে স্পেনের টলেডোর 'গ্যালারী টলমো', ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের ইসলামাবাদের 'গ্যালারী রোটাস',

Dhaka University Institutional Repository

২০০০ সালে করাচীর 'গ্যালারী চাউকান্ডি', ২০০১ সালে মাদ্রিদের 'গ্যালারী ইসটেম্প', ২০০৩ সালে মাদ্রিদের 'আর্ট ফেয়ার ফ্লেচা', ডি আর্টি গ্যালারীর 'আর্ট ফেয়ার অব স্পেনীশ কনটেম্পরারী' ইত্যাদিতে একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।[২৫]

শিল্পী মনিরুল ইসলাম ক্যালিগ্রাফি, চিত্রশিল্প প্রদর্শনী ও মেলায় অংশগ্রহণ করে দেশে বিদেশে অনেক এ্যাওয়ার্ড লাভ করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। ১৯৭২ সালে স্পেনের ইবিজাতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম-'ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন অব দ্যা প্রিন্টস', ১৯৭৪ সালে স্পেনের মাদ্রিদে 'ফার্মেন এরোজামেনা প্রাইজ', ১৯৭৭ সালে যুগোস্লাভিয়ার লুবযানায় 'দ্বাদশ বাইনেল', ১৯৭৮ সালে নরওয়ের চতুর্থ 'ইন্টারন্যাশনাল গ্রাফিক বাইনেল', যুগোস্লাভিয়ার রিজেকায় ষষ্ঠ 'ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন অব ড্রইং', ১৯৯২ সালে নরওয়ের '৬ষ্ঠ ইন্টারন্যাশনাল গ্রাফিক বাইনেল', ১৯৯৩ সালে আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো ও ক্যালিফোর্নিয়ার 'মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট ওয়ার্ল্ড', 'প্রিন্ট ফোর' একই বছরে তাইওয়ানের 'ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন অব প্রিন্ট', ১৯৯৫ সালে স্পেনে দ্বিতীয় 'আন্তর্জাতিক এক্সিবিশন অব প্রিন্ট' পুরস্কার লাভ করেন। সপ্তম 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী পুরস্কার', ১৯৮৬ সালে ইরাকের বাগদাদে 'গ্রাফিক আর্ট'-এ প্রথম, ১৯৯৭ সালে স্পেনের 'ন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড অব স্পেনিশ প্রিন্টস' এবং ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের 'একুশে পদক' লাভ করেন। তিনি বিশ্ববিখ্যাত একজন চিত্রশিল্পী হয়েও ক্যালিগ্রাফির প্রতি গভীর ভালবাসায় এক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রেখেই চলেছেন।

শিল্পী এ এইচ এম বশির উল্লাহ

শিল্পী বশির বাংলাদেশের একজন প্রবীণতম ক্যালিগ্রাফার। তিনি ১৯৪৭ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত 'কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফটস', ঢাকা থেকে ড্রইং ও পেইন্টিং বিভাগে বি.এফ.এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে তিনি, বাটিক, টেক্সটাইল ডিজাইন, শার্ট, থ্রি-পিছ, বেড শিট, সোফা মেট, ওয়ালমেট এর টাই-ডাই, ম্যাপ, ক্যালেন্ডার ও কার্ড তৈরীর কাজে নিয়োজিত থাকেন। তিনি একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত প্রিন্ট মেকিং, ২০০২ সালে সমকাল শিল্পী গোষ্ঠী আয়োজিত ওয়াটার কালার এবং মনো প্রিন্ট বিষয়ক ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি দেশে বিদেশে অনেকগুলো গ্রুপ প্রদর্শনীতে অংশ নেন। ১৯৭০ সালে আর্ট এ্যাসেম্বল গ্যালারী আয়োজিত 'পেইন্টিং এক্সিবিশন' ও 'নবান্ন পেইন্টিং এক্সিবিশন', ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধের উপর 'পেইন্টিং এক্সিবিশন', ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত 'ন্যাশনাল আর্ট এক্সিবিশন', ১৯৮৫-৯২ সাল পর্যন্ত সাজু আর্ট গ্যালারীতে আয়োজিত বাংলাদেশী শিল্পীদের 'গ্রুপ আর্ট এক্সিবিশন', ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত দশম 'ন্যাশনাল আর্ট এক্সিবিশন', ১৯৯৩ সালে আর্ট গ্যালারী টোনে প্রথম 'ন্যাশনাল মিনিয়েচার পেইন্টিং এক্সিবিশন' এবং সাজু আর্ট গ্যালারীতে দেশী বিদেশী শিল্পীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত 'আর্ট এক্সিবিশন', ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত 'ন্যাশনাল একাদশ ও দ্বাদশ আর্ট এক্সিবিশন' এবং সাজু গ্যালারীর 'আর্ট এক্সিবিশন', ১৯৯৫ সালে জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত 'ন্যাশনাল আর্ট বাইনেল', ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত 'ন্যাশনাল আর্ট বাইনেল' ও সাজু আর্ট গ্যালারীর 'আর্ট প্রদর্শনী', ১৯৯৭ সালে জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত অষ্টম 'এশিয়ান আর্ট বাইনেল' এবং সমকাল শিল্পী গোষ্ঠী আয়োজিত ১৯৯৭- ২০০০ সাল পর্যন্ত সকল প্রদর্শনী, ১৯৯৮ সালে ত্রয়োদশ 'ন্যাশনাল আর্ট বাইনেল', ১৯৯৯ সালে নবম 'এশিয়ান আর্ট বাইনেল', ২০০০ সালে চতুদর্শ ন্যাশনাল এবং ২০০১-০২ সালে 'সাইলেন্ট অকশন অব প্রিন্টিং'-এ অংশ গ্রহণ করেন। দেশের বাইরেও বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তার অংশগ্রহণ দেখা যায়। ১৯৯৭ সালে জাপানের কানাগাওয়ায় অনুষ্ঠিত ১৯তম 'ইন্টারন্যাশনাল ইনডিপেনডেন্ট এক্সিবিশন', ১৯৯৮ টোকিওতে 'ইন্টারন্যাশনাল মিনি প্রিন্ট ট্রাইনিয়াল' এবং রুমানিয়ায় 'ইন্টারন্যাশনাল আর্ট এক্সিবিশন'-এ অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা উজ্জ্বল করেন। তিনি বর্তমানে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সহকারী অধ্যাপক এবং ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশের অন্যতম উপদেষ্টা।[২৬]

২০০৩, ২০০৪ ও ২০০৫ সালে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রদর্শনী গুলোতে উপস্থাপিত 'বিসমিল্ল-াহির রাহমানির রাহীম' ও 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' শীর্ষক ক্যালিগ্রাফিদ্বয়ে বেশ গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ অবয়ব নির্মাণ করে তার উপর ক্যালিগ্রাফি করেছেন। সাধারণ লিখন

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েই ক্যালিগ্রাফি করেছেন সমন্তরাল ব্যাঞ্জনায় এবং উল্লম্ব বিন্যাসে। প্রকৃতির সাথে ঐশী বাণীর সর্বাত্মক একক হয়ে উঠার মাঝে শিল্পী অবলোকন করেন ঐশী বাণীর অপার্থিব অস্তিত্ব এবং আমাদের জীবনের সাথে সে মহান বাণীর অপরিহার্যতা। ক্যানভাসে রং ছড়ানো প্রতিভাদীপ্ত এর উপর আরবী হরফের শৈল্পিক অবস্থান ছিল আধ্যাত্মিক চৈতন্যে সর্বোজ্জ্বল। তাঁর ক্যানভাসে রংয়ের রূপচ্ছটা যেন প্রবাহমান কলরোলের মত। আর তার উপরই বর্ণময় আবহে তিনি ক্যালিগ্রাফি এঁকে থাকেন।

শিল্পী সাইফুল ইসলাম

শিল্পী সাইফুল ইসলাম ১৯৪৬ সালে কুষ্টিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি কম পাস করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় যান এবং পোর্ট্রেইট পেইন্টিং এর উপর 'সুরিকভ ইনস্টিটিউট' হতে প্রেসিডেন্ট এসপি ফেলোশীপ অর্জন করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি মালেশিয়ার কুয়ালালামপুর ভ্রমণে যান এবং সেখানে কিছু ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম রেখে আসেন। বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চায় যে ক'জন সর্বাগ্রে রয়েছে তাদের মধ্যে শিল্পী সাইফুল ইসলাম অন্যতম। বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফিকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব শ্রম দিয়েছেন তিনি। তাঁর 'ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি' শীর্ষক শিল্পকর্মটি খুব উঁচু মানের। এতে তিনি সৃজনশীলতা, তাঁর সহজাত শিল্পসত্ত্বা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি ১৯৬০ সালে তৈল রং দিয়ে এ কাজ শুরু করেন।

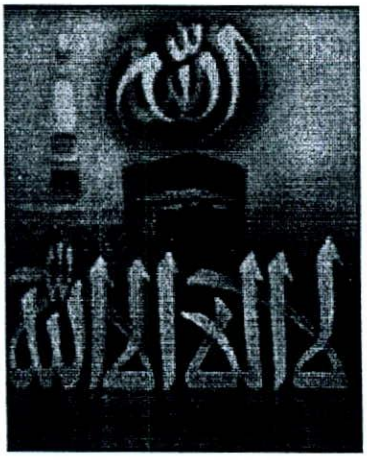

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর সাইফুল ইসলামই প্রথম শিল্পী যিনি ইসলামী ক্যালিগ্রাফি অঙ্গনে কাজ করে এ শিল্পকে জনপ্রিয় করে তুলেন এবং দেশ বিদেশে এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে দেন। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে ওআইসি সম্মেলন উপলক্ষে তাঁর প্রথম 'একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে এটি প্রথম ইসলামী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী। তিনি ১৯৯০ সালে বাংলা ক্যালিগ্রাফিও শুরু করেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফি কর্মগুলো বাংলাদেশের শিল্পচর্চার জগতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে।[২৭] এরপর ১৯৯৪ ও ৯৫ সালে তিনি ঢাকা 'শেরাটন হোটেল' ও 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন অডিটোরিয়াম' এবং ১৯৯৬ সালে জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত 'চতুর্থ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী'তে অংশগ্রহণ করেন। ২০০১ সালে জাতীয় জাদুঘরে

Dhaka University Institutional Repository

তার 'একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হয়। তিনি এতে ধাতুর ব্যবহারে ক্যালিগ্রাফি (Metallic Calligraphy) সৃষ্টি করেন। ১৯৯৮ সালে ও ২০০০ সালে 'গ্রুপ প্রদর্শনী'তে তাঁর ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। ২০০৫-২০০৬ সালে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে যথাক্রমে অষ্টম ও নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন।

শিল্পী সাইফুল ইসলাম তাঁর অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের জন্য ১৯৯৬ সালে 'জাতীয় সাহিত্য সনদ' কর্তৃক সেরা ক্যালিগ্রাফার হিসেবে স্বর্ণপদক লাভ করেন। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যথা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে, আর্মি হেড কোয়ার্টারে এবং বিভিন্ন বেসরকারি অফিসে তাঁর ক্যালিগ্রাফি কর্ম সংগৃহীত রয়েছে। শুধু তাই নয় সৌদি আরব, জাপান, আমেরিকা, দুবাই, যুক্তরাজ্যের কিছু সংগ্রাহক তাঁর শিল্পকর্ম ক্রয় করেন এবং নিজ নিজ গৃহে ও অফিসে সংরক্ষণ করেন। তিনি একজন নিয়মিত পেইন্টার। এখনও তাঁর কাছে শত শত ক্যালিগ্রাফি সংরক্ষিত আছে। ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং ও শিল্পচর্চায় তিনি নিরবিচ্ছিন্ন সাধনা করে যাচ্ছেন। এজন্য তিনি সেজান আর্ট স্কুল নামে একটি আর্ট স্কুল ও সেজান আর্ট গ্যালারী প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেখানে দুই যুগের বেশি সময় ধরে শিক্ষকতা করছেন। ঢাকায় তাঁর ৩টি কমার্শিয়াল আর্ট গ্যালারী আছে। সম্প্রতি তিনি মোটা কালো কালিতে ক্যালিগ্রাফি নির্মাণে প্রয়াস চালিয়েছেন। তাছাড়া তিনি বাংলাদেশে জাতীয়মানের একটি ক্যালিগ্রাফি আর্ট গ্যালারী প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন লালন করছেন। এভাবে সদাসর্বদা তিনি ক্যালিগ্রাফি শিল্পের বিস্তৃতির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।[২৮]

শিল্পী সাইফুল ইসলাম তুঘরা লিপিতে 'আল্লাহু আকবার' শীর্ষক একটি ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করেন। নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তাঁর পাঁচটি শিল্পকর্ম স্থান পায়। এসব শিল্পকর্মে শীর্ষ শিল্পের অনেক রেখা ভাবনাই উন্মোচন করেন। রেখা নির্ভর বৃত্তান্তে কালির প্রবাহ কতটা উচ্চতায় বা দ্রুততর হয়ে উঠে তিনি সেসব গতি বিন্যাস করেন তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে। একটি ক্যালিগ্রাফিতে কাবা শরীফের অটল আবাহন এমন

Dhaka University Institutional Repository

মুগ্ধতায় আঁকেন যেন সকলেই সেই কালো রং ছুঁয়ে এসেছে। এভাবে তার ক্যালিগ্রাফির কর্মধারা দেশে ব্যাপক সমাদরে গৃহীত হয়েছে।[২৯]

শিল্পী এনায়েত হোসেন

সৈয়দ এনায়েত হোসেন বাংলাদেশের আরেকজন খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফার। তিনি ১৯৪২ সালে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে চারুকলার উপর গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। ২০০২ সালের মার্চ মাসে চট্টগ্রামে 'ঢাকা আর্ট সার্কেল' এবং 'কাব্যকলা' আয়োজিত আর্টিস্ট ক্যাম্পে কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্বভাব নির্ভর শৈল্পিক বরাভয়ে তাঁর ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম নির্মাণ করেন। ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান 'এবস্ট্রাক্ট আর্ট', ১৯৭৪ সালে ঢাকা আর্ট কলেজের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত 'আর্ট শো', সাজু আর্ট গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত 'বার্ষিক আর্ট প্রদর্শনী', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনী এবং ১৯৯৫ সালে 'ঢাকা আর্ট সার্কেল' কর্তৃক ৭ শিল্পীর অংশগ্রহণে আয়োজিত প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে নিখিল 'পাকিস্তান ন্যাশনাল এক্সিবিশন' এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত ১৯৮৩, ৮৬ ও ৮৯ সালের 'ন্যাশনাল এক্সিবিশন অব পেইন্টিং' এ অংশগ্রহণ করেন।

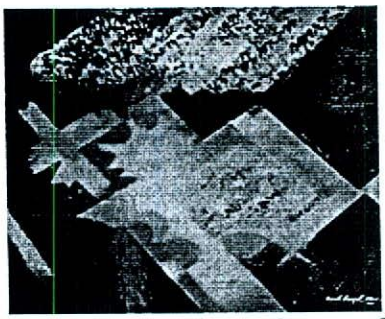

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তিনি ১৯৮৮ ও ১৯৯০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'এশিয়ান বাইনেল' এ অংশগ্রহণ করেন। তিনি শিল্পচর্চায় ব্যাপক অবদান রাখার জন্য ১৯৯৮ ও ৯০ সালে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং ১৯৯৩ সালে শিশু সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। তিনি বর্তমানে অবজারভার গ্রুপ অব পাবিলিকেশন্স এর প্রধান আর্টিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি তেমন বেশি ক্যালিগ্রাফি আঁকেননি। বরং তিনি অধিকাংশ সময়ই বিমূর্ত ধারার ছবি আঁকতেন।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী কামরুল হাসান কালন

শিল্পী কামরুল হাসান কালন প্রাচ্যকলার একজন অভিজ্ঞ শিল্পী। তিনি ১৯৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে ঢাকার 'বাংলাদেশ কলেজ অব আর্ট এন্ড ক্রাফট' (যা বর্তমান ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের চারুকলা অনুষদ হিসেবে পরিচিত) হতে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৫ থেকে ৭৭ সাল পর্যন্ত আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসির 'হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি'তে থিসিস কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি 'ড্রইং ও পেইন্টিং' এর উপর হল্যান্ডের 'রিজিকস একাডেমী' হতে একাডেমিক স্কলারশীপ এবং ১৯৭৯-৮০ সালে জাপান ফাউন্ডেশন ফেলোশীপের অধীনে 'টোকিও ইউনিভার্সিটি অব ফাইন আর্টস' প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও দেশের বিভিন্ন স্থানে একত্রিশটি একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন এবং লন্ডন, আমস্টারডাম, প্যারিস, নিউইয়র্ক, টেক্সাস, ওয়াশিংটন ডিসি, মেরিল্যান্ড, টোকিও ও রিয়াদে মোট এগারটি একক প্রদর্শনীর আয়োজন করে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। পেইন্টিং-এ ক্যালিগ্রাফির উপস্থাপনে তাঁর প্রয়াস প্রশংসার যোগ্য।

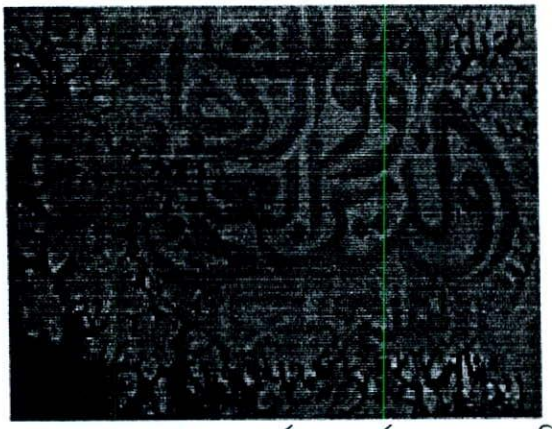

তিনি ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ এর একজন উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি ঢাকায় সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত ২০০৩-২০০৪ সালে যথাক্রমে ষষ্ঠ ও সপ্তম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সপ্তম প্রদর্শনীর শেষদিন প্রদর্শনীতে এসে তাঁর শিল্পকর্ম দেখে গিয়ে মাত্র কয়েকদিন পরই এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যান গন্তব্যের রাজপথে। সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ অনেকগুলো শিল্পকর্ম তিনি রেখে গেছেন, তার মধ্যে বেশ কিছু ক্যালিগ্রাফিও আছে। তিনি লাল সবুজ ফুল ও পাতা এঁকে অবশিষ্ট পরিসরে ক্যালিগ্রাফি করেছেন। হস্তলিখনগত বিশেষ গতিব্যঞ্জনা তাঁর চিত্রে কম থাকলেও তাঁর অঙ্কিত ফুল ও পাতার মধ্যে দর্শকদের জন্য চোখের আনন্দ রয়েছে।[৩১] তিনি ভবিষ্যতে আল্লাহর গুণবাচক নামের উপর একটি সিরিজ ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং করা অবস্থায় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং পি জি হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান।[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল

নতুন প্রজন্মের প্রতিভাবান এবং প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদের মাঝে ক্যালিগ্রাফিতে যারা বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তাদের মধ্যে শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল অন্যতম। তিনি ১৯৫৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট হতে 'ড্রইং ও পেইন্টিং' এ মাস্টার্স পাশ করেন। ক্যালিগ্রাফির প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করে তিনি মাস্টার্স-এ 'বাংলাদেশের শিল্পকলায় ইসলামী প্রভাব' শীর্ষক অতিসন্দর্ভ রচনা করেন। তাছাড়া বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত ১৯৮২ সালে তিন মাসব্যাপি 'এচিং এন্ড এনগ্রেভিং' এর উপর কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

ইব্রাহীম মন্ডল ১৯৯৯ সালে জাতীয় জাদুঘরে একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ১৯৭৬ সালে জাতীয় খেলাঘর, ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮০ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত প্রদর্শনী সমূহ, ১৯৭৭-৮৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত 'ন্যাশনাল ইয়ুথ আর্ট এক্সিবিশন', ১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত সকল প্রদর্শনী, ১৯৯৮ সালে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত 'কার্টুন প্রদর্শনী', ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক জাতীয় জাদুঘরে ২০০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫ সালে অনুষ্ঠিত 'ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' এর আয়োজক ছিলেন এবং নিজে এসব ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণও করেন। ২০০১ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত 'ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', ২০০৫ সালে আমার দেশ ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক আয়োজিত 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদশনী' তে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফির সুনাম ছড়িয়ে পড়লে ২০০১ সালে ইরান সরকারের আমন্ত্রণে তিনি 'নবম ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন'-এ অংশগ্রহণ করেন। তিনি ক্যালিগ্রাফি ও শিল্পকলা চর্চায় অবদান রাখায় ১৯৮১ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' এবং ২০০১ সালে 'স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ পুরস্কার' লাভ করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

'ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ' এর সভাপতি। এ পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় তাঁর প্রায় ২৫ টি ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক লেখা প্রকাশ পেয়েছে।

তিনি ক্যালিগ্রাফির পাশাপাশি একজন খ্যাতিমান কার্টুনিস্ট। বর্তমানে তিনি 'দৈনিক সংগ্রাম' পত্রিকার স্টাফ আর্টিস্ট ও কার্টুনিস্ট এবং কার্টুন বিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন 'নয়া চাবুক' এর সম্পাদক। তাছাড়া তিনি ঢাকাস্থ মানারাত ইন্টারন্যাশন্যাল স্কুল এন্ড কলেজ এর 'আর্ট এন্ড পেইন্টিং' এর শিক্ষক এবং চিত্রণ গ্রাফিক্সের ডিজাইনার। তার নির্মিত শিল্পকর্ম ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, প্রাইম ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিচার্স একাডেমী, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স, বাংলাদেশ টোবাকো, খুলনা ক্যান্টনমেন্ট, রিয়াজ গার্মেন্টস, ফুয়াদ খতিব হাসপাতাল এবং বহির্বিশ্বের মধ্যে যুক্তরাজ্য, আমেরিকা, ইতালী, অস্ট্রেলিয়া ও ইরানে সংরক্ষিত আছে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চায় এবং এদেশে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের অগ্রসরমানতায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কারণ বিগত কয়েক বছর যাবত যেসব প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার প্রায় সবগুলোই আয়োজন করে বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি। আর তিনি হলেন এ সংগঠনের সভাপতি।[৩৩]

শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল ক্যালিগ্রাফার হিসেবে নতুনত্বের ছাপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর শিল্পকর্ম দেখলেই বুঝা যায় যে, এটি তাঁর স্বকীয় ধারা। নান্দনিকতায় তাঁর শিল্পকর্ম উঁচু অবস্থানে বিরাজ করছে। তিনি বিমূর্ত রেখাঙ্কনের সাহায্যে এবং বিচিত্র বর্ণের প্রলেপে আরবী হরফগুলো ফুটিয়ে তুলতে পারেন। রেখার উর্ধ্ব-অধগতি কখনও সমান্তরাল রেখাঙ্কন আবার কখনও হরফের অন্তরূপটা প্রবাহমান রেখে তিনি তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে সমতা বিধান করেছেন। নাসতা'লিক ও কুফী হরফ ভেঙ্গে যে লীলা বৈচিত্র সৃষ্টি করেছেনতা সত্যই অনুপম। তিনি গোয়াশ, এক্রিলিক, পেইন্টিং ও তেল রংয়ে তাঁর প্রিয় দিওয়ানী ও সুলুস যা বাংলার নির্মাণের সাথে একাকার করে চিত্রিত করেন নান্দনিক বৈশিষ্ট্যে। লতাপাতার সাথে ক্যালিগ্রাফির সমন্বয় আছে বলে তিনি মনে করেন। তাই তিনি ক্যালিগ্রাফির আশে-পাশে লতাপাতার মতো ডেকোরেটিভ করে তুলেছেন তাঁর ক্যালিগ্রাফি চিত্রকে। ফুল ও পত্র-পল্লবের প্রাসঙ্গিকতায় আলো-আঁধারির সরব উপস্থিতি তাঁর চিত্রকে

Dhaka University Institutional Repository

বিশদ ব্যাঞ্জনায় উপস্থাপন করেছে। তিনি আধ্যাত্মিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ও আল্লাহর মহত্ত্ব উপলব্ধি করে তা ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন। দিওয়ানী ও সুলুস ধারায় তাঁর হলুদের প্রয়োগ অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও নান্দনিক। তিনি এবস্ট্রাক্ট অপেক্ষা ট্রাডিশনাল ক্যালিগ্রাফি অধিক পছন্দ করেন। কালেমা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' কে তিনি রং তুলির মাধ্যমে ত্রি-মাত্রিক রীতিতে ট্রাডিশনাল নাসতা'লিক ক্যালিগ্রাফি করেন যা এক ঐন্দ্রজালিক আবেশের সৃষ্টি করে। আরবী হরফের মাহাত্ম উপলব্ধি করে তিনি কালেমা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' কে রং তুলির মাধ্যমে নাসখ রীতিতেও ক্যালিগ্রাফি করেছেন। তাঁর সৃজনশীলতা, তাঁর শিল্পকর্মে বিধৃত হয়েছে।[৩৪] তাঁর ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে ড. আব্দুস সাত্তার বলেন- তাঁর ক্যালিগ্রাফির মধ্যে বর্ণবিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যে, রং ও বর্ণ মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। ফলে তাঁর চিত্রে একটি ভিন্ন স্বভাব পরিলক্ষিত হয়।

শিল্পী আরিফুর রহমান

১৯৫৯ সালে বরিশাল শহরে জন্ম গ্রহণকারী শিল্পী আরিফুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজ বিজ্ঞানে মাস্টার্স পাশ করেন। চারুকলায় তার কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ বা ডিগ্রি না থাকলেও তিনি ১৯৯৫ সাল থেকে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করে আসছেন। তিনি ২০০০ সালের জুন মাসে জাতীয় জাদুঘর, সেপ্টেম্বরে সুলেমান হল সিলেট, ২০০১ ও ২০০২ সালে জাতীয় জাদুঘর এ অনুষ্ঠিত 'একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' এবং ১৯৯৯ সালে ইরানে 'ইন্টারন্যাশনাল কুরআন ফেয়ার' এর আয়োজন করেন। ১৯৯৭ সালে ইরানের তেহরানে 'ইসলামিক ওয়ার্ল্ড ক্যালিগ্রাফি ফেস্টিভ্যাল', ১৯৯৮ সালে জাতীয় জাদুঘরে 'ক্যালিগ্রাফি এক্সিবিশন', ২০০০ সালে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে এবং আমার দেশ ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক আয়োজিত 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', ২০০০ সালে জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত 'কুরআন ফেয়ার, ২০০১ সালে বায়তুশ-শরফ চট্টগ্রাম আয়োজিত 'যৌথ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', ২০০২ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত 'ইসলামী বিশ্বে ক্যালিগ্রাফি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ২০০৪ সালে 'দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী' ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে আয়োজিত 'শিল্পকলা প্রদর্শনী' এবং ২০০৩ সালে জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' তে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৪ সালে ১১তম দ্বিবার্ষিক এশিয় চারুকলা প্রদর্শনী, ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ে চারুকলায় বন্যার্তদের সাহায্যার্থে আয়েজিত প্রদর্শনী, এটিএন বাংলা কর্তৃক হোটেল শেরাটনে আয়েজিত প্রদর্শনী

Dhaka University Institutional Repository

এবং জাতীয় জাদুঘরে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯৭ সালে ইরানের তেহরানে অনুষ্ঠিত 'ইসলামিক ওয়ার্ল্ড ক্যালিগ্রাফি ফেস্টিভ্যাল' এবং ১৯৯৯ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল কুরআন ফেয়ার' এ বাংলাদেশ থেকে এককভাবে নির্বাচিত হন। তিনি পেইন্টিং ও লিপিশৈলী ভিত্তিক চার শতাধিক ক্যালিগ্রাফি অঙ্কন করেছেন এবং সাত শতাধিক সৃজনশীল গ্রন্থ ও ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ ডিজাইন করেছেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফি জাতীয় জাদুঘর, তেহরান মিউজিয়াম এন্ড কন্টেম্পোরারি আর্টস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, সাউথ ইস্ট ব্যাংক, সোশাল ইসলামী ব্যাংক, ইসলামিক কমার্শিয়াল ইন্সুরেন্স, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ইয়ুথ গ্রুপ, যুক্তরাজ্য, আমেরিকা, দুবাই, মালয়েশিয়া ও ভারতে সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে তিনি 'বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমী' ও 'বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি শিল্পী সংসদ' এর আহবায়ক, ত্রৈমাসিক 'ক্যালিগ্রাফি'র প্রধান সম্পাদক এবং কালার ক্রিয়েশন এর শিল্প নির্দেশক।[৩৫] ইতোপূর্বে তিনি দৈনিক জনতা, দিনকাল ও মিল্লাতে স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেন।

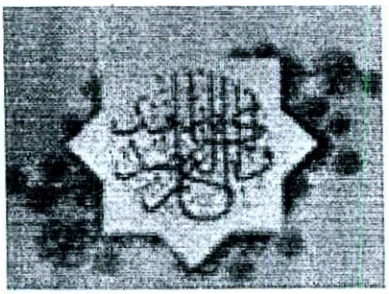

আরিফুর রহমানের করা তাঁর সকল ক্যালিগ্রাফি-ই শৈলীভিত্তিক। আরবী বর্ণের গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তিনি বিভিন্ন বর্ণমালার ক্যানভাস সাজান। এক্রিলিক মাধ্যমে করা তাঁর 'আলিফ বিন্যাস-৪' চিত্রে উল্লম্ব ও আনুভূমিকভাবে ২৩টি আলিফ উপস্থাপন করেছেন। আলিফগুলো প্রায় একই স্বভাবের মনে হলেও বর্ণগত বৈচিত্র বিশদতায় সেসব অভিনব সম্মোহন রূপায়িত হয়েছে। এ রূপায়নের প্রাণস্পর্শী শিল্পীত চিত্রায়নে তিনি শৈলী নির্ভরতার স্বভাব ও আনন্দকে নব-নির্ণেয়তায় উন্মোচন করেছেন। যেখানে অক্ষরগত সুনিপুণ ব্যাঞ্জনায় অভিনিবেশের মাধ্যমে চিত্রগত সিদ্ধিতে উপনীত হবার আশ্বাস দোলা দেয়।[৩৬] তিনি তাঁর মেধা ও শ্রম দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফিকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলতে প্রয়াস চালাচ্ছেন। তাঁর নির্মিত 'এক তবে সবখানে' শিরোনামের ছবিতে শিল্পীর আধ্যাত্মিক চৈতন্যের প্রতীকী উপস্থাপন। কাজটি অপূর্ব ও সুষমামণ্ডিত। তিনি ক্যানভাসে এক্রিলিক ইরানিয়ান রীতিতে কাজটি সম্পন্ন করেছেন। 'রহস্যময়-৪' শিরোনামের ছবিটি ভয়ের গঠন নিয়ে নিরীক্ষাধর্মী কাজ। তাঁর 'আলিফ-লাম-মীম' একটি বিস্ময়কর শিল্পকর্ম। জ্যামিতিধর্মী নাসখ রীতিতে লেখা কাজটি যেন তার দীপ্তিময় প্রয়াস।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া তিনি সাতটি ক্যানভাসের একক আবদ্ধতায় 'আল্লাহ', 'মুহাম্মদ' ও 'বাসমালাহ' শীর্ষক ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করেছেন। যার বিষয় ভাবনাটা অভিনব ও নান্দনিকতায় প্রোজ্জ্বল। তিনি জল, তেল, পোস্টার, রং ও এচিং এ ক্যালিগ্রাফি করে থাকেন। তিনি কাঠখোদাই এর মাধ্যমেও কাজ করেছেন। ২০০২ সালে তাঁর একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তাঁর একটি কাঠখোদাই শিল্প প্রদর্শিত হয়। তাঁর ট্রাডিশনাল শিল্পকর্মের মধ্যে প্রাচীন যুগের নাসখ, সুলুস, নাসতা'লিক, তা'লিক, শিকাসতা লিপির প্রভাব দেখা যায়। জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সহ অনেকে তাঁর শিল্পকর্মের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। ১৯৯৯ সালে সপ্তম 'ইন্টারন্যাশনাল কুরআন ফেয়ার' এ প্রদর্শিত তাঁর ক্যালিগ্রাফির কালার কম্পোজিশন সম্পর্কে ইরানের প্রেসিডেন্ট ভুঁয়সী প্রশংসা করেন। বিদ্যুৎ বিহারী বলেন- '১৯৯৫ সাল থেকে ক্যালিগ্রাফির জগতে আরিফুর রহমান নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করেন।' আরবী-ফার্সী ক্যালিগ্রাফির নানা বইপত্র ও দেশ-বিদেশের ক্যালিগ্রাফির সাথে নিবিড় হতে শুরু করেন। ফলে সিঁড়ি ভেঙ্গে আরিফুর রহমান আজ বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফিতে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নতুনত্ব নিয়ে আসতে পারলেন সফলভাবে; আর অভিনব ও আধুনিকতার সংযোজনের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করলেন বাংলা ক্যালিগ্রাফিতে।[৩৭] তবে তাঁর ক্যালিগ্রাফিগুলো ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্মিত বলে অভিযোগ রয়েছে। কেননা তাঁর অধিকাংশ ক্যালিগ্রাফি-ই কম্পিউটারের মাধ্যমে নির্মাণ করা। যা প্রিন্টিং মিডিয়ার জন্য সহায়ক হলেও এতে প্রকৃত শিল্পসত্ত্বার বহিঃপ্রকাশ ঘটে না।

শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী

শিল্পী শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী সংক্ষেপে এফ. বারী ১৯৫৪ সালে মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামিক স্টাডিজে মাস্টার্স পাশ করার পর সৌদি আরবেব রিয়াদস্থ আর্ট ইনস্টিটিউট হতে 'ডিপ্লোমা ইন এ্যারাবিক ক্যালিগ্রাফি' ডিগ্রি লাভ করেন। পেশাগতভাবেও তিনি সৌদি আরবের বিমান প্রতিরক্ষা তথ্য কেন্দ্র বিভাগের একজন ক্যালিগ্রাফার হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি ২০০১ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত 'ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', এবং ২০০২, ০৩, ০৪, ০৫ সালে জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

জাদুঘরে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর নির্মিত ক্যালিগ্রাফি শিল্প চ্যানেল আই, ইটিভি, বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় অধিভুক্ত 'ফিল্ম এন্ড পাবলিকেশন্স' বিভাগে সংরক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি সৌদি দূতাবাসের 'সৌদি মিলিটারী এ্যাটাশ' এর প্রধান অনুবাদক। তাছাড়া তিনি ক্যালিগ্রাফি সোসাইটির বাংলাদেশের একজন সদস্য ও প্রশিক্ষক।

বাংলাদেশের মুষ্টেমেয় কয়েকজন ব্যক্তি ট্রাডিশনাল ক্যালিগ্রাফিতে আন্তর্জাতিক ধারাসমূহ উপস্থাপনে সক্ষম শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী-ই তাদের মাঝে শীর্ষতম। তিনি লিপিশৈলী ভিত্তিক ক্যালিগ্রাফি করেন। অক্ষরগত সুনিপুণ ব্যাঞ্জনায় অভিনিবেশের মাধ্যমে তাঁর চিত্রশিল্পের স্বভাব সিদ্ধিতে উপনীত। তার নির্মিত 'রাব্বি যিদনী ইলমা' শীর্ষক ক্যালিগ্রাফি কাগজে এক্রিলিক সুলুস রীতিতে বেশ চমৎকার হয়েছে। 'স্বাগতম' শিরোনামে মিশ্র মাধ্যমে দিওয়ানী রীতিতে ছুরির মাধ্যমে 'আহলান-সাহলান' বেশ সুন্দর এঁকেছেন। 'আলো' শিরোনামের হ্যান্ড মেইড পেপারে এক্রিলিক রংয়ে নাসতা'লিক ধারায় অঙ্কিত কাজটি সত্যিই অসাধারণ। ক্যালিগ্রাফি শিল্পী হিসেবে তিনি বেশ উঁচু আসনে অবস্থান করছেন, তার গুণ ও মেধার মাধ্যমে। তাঁর ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে ড. আব্দুস সাত্তার বলেন- শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী নির্ভেজাল আরবী ক্যালিগ্রাফি করে থাকেন। কখনো রংয়ের মাঝে সাদা স্পেস বা জমিন রেখেই সেই জমিনে স্পষ্টভাবে আরবী হরফগুলো উপস্থাপন করেন। আবার কখনও পুরো জমিনে বিভিন্ন ধরনের হালকা রং ব্যবহার করে তার উপর বর্ণবিন্যাস করেন। প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পী শহীদুল্লাহ তুঘরা রীতিতে আরবী সূরার আয়াতগুলো শিল্পসম্মত ভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর বেশিরভাগ ক্যালিগ্রাফির পটভূমিতে লতা-পাতা ও ফুলের নকশা দেখা যায়।[৩৮] আরবী হরফের যে অলৌকিক রূপব্যঞ্জনা রয়েছে তাঁর অনুভব পাওয়া যায় তার ক্যালিগ্রাফিতে। ট্রাডিশনাল রীতিতে করা তাঁর ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম অসামান্য রূপমাধুর্যে সমৃদ্ধ। ভবিষ্যতে তিনি এ ধারার আরো নবতম সংযোজন করবেন বলে প্রত্যাশা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী বশির মেসবাহ

শিল্পী বশির মেসবাহ ১৯৬৪ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাগত দিক থেকে তিনি কুরআনের হাফেজ এবং ১৯৯২ সালে মাদরাসা-ই-নুরিয়া হতে দাওরায়ে হাদিস পাশ। তিনি ২০০২ ও ২০০৬ সালে জাতীয় জাদুঘরের লবীতে একক এবং ১লা বৈশাখ ১৪০৭ উপলক্ষে আজিজ সুপার মার্কেট প্রাঙ্গণ, ২০০২ সালে জাতীয় জাদুঘরে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম 'যৌথ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' এবং নভেরা ভাস্কর হলে আয়োজিত বাংলা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এ পর্যন্ত দুই শতাধিক ক্যালিগ্রাফি অঙ্কন, তিন শতাধিক বইয়ের প্রচ্ছদকরণ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেন। শুধু তাই নয় তিনি সম্পূর্ণ কুরআন সহ বহু আরবী ও উর্দু গ্রন্থ নিজ হাতে লিখেন। তাঁর নির্মিত ক্যালিগ্রাফি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, সাউথ ইস্ট ব্যাংক, সোশাল ইসলামী ব্যাংক, আজাদ প্রোডাক্টস, এক্সিম ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, রূপালী লাইফ ইন্সুরেন্স সহ বিভিন্ন জায়গায় সংরক্ষিত রয়েছে। বর্তমানে তিনি সালসাবিল এড ফার্ম এর শিল্প নির্দেশক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তিনি এ পর্যন্ত ৩টি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।[৩৯]

নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে বশির মেসবাহ'র ক্যালিগ্রাফি শিল্পের মান অনেক উঁচু স্তরের। তাঁর শিল্পকর্মে পেইন্টিং এর তেমন আধিপত্য পরিলক্ষিত না হলেও লিপিশৈলীতে তিনি অনেক অগ্রসর। তিনি পুরোপুরি লিপিনির্ভর হয়ে ক্যালিগ্রাফির শিল্পের মূল ঐতিহ্যকে লালন করেছেন। ক্যালিগ্রাফি চর্চার সূচনা যেহেতু শৈলী নির্ভর হওয়া বাঞ্চনীয়, তাই তাঁর ক্যালিগ্রাফি শিল্পের ভবিষ্যত আশাব্যঞ্জক। তাঁর অঙ্কিত ক্যালিগ্রাফির নন্দন সৌকর্য যে কোন দর্শককে অতি সহজেই মুগ্ধ করে ফেলতে সক্ষম। তিনি আরবী ক্যালিগ্রাফিতে যেমন পারদর্শী তেমনি বাংলা ক্যালিগ্রাফিতেও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'নিশ্চিত সত্য' শীর্ষক ক্যালিগ্রাফিটিতে সমান্তরাল ও উর্ধ্ব স্বভাবের নান্দনিকতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর 'আল্লাহ' লেখা ক্যালিগ্রাফিতে ক্যানভাসে বর্ণগুলো এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে তা সহজেই পাঠযোগ্য।

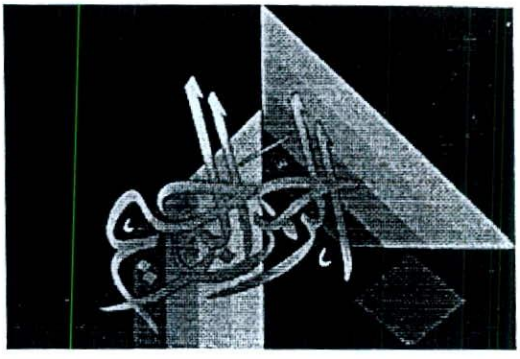

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন

শিল্পী আমিনুল ইসলাম নিভৃতচারী একনিষ্ঠ নিবেদিত এক শিল্পী। তিনি ১৯৬৪ সালে বগুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৭ সালে তিনি বুলবুল ললিতকলা একাডেমী হতে 'ডিপ্লোমা ইন ফাইন আর্টস' এবং ১৯৯২ সালে বগুড়ার মডার্ন ট্রেনিং একাডেমী হতে 'ডিপ্লোমা ইন গ্রাফিক্স' ডিগ্রি লাভ করেন। তাছাড়া ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত চারমাস ব্যাপি 'এচিং এন্ড এনগ্রেভিং' বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ২০০০ সালে বগুড়া শিল্পকলা একাডেমী, ২০০১ সালে বগুড়া জেলা পরিষদে অনুষ্ঠিত 'একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' তে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত 'ইয়ং আর্টিস্ট এক্সিবিশন' ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ সালে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, ২০০২ সালে ইরানে 'ক্যালিগ্রাফি অব দ্যা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার, ২০০২ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত 'পঞ্চদশ ন্যাশনাল এক্সিবিশন' ও জাতীয় জাদুঘরে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত 'পঞ্চম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭ ও ২০০৮ সালে যথাক্রমে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে জাতীয় জাদুঘরে পবিত্র কুরআনের উপর 'বাংলাদেশ ও ইরানের গ্রুপ প্রদর্শনী' ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৮৬ সালে ড্রইং এন্ড পেইন্টিং এ 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমী পদক' এবং ২০০৫ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় হতে পেইন্টিং সমবায় বিষয়ক পদক লাভ করেন। তিনি এ পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করেছেন এবং পাঁচ শতাধিক গ্রন্থ ও জার্নালে প্রচ্ছদ করেছেন। তার শিল্পকর্ম ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, প্রাইম লাইফ ইন্সুরেন্স, গ্যাস্ট্রো লিভার ক্লিনিক, ইবনে সিনা ক্লিনিক, দৈনিক যুগান্তর, পারটেক্স গ্রুপ, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের দূতাবাস, আর. কে. টেক্সটাইল, ধানমন্ডি হাসপাতাল, ঢাকা সেন্ট্রাল হাসপাতাল, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পাকিস্তানের পাঞ্জাব পাবলিক লাইব্রেরি, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য,

Dhaka University Institutional Repository

সৌদি আরব, ওমান, বাহরাইন, দুবাই, কুয়েত এ সংগৃহীত রয়েছে। তিনি ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ ও ইসলামিক আর্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সদস্য এবং আল কুরআন রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা এর উপদেষ্টা। তাছাড়া তিনি 'দৈনিক চাঁদনি বাজার' পত্রিকার স্টাফ আর্টিস্ট, এড ইন্টার ও মৌসুমী এডভারটাইজিং এর সিনিয়র আর্টিস্ট এবং 'শিল্পায়ন' এড ফার্মের শিল্প নির্দেশক।[৪০] নতুন প্রজন্মের নিবেদিতপ্রাণ এ শিল্পী ক্যালিগ্রাফিতে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ক্যালিগ্রাফির প্রতি আর অকৃত্রিম ভালবাসা এমন নিখুঁত, সময় সাপেক্ষ ও প্রচণ্ড ধৈর্যের কাজে অনুপ্রাণিত করেছে। খুব তীক্ষ্ণ শৈল্পিক উপলব্ধির গঠনমূলক উম্মাদনার এমন শক্তিশালী শিল্পকর্ম তৈরী করেছেন যা দেশে-বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

তিনি ক্যালিগ্রাফির আশে-পাশে মানবদেহের অভ্যন্তরীণ উপস্থাপনাকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি সাধারণত সুলুস, দিওয়ানী, নাসতা'লিক ও তুঘরা লিপিতে কাজ করে থাকেন। তাছাড়া এক্রিলিক, তেলরং ও মিশ্রমাধ্যমে কাজ করতে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তাঁর 'রহস্যময়' শিরোনামের শিল্পকর্মটি খুব সুন্দর ও অসাধারণ হয়েছে। যা অত্যন্ত বেগবান ও শিল্পগুণ সমৃদ্ধ। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তাঁর অপূর্ব ট্রাডিশনাল ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। তাঁর শিল্পকর্মে রিয়েলস্টিক ও এ্যাবস্ট্রাক্ট রীতির সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। তিনি আরবী হরফের মাহাত্ম উপলব্ধি করে প্রাচীন কালের ইসলামী ক্যালিগ্রাফারদের মত এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক জগতের সৃষ্টি করেছেন। রং-তুলিতে তিনি খুবই সিদ্ধহস্ত। ক্যানভাসে তাঁর দক্ষতা, জড়তাহীন মোটা ব্রাশের বলিষ্ঠ গতি ও সুক্ষ্ম রেখা যেন একটি ঐশী বলয়। যা এদেশের শিল্প সম্ভারে বিরল। অধ্যাপক রেজাউল করিম বলেন- তাঁর শিল্পকর্ম যেন তাঁর একটি সন্তানের মত যা তিনি লালন করে চলেছেন। গাছের শিকড়, গাছপালা ও লতা-পাতার পটভূমিতে তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কে সুলুস রীতিতে প্রকাশ করেছেন যা ইল্যুশনের সৃষ্টি করেছে। তিনি নাসখী রীতিতে যে চমৎকার ক্যালিগ্রাফি করেছেন তা খুবই আকর্ষণীয়। তবে কখনও

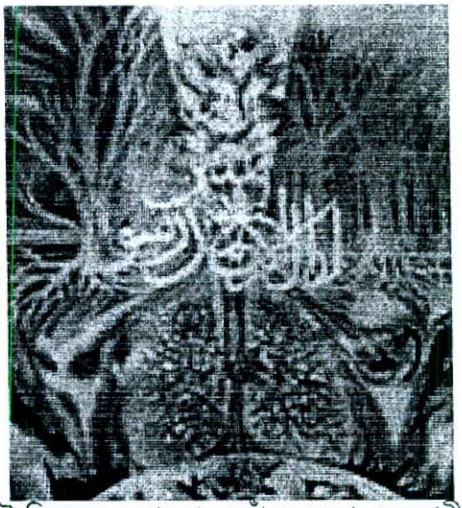

Dhaka University Institutional Repository

কখনও তার ক্যালিগ্রাফি বাস্তবধর্মী না হয়ে এ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে যায়। পঞ্চম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তার সাতটি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে। প্রত্যেকটি কাজ তিনি ক্যালিগ্রাফির অর্থের দিকটি ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন যা রিয়েলস্টিক কাজ হলেও বিমূর্ত ঢঙে উপস্থাপন করার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর মাঝে শিল্পের যে বিশাল সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায় তা অদূর ভবিষ্যতে এদেশের ক্যালিগ্রাফির জগতকে আরো সমৃদ্ধ করবে বলে আশা করা যায়।[৪১]

শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ

শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ ১৯৬৮ সালে যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৪ সালে এইচ.এস.সি পাশ করেন। তিনি ১৯৮৪-৯১ সাল পর্যন্ত বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস.এম সুলতানের সাহচর্যে অবস্থান এবং তাঁর নেতৃত্বে ১৯৮৯ সালে যশোরের 'চারুপীঠ' এ পেইন্টিং এর উপর একটি ওয়ার্কশপে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৮ সালে যশোর পাবলিক লাইব্রেরিতে একক এবং ১৯৯২ সালে যশোর শিল্পকলা একাডেমীতে, ১৯৯৫ সালে যশোর পাবলিক লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী এবং ১৯৯৮ সালে এস.এম সুলতান ও মোস্তফা আজিজ সহ বরেণ্য শিল্পীদের সাথে যোগদান করেন। তিনি ২০০০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত সবগুলো ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, ২০০১ সালে বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স চট্টগ্রাম এবং ২০০৪ সালে 'এ.টি.এন বাংলা জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে হোটেল শেরাটনে আয়োজিত 'ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' তে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর নির্মিত শিল্পকর্ম বার্ডস বাংলাদেশ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, প্রাইম, ইবনে সিনা, ডি ল্যাব, ইন্সুরেন্স, জাতীয় জাদুঘর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সংরক্ষিত আছে। তিনি বর্তমানে আইডিয়া কমিউনিকেশন্স এর থিম মেকার এবং ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ এর সদস্য।[৪২]

মাহবুব মুর্শিদ আনুভূমিক রেখা অঙ্কনে ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করেছেন। লিখন শিল্পের সৌন্দর্য ও সম্ভাবনা তাঁর শিল্পকর্মে দারুণভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি তেল-রং ও পানি-রংয়ের মাধ্যমে কাজ করে থাকেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

তা বিমূর্ত ঢঙে করতে প্রয়াস চালান। তার ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং উজ্জ্বল রং ব্যবহারে উদ্ভাসিত। তিনি ট্রাডিশনাল স্টাইলে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করে থাকেন। রংয়ের মাধ্যমে করা তাঁর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিল্পকর্মটি খুবই আকর্ষণীয় হয়েছে। তাঁর মাঝে লুকায়িত শিল্পসম্ভাবনা আমাদেরকে আশান্বিত করে।

শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম

শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম ১৯৭৪ সালে খুলনা জেলার টুটপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৪ সালে তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা হতে হাদীস বিভাগে কামিল এবং পরবর্তীতে ডিগ্রি পাশ করেন। শিল্পকলা বিষয়ে পড়াশোনার জন্য তিনি ১৯৮২-৯০ সাল পর্যন্ত খুলনা শিশু একাডেমী ১৯৮৫ সালে 'আর্ট ও পেইন্টিং' এর উপর ছয়মাস ব্যাপি ওয়ার্কশপ এবং ২০০৩ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত '১৬তম হিস্টোরি এন্ড আর্ট এপ্রিসিয়েশন' কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে খুলনা শিশু একাডেমীর 'আর্ট প্রদর্শনী' ঢাকা

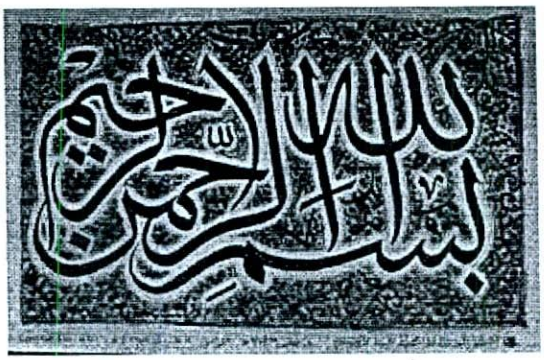

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ২০০১-২০০৫ সাল পর্যন্ত সকল প্রদর্শনী এবং ২০০৫ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত 'ন্যাশনাল আর্ট এক্সিবিশন' এ অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া ২০০২ সালে ইরানের রাজধানী তেহরানে 'ক্যালিগ্রাফি অব দ্যা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি তাঁর চমৎকার শিল্পকর্মের জন্য ১৯৮৬ সালে 'খুলনা শিশু একাডেমী পুরস্কার' পান। তাঁর নির্মিত ক্যালিগ্রাফি শিল্প সৌদি আরব, ভারত ও বাংলাদেশ এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সংরক্ষিত আছে। তিনি 'ইসলামী ক্যালিগ্রাফি' নামে ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক একটি গ্রন্থ প্রকাশ এবং ক্যালিগ্রাফির উপর প্রকাশিত প্রথম ম্যাগাজিন 'ক্যালিগ্রাফ আর্ট' ম্যাগাজিনের সম্পাদনা করেন। তাছাড়া বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় এ বিষয়ে তার প্রায় একশত লেখা প্রকাশিত হয়। যাতে তিনি ক্যালিগ্রাফির ইতিহাস, শৈলী ও নন্দনতত্ত্ব প্রভৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্তমানে তিনি 'দৈনিক সংগ্রাম' পত্রিকার সাব এডিটর, ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী ও প্রশিক্ষক এবং বায়তুল মোকাররম মসজিদ মার্কেটের মার্বেল হাউজের ডিজাইনার ও ক্যালিগ্রাফার। তিনি ক্যালিগ্রাফির ব্যাপক প্রসারের

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যে একজন সংগঠন কর্মী ও ক্যালিগ্রাফি শিল্পীর ন্যায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাই তাকে একজন নিবেদিতপ্রাণ শিল্পকর্মী হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়।[৪৩]

নতুন প্রজন্মের প্রতিশ্রুতিশীল এ শিল্পী প্রথাগত ভাবে ট্রাডিশনাল ক্যালিগ্রাফি করে থাকেন। তিনি তেল ও জলরং ছাড়াও সিরামিক, টালি, মোজাইক এবং কাঠে ক্যালিগ্রাফির কাজ করতে পছন্দবোধ করেন। তিনি কুফী, সুলুস, নাসখ, নাসতা'লিক, তুঘরা ও রিকা প্রভৃতি লিপিশৈলীতে সিদ্ধহস্ত। এসব শৈলীতে তিনি ধর্মীয় ইমারতে বিশেষত মসজিদের গাত্রে ক্যালিগ্রাফির অলঙ্করণ করে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি চট্টগ্রামের সমুদ্র বন্দরের ৫ নং জেটি গেটের কাছে প্রাচীন একটি মসজিদের সংস্কারের পর ক্যালিগ্রাফি দিয়ে অলঙ্কৃত করেন। মসজিদের দরজার উভয় পার্শ্বে বৃত্তাকার চারটি ক্যালিগ্রাফি করেছেন। যার প্রত্যেকটির মাঝে দশবার 'মুহাম্মদ' ও মাঝখানে দু'বার 'আল্লাহ' শব্দটি কুফী লিপির নান্দনিক ধারায় খোদাই করে লেখা হয়েছে। মিহরাব সহ পশ্চিমের দেয়ালে সাদা মার্বেল পাথরে জ্যামিতিক ফুল-লতা-পাতার নকশা সহকারে কুফী ও সুলুস রীতিতে সবুজ রংয়ের মেটালিক ক্যালিগ্রাফি করেছেন। মিহরাবের উপরাংশে চতুর্ভূজাকৃতি ক্যালিগ্রাফির মাঝে সুলুস লিপীতে 'আল্লা জাল্লা জালালুহু' ও চারপাশের বাহুতে যথাক্রমে 'আল মুলকু লিল্লাহ' ও 'আল্লাহ' কুফী রীতিতে চারবার অঙ্কিত হয়েছে। মিহরাবের দু'পাশে উপরে সবুজ টাইলস কেটে 'কাবা শরীফ' ও 'মসজিদে নববী'র গম্বুজের আদলে তুঘরা লিপিতে কুরআন-হাদীসের বাণী চারপাশের দেয়ালে কালো মার্বেল পাথরে সোনালী রংয়ের মেটালিক হরফে সুলুস লিপির 'আর রহমান' এবং দক্ষিণ পাশের দেয়ালে সাদা মার্বেল পাথরে কালো কালিতে 'ইয়া আইয়ু হাল্লাযিনা আমানু ইযা নুদিয়া লিস সালাতি....', 'আল্লাহু আকবার' ও ' ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশায়ি ওয়াল মুনকার' অর্থসহ সুলুস লিপিতে লেখা হয়েছে। গম্বুজের অভ্যন্তরে তুঘরা লিপিতে আল্লাহর গুণবাচক আটটি নাম এবং নীচের দিকে কাঠের আটটি প্যানেলে নাসখী ধারায় চারটি বাংলাতে ও চারটি আরবীতে ক্যালিগ্রাফি করা হয়।

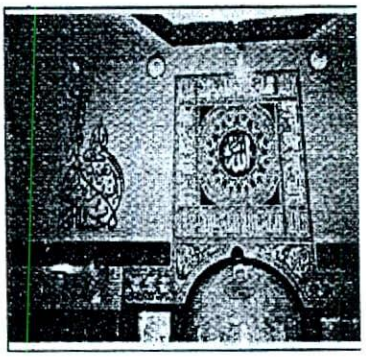

তাছাড়া ঢাকার বারিধারা ও ডিওএইচএস মসজিদে তিনি ক্যালিগ্রাফি করেছেন। এখানে তিনি চারটি পিলারে আল্লাহর ৪৪টি গুণবাচক নাম বেঙ্গল তুঘরায় এবং দরজার উপরে নাসখ লিপিতে মসজিদে প্রবেশ

Dhaka University Institutional Repository

এবং বের হওয়ার দোয়া খোদাই করে লিখেছেন। তাছাড়া মৃৎপাত্র অলঙ্করণ শিল্পী আব্দুর রহীমের আরেকটি সংযোজন। মধ্যযুগে মুঘল সুলতান আমলের পর সিরামিক পটারিতে ক্যালিগ্রাফি অঙ্কন বাংলাদেশে এটিই প্রথম প্রয়াস। তিনি তার 'ইসলামী ক্যালিগ্রাফি' বইয়ে উল্লেখ করেছেন- "ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই মুসলমান শিল্পীরা পানির পাত্রকে অলঙ্করণ করে ফুল, লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশা দ্বারা এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হত। তাই তিনি সেই ধারাকে তুলে এনে এদেশীয় অলঙ্করণ ফুল-লতা-পাতার মোটিভ ব্যবহার করে 'গ্লেজ ফায়ারিং' এর মাধ্যমে সিরামিক পটারিতে ক্যালিগ্রাফি করেছেন। এখানে তাঁর রংয়ের ব্যবহার আকর্ষণীয় ও রুচিসম্মত। বিশেষত কোমল রংয়ের ব্যবহার তার পটারিকে বিশেষায়িত করেছে। জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত 'পঞ্চম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' তে বেশ কিছু পটারি প্রদর্শিত হয়েছিল যা দর্শকদেরকে ব্যাপকভাবে মুগ্ধ করেছিল। তাছাড়া 'পবিত্র নাম' শিরোনামের মিশ্রমাধ্যমে কয়েকটি শিল্পকর্ম অত্যন্ত সুষমামণ্ডিত ও শিল্পগুণে উঁচু মানের।[৪৪]

শিল্পী নাসির উদ্দিন আহমেদ খান

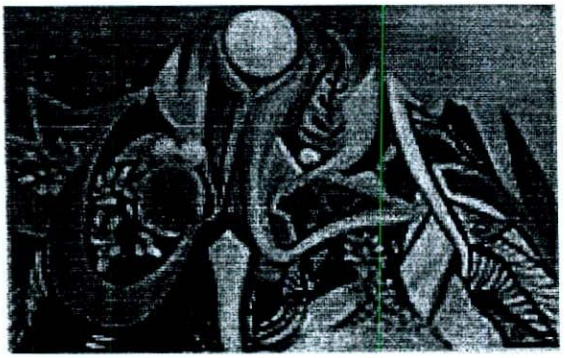

শিল্পী নাসির উদ্দিন আহমেদ খান ১৯৭১ সালে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৯ সালে চট্টগ্রাম আর্ট কলেজ হতে চারুকলার উপর 'প্রি-ডিগ্রি' ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট হতে সিরামিক্স-এ বিএফএ এবং ১৯৯৭ সালে এমএফএ পাশ করেন। এছাড়া ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত 'একবিংশ শতাব্দীর জাদুঘর' বিষয়ক এক ওয়ার্কশপ এং ২০০৬ সালে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আয়োজনে বাংলাদেশের ঐতিহ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনী বিষয়ক মাসব্যাপি ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৮ সালে চট্টগ্রামের 'নন্দনকানন মুসলিম হলে' বন্যাদূর্গতদের সাহায্যার্থে আয়োজিত 'গ্রুপ আর্ট এক্সিবিশন', ১৯৮৯ সালে চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত ছাত্রদের 'গ্রুপ আর্ট এক্সিবিশন', ১৯৯২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট এ 'টাইম টু টাইম আর্ট এক্সিবিশন', ২০০১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'এশিয়ান আর্ট বাইনেল বাংলাদেশ' এবং ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে ২০০৩, ০৪, ০৫ সালে অনুষ্ঠিত 'ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' তে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট এ ১৯৯২ সালে টেরাকোটার উপর 'এনুয়েল আর্ট এক্সিবিশন' এ 'অমিত বশক স্মৃতি পদক' লাভ করেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম জিয়া স্মৃতি জাদুঘর এর সহকারী ডিসপ্লে অফিসার এবং ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ এর সদস্য।[৪৫]

তিনি সিরামিক্সে পড়াশুনা করেন ও বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করে থাকেন। জাতীয় জাদুঘরে ২০০২, ০৩, ০৪ ও ০৫ সালে অনুষ্ঠিত 'পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, ও অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' তে তার তৈল রংয়ে করা ক্যালিগ্রাফি ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এর পটভূমিতে তিনি আরবী হরফগুলোকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করেন। তিনি উজ্জ্বল বর্ণেও আধিপত্যে এবং বিচিত্র বর্ণিলতার মাঝে ক্যালিগ্রাফির চমৎকার গীতিময়তা সৃষ্টি করেন। তাঁর নির্মিত 'ত্বা-হা', 'আলিফ-লাম-মীম, ও 'খালাক' ক্যালিগ্রাফিগুলো অসীম সম্ভাবনার দুয়ার উম্মোচন করেছে। তাছাড়া ১৫/৮ মাপের সিরামিকে 'মুদহাম্মাতান' (সবুজ গালিচাযুক্ত বেহেশত) শীর্ষক চার রংয়ের তৈলচিত্র সত্যিই অসাধারণ যা বর্তমানে চট্টগ্রামের শিল্পপতি ও শিল্পরসিক শাহ আলম এর বাড়িতে সংস্থাপিত হয়েছে। স্বচ্ছ গ্লেজে ২০০ খণ্ডে সমাপ্ত কাজটি। এত বড় মুর‍্যাল চিত্র এর আগে আর কখনও হয়নি। এতে কম্পোজিশন, অলঙ্করণ ও রং এমনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে যে, সুরিয়েলিজম ধারায় তা'লিক রীতিতে এ আরবী লিপিশৈলীটি স্থাপত্য অলঙ্করণের স্বার্থক প্রয়োগ হয়েছে।[৪৬]

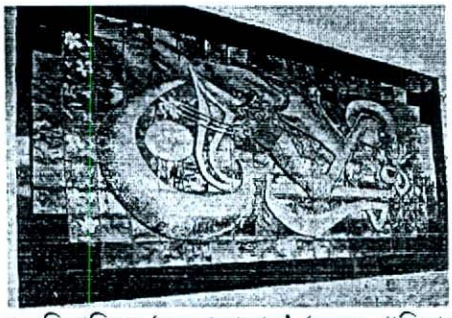

শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ

১৯৫৭ সালে ফেনী জেলার মহুপুরে জন্মগ্রহণকারী শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ বাংলাদেশের একজন ব্যতিক্রমধর্মী ক্যালিগ্রাফি শিল্পী। তিনি ঢাকার সরকারি তিতুমীর কলেজ হতে বিএ পাশ করেন। তিনি শিল্পকলা বিষয়ে একাডেমিক শিক্ষা গ্রহণ না করেও বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে নিজের অবস্থানকে মজবুত করতে সক্ষম হন। তিনি ২০০৩ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে 'একক প্রদর্শনী' এর আয়োজন করেন। ২০০০ সালে ইরান কালচারাল সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে আল কুরআন রিসার্চ

Dhaka University Institutional Repository

একাডেমী এবং ২০০২, ০৩, ০৫ ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে 'পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, ও অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', ২০০৫ সালে আমার দেশ ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত এবং বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমী কর্তৃক ১৪১০ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' তে অংশগ্রহণ করেন। তার নির্মিত শিল্পকর্ম বঙ্গভবন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, এপেক্স গ্রুপ ও ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এ সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে তিনি ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এ কর্মরত এবং ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশের সদস্যা।

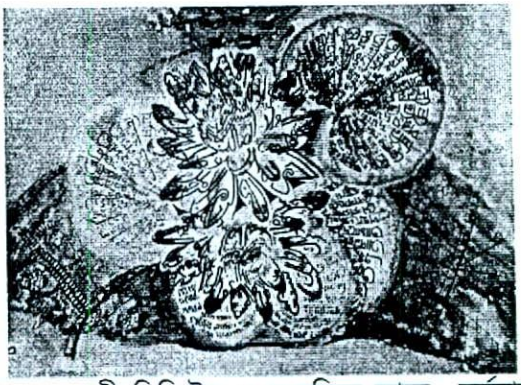

শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে শিল্পরসিক ও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি নিজ হাতে পবিত্র কুরআন শরীফের দু'কপি অনুলিপি তৈরী করেছেন যা ২০০১ সালে জাতীয় জাদুঘরে প্রধান গ্যালারীতে প্রথমবারের মত বেসরকারি উদ্যোগে প্রদর্শিত হয়। তিনি পবিত্র কুরআন শরীফের আয়াত সহযোগে যে পবিত্র চিত্রাবলীর সৃষ্টি করেন, তাতে ব্যবহার করেন পবিত্র একটি বৃক্ষের পাতার রস, যে বৃক্ষের পাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং চিরসবুজ এ বৃক্ষকে 'হেনা' ফুলের গাছ বলে অভিধানে উল্লেখ করা হয়। তিনি তাঁর চিত্রে এ মেহেদী পাতার নিঃসারিত রস সুকৌশলে ব্যবহার করেন। বাংলাদেশের নারী শিল্পীদের মধ্যে সম্ভবত তিনি-ই সর্বপ্রথম যিনি মেহেদী পাতার রসে সযত্নে দৃষ্টিনন্দন ক্যালিগ্রাফি অঙ্কন করেন। তার সিংহভাগ শিল্পকর্মের চারদিকে নয়নাভিরাম, ক্ষুদে লতা-পাতা সুক্ষ নকশায় অলঙ্কৃত দেখা যায়।[৪৭] তাই কুফী, নাসখ, নাসতা'লিক, তা'লিক ও ঘুবার রীতি ব্যবহার করে 'আল্লাহ', 'মুহাম্মদ', 'সুরা ফাতিহা', 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম', ছাড়াও নকশী কাঁথার পটভূমিতে ক্যালিগ্রাফি করে সুনাম অর্জন করেন। যাতে মেহেদী পাতার একক দ্বীপ্ততায় তাঁর চিত্র গভীর ব্যাঞ্জনা বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

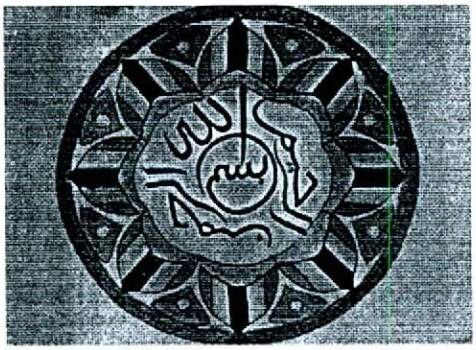

নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে নবআঙ্গিকে নির্মিত তার কয়েকটি দৃষ্টিনন্দন শিল্পকর্ম স্থান পায়। তার মধ্যে আরবী-বাংলা স্ক্রীপ্টের সমন্বয়ে নির্মিত ক্যালিগ্রাফিটি ছিল অতুলনীয়। চিত্রটির মধ্যেভাগে তিনি প্রস্ফুটিত দু'টি শাপলার আদলে আরবী হস্তাক্ষরে পুষ্প-পাঁপড়ির ভাঁজে ভাঁজে সূরা ফাতিহা ফুটিয়ে তুলেন। আর তার চারপাশে সূরার অনুবাদকে গোলাকার পাতায় শৈল্পিক ভাবে অঙ্কন করেন। যা ছিল বেশ পরিপক্ক ও শিল্পের স্বভাবে উত্তীর্ণ। তার শিল্পচর্চার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- দেশীয় অলঙ্করণ। তিনি জামদানি ও জ্যামিতিক নকশায় ক্যালিগ্রাফিকে সজ্জিত করেছেন। এটি আরেকটি নতুন ও ব্যতিক্রমধর্মী সংযোজন যা ক্যালিগ্রাফি শিল্পকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

শিল্পী আমিরুল হক

শিল্পী আমিরুল হক (এমরুল কায়েস) ১৯৭৮ চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট হতে বিএফএ ও এমএফএ পাশ করেন। বাল্যকাল হতেই তিনি আর্টের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি ২০০০ সালে চট্টগ্রাম এলিয়েন্স ফ্রাঁসেস অডিটোরিয়াম এ 'একক আর্ট প্রদর্শনী' র আয়োজন করেন। তিনি ১৯৯৯ সালে ঢাকা, ২০০০ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ২০০২ সালে চট্টগ্রামে 'আর্ট এক্সিবিশন' ২০০১ সালে চট্টগ্রামে 'পোস্টার প্রদর্শনী', ২০০০, ২০০১, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫ সালে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে 'ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' এবং ২০০১ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত 'ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' তে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ২০০১ সালে আর্টের জন্য 'জিয়া গোল্ড মেডেল' লাভ করেন। তিনি 'শরীফা চারু ও কারুকলা' নামক ছয়টি বইয়ের একটি সিরিজ, ছবির সাহায্যে শিশুদের সাধারণ জ্ঞান শিক্ষার বই রচনা করেন। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

ইতোপূর্বে ছয়টি আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা করেন পরে তিনি আর্টের ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য শরীফা আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে যার ১২টি শাখা রয়েছে। তিনি এ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক।[৪৮] তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে যথেষ্ট দক্ষতার ছাপ রয়েছে। বর্ণাঢ্য ক্যানভাসে রং এর আধিপত্য তার ক্যালিগ্রাফিতে লক্ষ করা যায়। তবে তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে কিছুটা বাণিজ্যনির্ভর ধারা প্রকাশিত হয়। তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে এ পর্যন্ত অনেকগুলো ক্যালিগ্রাফি শিল্প নির্মাণ করেছেন।

শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার

শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার ১৯৭৮ সালে চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তিতে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি বিভাগ হতে তিনি মাস্টার্স পাশ করেন। তিনি ২০০২ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত 'ক্যালিগ্রাফি অব দ্যা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক সম্মেলনে, ২০০৪ সালে জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত 'কুরআন মেলা'য় অংশগ্রহণ করেন। ২০০৩ সালে ঢাকায় ক্যালিগ্রাফি একাডেমী কর্তৃক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', ঢাকা আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে, সালে অনুষ্ঠিত যথাক্রমে-

ভাস্কর নভেরা হলে, বাংলাদেশ ২০০৫ সালে আমার দেশ ও কর্তৃক আয়োজিত 'বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক ২০০১, ০২, ০৩, ০৪ ও ০৫ 'পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, ও নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' এবং ২০০৫ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত 'ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' তে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর নির্মিত শিল্পকর্ম ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, তাকাফুল ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, রহিম আফরোজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে সংরক্ষিত আছে। তিনি 'ডিজাইন রুট' এর সাবেক আর্ট ডিরেক্টর ও 'ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি পত্রিকা'র সাবেক সম্পাদক। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমী এর সদস্য সচিব, 'ডিজাইন বাজার' এর শিল্প নির্দেশক এবং 'দৈনিক নয়া দিগন্ত' পত্রিকার স্টাফ আর্টিস্ট। তিনি এ পর্যন্ত কয়েকশত বই, ম্যাগাজিন, সিডি, ভিসি, ও ক্যাসেটের প্রচ্ছদ করেছেন।

শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার মূলতঃ একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার। তিনি ক্যালিগ্রাফিক ইলাসট্রেশন করে থাকেন। জল ও তেল রংয়ে তিনি চমৎকার ক্যালিগ্রাফি করেছেন। কুফী, নাসখ, সুলুস, তুঘরা রীতিতে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরবী ও বাংলা হরফের শিল্পসম্মত বিন্যাস করেন এবং গাঢ় রংয়ের কনট্রাস্ট সৃষ্টি করেন। ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক তার কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও প্রচণ্ড আগ্রহ আর শিল্পের প্রতি তাঁর সীমাহীন ভালবাসা তাকে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। গাঢ় কালো রংয়ে অপূর্ব নকশায় অঙ্কিত 'আল্লাহ' ক্যালিগ্রাফিটি দর্শককে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করেছে। এতে তিনি প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করায় দ্বি-মাত্রিক শিল্পকর্ম, ত্রি-মাত্রিক বৈশিষ্ট্যে রূপ লাভ করেছে। শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার খুব সিম্পল, ইন্টারেস্টিং ও ক্লিন কর্ম আমাদের ক্যালিগ্রাফি শিল্প উপহার দিয়ে চলেছেন। সরল উন্মুক্ততাকে তিনি ভেবে নেন এবং ক্যানভাসে প্রয়োগ করেন বর্ণের সাবলীলতা। তাই লোকজ চেতনায় সমৃদ্ধমান হয়ে চলেছে তার ক্যানভাসের প্রতিটি পরিসর এবং উজ্জ্বল ও শৃঙ্খলে আবদ্ধ মনে হয় তাঁর চিত্রলিপিকে। তার লিখন রীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- সাবলীল রেখার পারস্পরিক বন্ধন, যা বিচিত্র বিমুগ্ধতায় একটি আরেকটির সাথে মিশে আছে। 'কোলাজ' মাধ্যমে করা তাঁর ক্যালিগ্রাফির ডেকোরেটিভ চিন্তা অসাধারণ। তবে রংয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি তাকে প্রলুব্ধ করেছে বলে মনে হয়।[৪৯]

শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ

শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ ১৯৮৩ সালে ঢাকার লালবাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৫ সালে পবিত্র কুরআন শরীফ হিফজ করেন। একাডেমিক শিক্ষা তেমন বেশি না হলেও শিল্পচর্চার জন্য ২০০৩ সালে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র আয়োজিত 'আর্ট এপ্রিসিয়েশন কোর্স' এবং ২০০৪ সালে 'ইরান-বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি' কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এবং শিল্পী 'পিটার পল রুবেন্স, উইজেন দেলাক্রয় ও মকবুল ফিদা হোসেন' এর শিল্প ও জীবন শীর্ষক বিশেষ গবেষণা করেন। তিনি ২০০২, ০৩, ০৪ ও ০৫ সালে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত 'পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' এবং ২০০৩ ও ২০০৫ সালে জাতীয় জাদুঘরের ভাস্কর নভেরা হলে অনুষ্ঠিত 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' এবং ২০০৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট এ বন্যার্তদের সাহায্যার্থে 'চিত্র প্রদর্শনী' ও লালবাগ আর্ট গ্রুপের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' তে অংশগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তাঁর নির্মিত শিল্পকর্ম মরক্কো, ইন্দোনেশিয়া, তিউনিশিয়া, ওমান ও পাকিস্তানে সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি অনেক বইয়ে ছবি ও প্রচ্ছদ এঁকেছেন এবং শিল্প সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি 'ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি' ও 'জয়নুল' পত্রিকার সম্পাদক, শিল্পকলা সংসদ বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমী এর নির্বাহী সদস্য।

আরবী হরফের প্রতি তাঁর শিল্পানুরাগ ও আবেগ দর্শককে আন্দোলিত করে। তরুণ বয়সেই তাঁর ক্যালিগ্রাফি সবাইকে অবাক করে দেয়। তাঁর মাঝে এক অসীম সম্ভাবনার বটবৃক্ষ দেখা যায়। রং এর প্রতি তাঁর দুর্বলতা এবং প্রখর দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর একনিষ্ঠতা, ধৈর্য, সৃজনশীলতা ও ক্যালিগ্রাফির শৈল্পিক নৈপূণ্য তাঁর শিল্পকর্মে প্রতিফলিত। তাঁর একটি ক্যালিগ্রাফিতে নুন, আলিফ, বা হরফ ব্যবহার করে রংয়ে এর মোহজাল সৃষ্টি করেছেন এবং আরবী শব্দের সাহায্যে সৃষ্টির পাশাপাশি উপযুক্ত রংয়ের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তার সম্পর্কে ড. আব্দুস সাত্তার বলেন- শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ তার ক্যানভাসের উপর এবস্ট্রাক্ট ফর্মে গাঢ় নীল রংয়ের ফ্রি ব্রাশ স্ট্রোক ব্যবহার করে তার উপর উজ্জ্বল হলুদাভ রংয়ে মোটা অক্ষর বিন্যাস করেছেন। আরবীর মোটা বলিষ্ট অক্ষরগুলোর নীচে ক্ষুদ্রাকৃতির অক্ষর বিন্যাসের মাধ্যমে বৈচিত্র আনয়নের চেষ্টা করেছেন।"[৫০] ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত 'নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' তে প্রদর্শিত 'প্রথম দিনের সূর্য' শীর্ষক শিল্পকর্মটি বড় আকৃতির ক্যানভাসে বিশদ বর্ণিলতায় ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর। যাতে বর্ণগত সংলগ্নতা এবং ফর্মের প্রাসঙ্গিক রূপান্তর বিশেষ প্রতিস্পন্দন সৃষ্টি করেছে। তাঁর 'আলো' শিরোনামের এক্রিলিকের মাধ্যমে করা কাজটি অনেক সুন্দর হয়েছে। চিত্রপটের মধ্যস্থানের মিশ্রিত সাদা ও হলুদের প্রয়োগ প্রতিভাদীপ্ত, সৃজনশীল ও হাস্যোজ্জ্বল।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী

শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী ১৯৭৯ সালে বাগেরহাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা আলিয়া থেকে কামিল, ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউট হতে 'ডিপ্লোমা ইন ফাইন আর্টস', নিউরন কম্পিউটার হতে 'ডিপ্লোমা-ইন কম্পিউটার গ্রাফিক্স' ডিগ্রি লাভ করেন এবং 'শান্ত মারিয়ম ফাউন্ডেশন' আয়োজিত 'গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া' শীর্ষক মাসব্যাপি ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৯ সালে 'ইরানিয়ান কালচারাল সেন্টার' আয়োজিত 'কুরআন সপ্তাহ', ২০০১ সালে বায়তুশ শরফ চট্টগ্রাম আয়োজিত চট্টগ্রাম গ্রুপ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', ২০০২, ০৩ ও ০৪ সালে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত 'পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, ২০০৩ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী' আয়োজিত 'পঞ্চদশ জাতীয় প্রদর্শনী', ২০০৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট এর জয়নুল গ্যালারীতে 'শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান' স্মরণে 'আর্ট প্রদর্শনী' ও বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমী আয়োজিত 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', ২০০১ সালে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত 'ধুমপান বিরোধী সেমিনার' এবং ইরানে অনুষ্ঠিত 'ক্যালিগ্রাফি অব দ্যা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফি 'ইরানিয়ান কালচারাল সেন্টার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ড্রাগ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ায় সংগৃহীত রয়েছে। গাজীপুরে অবস্থিত রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি কুয়েত, ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান, অষ্টম ও নবম ঢাকা বইমেলার প্যাভিলিয়নে তিনি ম্যুরাল ডিজাইন করেন। তিনি 'চৌকস গ্রাফিক্স সিস্টেম লিমিটেড' এর প্রধান ডিজাইনার এবং ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমী এর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি বিদেশে অবস্থান করে তাঁর শিল্পকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।[৫১]

নতুন প্রজন্মের ক্যালিগ্রাফারদের মধ্যে রফিকুল্লাহ গাজালী একজন প্রতিশ্রুতিশীল ক্যালিগ্রাফার। তিনি সুলুস, তুঘরা, নাসতা'লিক ও শিকাসতা রীতিতে সিদ্ধহস্ত। তাঁর শিল্পকর্মে সৃজনশীলতা, স্বকীয়তা ও শৈল্পিক নৈপুণ্যে লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে ড. আব্দুস সাত্তার বলেন- শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালীর ক্যানভাসের চতুর্দিকে গাছপাতার সমাহার করিয়ে তার মাঝের অংশ সাদা রংয়ে আরবী অক্ষর ব্যবহার করেছেন। এ অক্ষর বিন্যাসের পিছনের অংশ অর্থাৎ জমিনের হালকা লালচে ও নীলচে রং ব্যবহার করে

Dhaka University Institutional Repository

পুরো ছবিটা আকর্ষণীয় করেছেন।

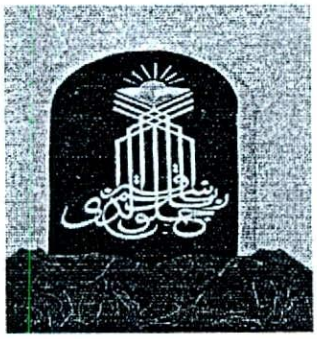

রফিকুল্লাহ গাজালী 'শিকাসতা' রীতিতে অক্ষর ও শব্দগুলোকে ভেঙ্গে নতুন ফর্ম সৃষ্টি করে এক ঐন্দ্রজালিক কম্পোজিশন সৃষ্টি করেছেন। তিনি মিরর স্টাইলে অর্থাৎ বিপরীত রীতির মাধ্যমে ডান ও বাম দিক থেকে অক্ষরগুলো সাজিয়েছেন। তাঁর ছবিতে নিবিড় ধ্যানের বুনট রয়েছে এবং সমান্তরাল হতে উর্ধ্বে উঠা লিপি চিত্রণের ছন্দোবদ্ধ গতি রয়েছে। তাঁর কাজ দেখে মনে হয়, তিনি নিরীক্ষাধর্মী কাজ পছন্দ করেন।

শিল্পী মাসুম বিল্লাহ

শিল্পী মাসুম বিল্লাহ ১৯৮৪ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাগত দিক থেকে তিনি বি কম পাশ করেন। শিল্পকলা বিষয়ক তেমন কোন একাডেমিক শিক্ষা গ্রহণ না করলেও তিনি স্বীয় প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে বেশ চমৎকার চমৎকার ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করেছেন। তিনি ২০০২, ০৩, ০৪ ও ০৫ সালে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত 'পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী এবং ২০০৫ সালে 'শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ও আমার দেশ, কর্তৃক আয়োজিত 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' তে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর প্রায় শতাধিক ক্যালিগ্রাফি ইতোমধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ এর সদস্য এবং 'অসীম এন্টারপ্রাইজ' এর শিল্প নির্দেশক।

নব প্রজন্মের এ ক্যালিগ্রাফার ট্রাডিশনাল ধারায় কুফী, নাসখ ও তা'লিক রীতিতে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে আরবী হরফের রংয়ের মাধ্যমে বিন্যাস খুবই রুচিসম্মত ও কম্পোজিশনগুলো প্রশংসনীয়। তিনি আরবী হরফের আধিপত্যে ক্যালিগ্রাফি করেছেন। শৈলীগত রূপ-ধর্মের ব্যাঞ্জনা তাঁকে স্বাধীন স্ব-প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর কম্পিউটার কম্পোজিশন ও ডিজাইন খুবই সুন্দর।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী আবুদ দারদা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ

শিল্পী আবুদ দারদা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ ১৯৮২ সালে লক্ষীপুর জেলার রায়পুরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পবিত্র কুরআন হিফজ করেন এবং দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। শিল্পকলা বিষয়ে তার কোন শিক্ষা না থাকলেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি ক্যালিগ্রাফি শিখেন এবং চর্চা করেন। তিনি ২০০২, ০৩, ০৪ ও ০৫ সালে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত 'পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত ১৬ তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী ২০০৫ সালে আমার দেশ ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক আয়োজিত বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী এবং ২০০২ সালে ইরানের রাজধানী তেহরানে অনুষ্ঠিত 'ক্যালিগ্রাফি অব দ্যা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, আল জয়নাল প্লাজা সহ বিভিন্ন প্রোডাক্ট হাউসে সংগৃহীত রয়েছে। বর্তমানে তিনি ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ এর সদস্য।

শিল্পী আবুদ দারদা বিভিন্ন শৈলীলিপিতে বেশ স্বচ্ছন্দ্য। তাঁর চিত্রগুলো বেশ সযত্নে নির্মিত এবং লিপি বর্ণিলতা উভয়দিক থেকেই প্রশংসার দাবিদার। তিনি প্রগাঢ় দীপ্ত ও লঘু দীপ্ত নির্মাণে কাজ করেছেন। শৈলীগত কঠিন আবধ্যতার মাঝেও তাঁর নান্দনিকতা অনেক অগ্রসর বলা চলে।[৫৩]

শিল্পী আতা ইমরান

শিল্পী আতা ইমরান ১৯৮১ সালে ঢাকার লালবাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৫ সালে কুরআন হিফজ, লালবাগ মাদরাসা হতে তাকমীল, ২০০২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি পাশ করেন এবং ২০০৩ সালে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র হতে 'আর্ট এপ্রিসিয়েশন কোর্স' সম্পন্ন করেন। তিনি ২০০৪ ও ২০০৫ সালে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত সপ্তম ও অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী এবং ২০০৫ সালে আমার দেশ ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' তে অংশগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তিনি শিল্পকলা সংসদ 'ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি' এর সহকারী ক্যালিগ্রাফি একাডেমী এর নির্বাহী কিছু মেঘকালো ফর্ম ব্যবহার করে তৈরী করেছেন। হরফ বিন্যাসের দারুণভাবে মিশ্রিত হয়ে আছে।[৫৪]

বাংলাদেশ এর সভাপতি, সম্পাদক এবং বাংলাদেশ সদস্য। তিনি ছোট-বড় বেশ মাঝের পরিসরে ক্যালিগ্রাফি সামগ্রিক অবয়ব তাঁর চিত্রে

শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল মারুফ

শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল মারুফ ১৯৭৫ সালে বরগুনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পবিত্র কুরআন হিফজ, মাদরাসা হতে কামিল এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাস্টার্স ও ক্যালিগ্রাফির উপর এমফিল ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ২০০০ সালে সীরাতুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে 'আলোকচিত্র প্রদর্শনী' ২০০৩ সালে রাজশাহী নগর ভবনে 'একক

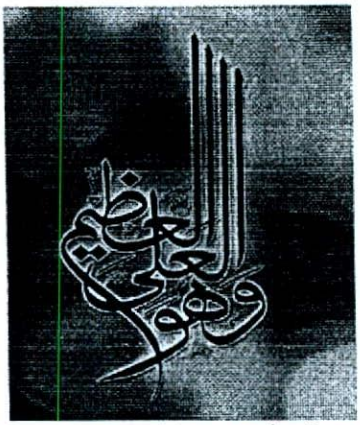

ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' ২০০৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত প্রদর্শনী এবং রাজশাহী সংস্কৃতি কেন্দ্রে 'একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী'র আয়োজন করেন। তাছাড়া ২০০৩ সালে জাতীয় জাদুঘরে, রাজশাহী মেডিকেল অডিটোরিয়াম এবং ২০০৪ সালে 'যৌথ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' সমূহে অংশগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর অধীনে ক্যালিগ্রাফির উপর গবেষণা করছেন। বর্তমানে তিনি পাকুরিয়া কলেজের অধ্যাপক এবং 'সুপারকম রিলেশন' এর গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে কর্মরত। তিনি ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ এর সদস্য এবং ক্যালিগ্রাফি একাডেমী, রাজশাহী ও সাইমুম আর্ট পাবলিসিটি এর প্রতিষ্ঠাতা।[৫৫]

শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল মারুফ লিপিশৈলীর ব্যাপারে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেও বর্ণিলতার ব্যাপারে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে পারেননি। তাঁর 'সর্বোত্তম' শিরোনামের ক্যালিগ্রাফিতে দিওয়ানী জালী শৈলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ক্যালিগ্রাফির শৈলীগত রূপান্তর স্নিগ্ধ শীতলতায় আধিপত্য বিস্তার করে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী ইসহাক আহমেদ

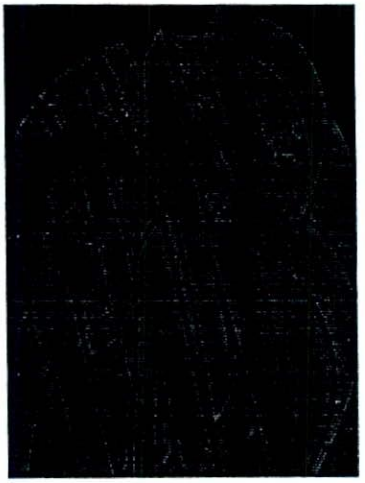

শিল্পী ইসহাক আহমেদ ১৯৮০ সালে ঢাকার লালবাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৭ সালে এইচএসসি পাশ করার পর আর একাডেমিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তবে শিল্পচর্চার স্বার্থে ইরান কালচারাল সেন্টার আয়োজিত 'ক্যালিগ্রাফি কর্মশালায়' অংশগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত 'পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' তে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ২০০৫ সালে আমার দেশ ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' তে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি লালবাগ আর্ট গ্রুপ এর সভাপতি এবং বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমীর নির্বাহী সদস্য।[৫৬]

তিনি তাঁর 'আল্লাহু আহাদ' কোলাজের বর্ণিল নির্ভরতায় চিত্রিত করেছেন সুচিত্রল পরিসরে। তাঁর কৌণিক উল্লম্ব ক্যালিগ্রাফি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠে অপ্রাসঙ্গিক বর্ণকে পরিহারের মাধ্যমে। আকর্ষণীয় এ চিত্রটিকে নিয়ে ছন্দোবদ্ধতা দারুণভাবে সংযোজিত হয়েছে। তাঁর ছবিতে পরিপক্ক চিন্তার উন্মোচন থাকলেও ভারসাম্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

শিল্পী মাসুম আখতার মিলি

শিল্পী মাসুম আখতার মিলি ১৯৮০ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেছেন। শিল্পকলা বিষয়ক কোন একাডেমিক শিক্ষা না থাকলেও ক্যালিগ্রাফির প্রতি অগাধ ভালবাসা তাকে এ শিল্প চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি ২০০২, ০৩ ও ০৫ সালে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত 'ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', ২০০৩ সালে বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমী

Dhaka University Institutional Repository

এবং ২০০৫ সালে আমার দেশ ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' তে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমী'র সদস্যা।[৫৭]

মাসুম আখতার মিলি তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে বর্ণের উঁচু টেক্সচারে সুন্দর ও আকর্ষণীয় চিত্র রচনা করেছেন। তার 'আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান-নার' কথাটি চিত্রে গভীর অর্থবহতায় উপস্থাপিত হয়েছে।

শিল্পী এইচ এম আব্দুল্লাহ আল মামুন

শিল্পী এইচ এম আব্দুল্লাহ আল মামুন ১৯৮১ সালে লক্ষ্মীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, টঙ্গী শাখা হতে হাদীস বিভাগে কামিল ও টঙ্গী সরকারি কলেজ হতে মাস্টার্স পাশ করেন। তিনি শিল্পকলা বিষয়ক কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ না করলেও ইরানী ক্যালিগ্রাফি দেখে আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে চর্চা শুরু করেন। এ পর্যন্ত তিনি নাসখী ও দিওয়ানী লিপিতে দেড় শতাধিক ক্যালিগ্রাফি তিনি নির্মাণ করেছেন। তাঁর নির্মিত শিল্পকর্ম তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠানসমূহ, তাযকিয়াতুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদরাসা, তাওহীদ ইনস্টিটিউট, মিশন গ্রুপ, নিরাপদ ফুড প্রোডাক্টস, জাবালে নূর হাসপাতাল, মাসকট প্লাজা, নেভী হেড কোয়ার্টারে সংরক্ষিত আছে। তিনি তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশন পরিচালিত সাতটি শাখায় ক্যালিগ্রাফির উপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেন। বর্তমানে তিনি তানযীমুল উম্মাহ প্রি-ক্যাডেট মাদরাসার এর প্রিন্সিপাল, 'মাসিক তানযীমুল উম্মাহ' এর সম্পাদক এবং ডিজাইন পয়েন্ট এর শিল্প নির্দেশক। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার প্রতিটি পৃষ্ঠায় সৌন্দর্য বর্ধন ও আকর্ষণীয় করার জন্য তিনি বিষয় ভিত্তিক ক্যালিগ্রাফি সেট করেন। এ পর্যন্ত তিনি শতাধিক বই ও ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ করেছেন।[৫৮]

অন্যান্য শিল্পীগণ

উপরে বর্ণিত ক্যালিগ্রাফারগণ ছাড়াও আরও অনেক ক্যালিগ্রাফার রয়েছেন যারা ক্যালিগ্রাফি চর্চায় নিজেদেরকে নিবৃত্ত রেখেছেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- সাইয়েদ জুলফিকার জহুর, নিসার জামিল, ফেরদৌসি বেগম, ফজলে বারী মামুন, আব্দুল্লাহ, নাজমুন সাঈদা পলি, মহিউদ্দিন, শাহ ইফতেখার তারিক, নূর আহমেদ মাসুম, জাহাঙ্গীর হোসাইন, কৃষাণ মোশাররফ, আবুল ফজল, মোরশেদুল আলম, এনামুল হক, কামাল আহমেদ, খন্দকার মনিরুজ্জামান, শর্মীলা কাদের, সৈয়দ আব্দুল হান্নান, হাসান মোরশেদ, আবুল খায়ের, আরেফা বেগম চৌধুরী, রেশমা আখতার, মনোয়ার হোসাইন, ওবায়দুর রহমান ফারুক, আইয়ুব আলী রোকন, সাইফুল্লাহ মানসুর নানাভাই, খলিলুল্লাহ মুহাম্মদ বায়েজিদ, নূরুজ্জামান ফিরোজ, সুমাইয়া সুলতানা সালওয়া, সাইফুল্লাহ সাফা, মুনিরা মুমতাহিনা, মুহিউদ্দিন মাসুম, হাসনাইন কবির, মিরাজ রহমান প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা ও অবদান

তানযীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদরাসা

তানযীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদরাসা বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত প্রথম ক্যাডেট মাদরাসা। এখানে শিক্ষা কারিকুলামের পাশাপাশি সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনে সহ-পাঠ্যকার্যক্রম হিসেবে সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিষয় চর্চা ও লালন করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ক্যালিগ্রাফি প্রশিক্ষণ। এর তেইশটি শাখার মধ্যে প্রায় অধিকাংশ শাখায়-ই নিয়মিত ক্যালিগ্রাফি প্রশিক্ষণ ও চর্চা হয়ে থাকে। ক্লাস পরিচালনা করেন তানযীমুল উম্মাহ পাবলিকেশন্স এর সাবেক পরিচালক শিল্পী এইচ. এম. আব্দুল্লাহ আল মামুন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য শাখাগুলোর ক্যালিগ্রাফি ক্লাসের শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং দিন ও সময় তুলে ধরা হলো -

শাখার নাম	শিক্ষার্থী সংখ্যা	দিন	সময়
তানযীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদরাসা	৩০ জন	শনিবার	৪.০০-৫.০০টা
তানযীমুল উম্মাহ প্রি-ক্যাডেট মাদরাসা	১৮ জন	মঙ্গলবার	বাদ আসর
তানযীমুল উম্মাহ হিফজ মাদরাসা	১৫ জন	রবিবার	বাদ আসর
তানযীমুল উম্মাহ ইন্টারন্যাশনাল মাদরাসা	৫০জন	বৃহস্পতিবার	শেষ পিরিয়ড
তানযীমুল উম্মাহ গার্লস মাদরাসা	১৮ জন	সোমবার	বাদ আসর
তানযীমুল উম্মাহ গার্লস হিফজ মাদরাসা	২০ জন	বুধবার	বাদ আসর

সব শাখায় ক্যালিগ্রাফির প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া তানযীমুল উম্মাহ পাবলিকেশন্স এর নিয়মিত প্রকাশনা 'মাসিক তানযীমুল উম্মাহ' তে প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত ক্যালিগ্রাফির মধ্যে বাছাই করে প্রথম স্থান অর্জনকারী শ্রেষ্ঠ ক্যালিগ্রাফারদেরকে একশত টাকার প্রাইজবন্ড প্রদান করা হয়। এ সব প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্যন্ত অনেক শিক্ষার্থী ক্যালিগ্রাফি শিখেছেন এবং চর্চা করছেন।[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক কয়েকবার ঘোষিত শ্রেষ্ঠ মাদরাসা। ইসলামী সংস্কৃতির লালনে এ প্রতিষ্ঠান বেশ তৎপর। তাই প্রতি বছর বছরের শুরুতে সাংস্কৃতিক পক্ষও পালিত হয়। এখানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্যালিগ্রাফি শিখানো না হলেও ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই ক্যালিগ্রাফি করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, উৎসবে কিংবা দেয়ালিকাসহ বিভিন্ন প্রকাশনায় এর কিছুটা চর্চা লক্ষ্য করা যায়। তবে টঙ্গী শাখায় তুরাগ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে। নয়টি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত এ এ সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে- তুলি ফোরাম। যে বিভাগ সংশ্লিষ্টদেরকে বাংলা ও আরবী ক্যালিগ্রাফি শিখানোর জন্য প্রয়াস চালানো হয়। এতে ক্লাস পরিচালনা করেন শিল্পী এইচ. এম. আব্দুল্লাহ আল মামুন ও সাইফুল্লাহ মানসুর নানাভাই।[৬০] যারই ফলশ্রুতিতে এককভাবে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরপর তিনটি তুলি উৎসব ও ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। যা আরো অনেক শিক্ষার্থীকে ক্যালিগ্রাফির প্রতি আগ্রহী করে তুলে।

কওমী মাদরাসা

বাংলাদেশের শহর থেকে গ্রামে গঞ্জে প্রায় প্রত্যেক এলাকায় কওমী মাদরাসার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এসব মাদরাসার মধ্যে ছোট-বড় অনেক প্রতিষ্ঠানেই সুন্দর হস্তলিপির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং উৎসাহ প্রদান করা হয়। বিশেষত বড় বড় মাদরাসা যেমন- লালবাগ মাদরাসা, পটিয়া মাদরাসা, হাটহাজারী দারুল উলুম মাদরাসা, জামেয়া রহমানিয়া মাদরাসাতে একজন কাতিব নিযুক্ত থাকেন। যারা সুন্দর হাতের লেখা (ক্যালিগ্রাফি) এর প্রশিক্ষণ দেন। আর এর জন্য ব্যবহৃত হয় বাঁশের কঞ্চি নির্মিত কলম। যা পাতলা ও চ্যাপ্টা করে কেটে লেখার উপযোগী করা হয়। এভাবে দেখা যায়- কওমী মাদরাসার ছাত্ররা সংস্কৃতির অন্যান্য পরিমণ্ডলে তেমন বেশি বিচরণ না করলেও ক্যালিগ্রাফির প্রতি অনেকেই ঝুঁকে পড়েন এবং পরবর্তীতে ক্যালিগ্রাফি চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন এভাবে কওমী মাদরাসাগুলো অতীব নগণ্য মাত্রায় হলেও ভূমিকা পালন করছে।[৬১]

Dhaka University Institutional Repository

শরীফা আর্ট স্কুল

শরীফা আর্ট স্কুল চট্টগ্রাম মহানগরীর সবচেয়ে আলোচিত ও পরিচিত আর্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটির এখন মোট বারটি শাখা রয়েছে। যাতে মোট ১২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং ১২৮ জন প্রশিক্ষক রয়েছেন। প্রশিক্ষকদের মধ্যে ৩৫ জন মহিলা ও ৯৩ জন পুরুষ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৩০০ জন আছে যারা খৃস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও বড়ুয়া সহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও উপজাতীয়। এ প্রতিষ্ঠানে মূলত 'ড্রইং ও পেইন্টিং' এর উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও পাশাপাশি এখানে ক্যালিগ্রাফিও শিখানো হয়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ধর্মীয় বাণী দিয়ে ক্যালিগ্রাফি করে থাকেন। তবে ক্যালিগ্রাফির মধ্যে আরবী ক্যালিগ্রাফি তথা ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চাই বেশি হয়। এখান থেকে এ পর্যন্ত আড়াই শতাধিক শিক্ষার্থী ক্যালিগ্রাফির উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং ক্যালিগ্রাফি চর্চা করছেন। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমী, এলিয়েন্স ফ্রাঁসেস গ্যালারীতে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। যাতে বাংলা ও আরবী ক্যালিগ্রাফি স্থান পায়।

প্রতিবছর ঢাকায় জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতেও এ প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী- আবুল খায়ের ও আইয়ুব আলী রোকন তাদের শিল্পচর্চার দিগন্ত সম্প্রসারিত করার জন্য বর্তমানে দুবাইয়ে অবস্থান করছেন এবং অনবরত ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করছেন। এ প্রতিষ্ঠানের সূচনালগ্ন হতে পরিচালনা করে আসছেন- শিল্পী আমিরুল হক (ইমরুল কায়েস)। তিনি নিজেই এর প্রতিষ্ঠাতা এবং তার মাতার নামে এ স্কুলটির নামকরণ করেন। এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আমিরুল হকের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে, শরীফা আর্ট স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রশিক্ষক কর্তৃক ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্মের সংখ্যা হবে প্রায় তিন সহস্রাধিক।[৬২]

চারুকলা ইনস্টিটিউট

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চারুকলা ইনস্টিটিউটে ক্যালিগ্রাফির উপর সরাসরি কোন বিভাগ বা বিষয় নেই, তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রাচ্যকলা বিভাগের পাঠ্যসূচিতে কিছু বাংলা ক্যালিগ্রাফির বিষয় আছে যা পড়তে গিয়ে লিপিকলায় অনেকেই আগ্রহী হন আবার কেউ কেউ এ বিষয়ে অধ্যয়ন করে অধিক আগ্রহের কারণে ব্যক্তিগত

Dhaka University Institutional Repository

প্রচেষ্টায় আরবী ক্যালিগ্রাফির চর্চাও শুরু করেন। এক পর্যায়ে ভাল মানের ক্যালিগ্রাফার হয়ে যান। তাছাড়া চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধিকাংশ বিভাগই যেহেতু ড্রইং, পেইন্টিং এবং ডিজাইনিং ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত আর ক্যালিগ্রাফিও যেহেতু রং, তুলি অথবা কলমের সাথে সম্পৃক্ত সেহেতু চারুকলা ইনস্টিটিউটে অধ্যয়ন করে অনেকেই ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন। যেমন শিল্পী আবু তাহের, শামসুল ইসলাম নিজামী, সৈয়দ এনায়েত হোসেন, এ.এইচ.এম বশির উল্লাহ, কামরুল হাসান কালন, অধ্যাপক মীর মুহাম্মদ রেজাউল করিম, ফরেজ আলী, ইব্রাহীম মন্ডল, নাছির উদ্দিন আহমেদ খান, আমিরুল হক, হাসান মোরশেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট হতে শিল্পী আমিরুল হক এবং শর্মিলা কাদের, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট হতে চারুকলার উপর ডিগ্রিপ্রাপ্ত।

আর্ট এন্ড ক্যালিগ্রাফি ইনস্টিটিউট

আর্ট এন্ড ক্যালিগ্রাফির চর্চার উদ্যোগ নিয়ে সম্প্রতি ঢাকার নিকুঞ্জ মডেল টাউনে যাত্রা শুরু করেছে আর্ট এন্ড ক্যালিগ্রাফি ইনস্টিটিউট। গত ডিসেম্বর মাস থেকে এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যথারীতি শুরু হয়েছে। প্রতি শুক্রবার ও শনিবার এখানে ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপালের দ্বায়িত্ব পালন করছেন- শিল্পী আরিফুর রহমান। তাছাড়া শিল্পী বশির মেসবাহও এ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত আছেন।[৬৩]

অঙ্কন আর্ট স্কুল

ঢাকা শহরের শিল্পচর্চা ও প্রশিক্ষণের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হচ্ছে অঙ্কন আর্ট স্কুল। ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলটি পরিচালনা করেন শিল্পী মাহবুবুল ইসলাম (বাবু)। এ প্রতিষ্ঠানের উত্তরা, গুলশান ও মালিবাগে মোট তিনটি শাখা রয়েছে। 'ড্রইং ও পেইন্টিং' এ প্রতিষ্ঠানের মূল বিষয় হলেও যে সকল শিক্ষার্থী বেশি অগ্রসর তাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যক্তিগত আগ্রহে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন। পরিচালক নিজেও ক্যালিগ্রাফিতে বেশ সিদ্ধহস্ত। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত 'গ্রুপ আর্ট এক্সিবিশন' এ একজন ক্ষুদে শিল্পী রাইহানা আজিম উপমা এর ক্যালিগ্রাফি ক্যানভাসের উপর এক্রিলিক মাধ্যমে করা 'ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহীমু' দর্শকমহলে বেশ সাড়া ফেলে।[৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

আর্ট স্কুল ও কলেজ

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা সহ বিভাগীয় ও জেলা শহরে অনেক আর্ট স্কুল ও চট্টগ্রামে আর্ট কলেজ রয়েছে। সেসব প্রতিষ্ঠানে ড্রইং ও পেইন্টিং এর উপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ হয়। ড্রইং ও পেইন্টিং এবং ওরিয়েন্টাল আর্ট যেহেতু ক্যালিগ্রাফির মতো রং তুলি বা কলমের সাথে সম্পৃক্ত এবং ক্যালিগ্রাফি একটি সৃজনশীল ও কালোত্তীর্ণ শিল্প। তাই শিল্পীরা বিভিন্ন প্রদর্শনী ও শিল্পকর্ম দেখে ক্যালিগ্রাফির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। ধীরে ধীরে প্রচেষ্টা চালিয়ে এ শিল্প আয়ত্ত করেন এবং এক পর্যায়ে ভাল ক্যালিগ্রাফার হয়ে উঠেন। ফলে পরোক্ষভাবে হলেও আর্ট স্কুল ও কলেজ ক্যালিগ্রাফি শিল্প চর্চা ও বিকাশে সহায়তা করে।

আরবী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের মাস্টার্স শ্রেণীর জেনারেল ও মডার্ন গ্রুপের ৫০৭ ও ৫০৮ নং কোর্সের ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে (ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস ও মুসলিম দর্শন এর বিকল্প) আরবী ক্যালিগ্রাফি-১ এবং আরবী ক্যালিগ্রাফি-২ বিষয় দু'টি কারিকুলামের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ৫০ নম্বর করে দু'টি কোর্সের জন্য ১০০ নম্বর এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ৫০৭ নং কোর্সে আরবী লিপিকলার মূলভিত্তি, কুফী লিপিতে সাম্প্রতিক ক্যালিগ্রাফির উন্নয়ন, আরবী বর্ণমালার সংস্কার এবং ৫০৮ নং কোর্সে গোলায়িত লিপিশৈলীর উন্নয়ন, মাগরিবী লিপির প্রধান প্রধান ধারা সমূহ, ক্যালিগ্রাফির স্বল্পমাত্রার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। পরীক্ষার মান বন্টন নিম্নরূপ:

বিষয়ের নাম	মান
আরবী ক্যালিগ্রাফি (বড় প্রশ্ন - ৫টি)	৩৫
ইনকোর্স পরীক্ষা	১০
টিউটোরিয়াল	০৫
সর্বমোট নাম্বার =	৫০

৫০৭ ও ৫০৮ দু'টি কোর্সে ৫০ + ৫০ = ১০০ নম্বর। এ দু'টি কোর্সের জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থের নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে -

১. মুসলিম ক্যালিগ্রাফি - এম. জিয়াউদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

২. Islamic Calligraphy in Mediaeval India- P.I.S. Mustafaizur Rahman

৩. Islamic Calligraphy - Y. H. Safadi

৪. Splendor of Islamic Calligraphy- Khatibi & Sijolmasi

৫. The rise of the north Arabic script and its Quranic development

৬. In the Surfey of Persian Art Vol.- II

৭. তারিখ আল খাত্তুল আরাবী - মুহাম্মদ তাহির আল কুদরী

৮. দিরাসাত ফি তারিখ আল খাত্তুল আরাবী - সালাহুদ্দীন মুনাজ্জিদ

৯. অসি আল খাত্তুল আরাবী - খলীল ইয়াহইয়া আল নামী

১০. বাদাঈ খাত্তুল আরাবী - জায়াদ্দিন নাযী

১১. The Quranic art of Calligraphy and Illumination- Martin Lings

১২. Arabic Calligraphy and his arritable Encyclopedia of Islam- B. Moontz

এছাড়া এমফিলের সিলেবাসে আরবী ভাষাতত্ত্ব ও আরবী ক্যালিগ্রাফির একটি বিষয় রয়েছে।[৬৫] যাতে বিভিন্ন যুগে আরবী ক্যালিগ্রাফি ও এর তুলনামুলক পর্যালোচনা রয়েছে।

অনুরূপভাবে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ৫০৫ নং কোর্সের শিরোনাম হচেছ - মুসলিম ক্যালিগ্রাফি ও পেইন্টিং এর উন্নয়ন। যাতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে- পেইন্টিং এর ব্যবহার, ইতিহাস ও সভ্যতায় এর অবস্থান, ইসলামে পেইন্টিং এর উন্নয়ন ও এর দৃষ্টিকোণ, চিত্রশিল্প, মুসলিম পেইন্টিং এর মূলভিত্তি, চিত্রের ধারা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ, বিখ্যাত চিত্রকর পরিচিতি ও চর্চাকেন্দ্র, আরবী ক্যালিগ্রাফি, ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিভিন্ন ধারাসমূহ এবং ক্যালিগ্রাফারদের সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে যেসব গ্রন্থ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা হচেছ-

1. Painting in Islam - Arnold T. W.
2. Islamic Art - Brand, Barbara.
3. Art and Architecture of Islam - Blair S & J Bloom.
4. Indian Painting under the Mughals - Brown, Percy.
5. Mughal Painting during Jahangir's time.
6. A hand book of Muhammad Art - M. S. Diamond.

Dhaka University Institutional Repository

7. Arab Painting - R. E. Hinghausen.
8. Art and Architecture of Islam - R.E.Hinghausen & Oleg Grabar.
9. Persian Painting - B. Grag.
10. A Survey of Persian Art - A. U. Pope.
11. Persian Painting - A. U. Pope.
12. Islamic Calligraphy in Medieval India-P.I.S. Mustafizur Rahman.
13. Islamic Art - D. T. Rice
14. Art of Islam, Language and Meaning- T. Burckhar
১৫. Muslim Calligraphy - M. Ziauddin.
১৬. মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প - এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী
১৭. মুসলিম চিত্রকলা- সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

তাছাড়া মাস্টার্সে তিনটি গ্রুপের মধ্যে ইসলামিক আর্ট এন্ড আর্কেওলজি গ্রুপরয়েছে যার মধ্যে মুসলিম স্থাপত্য, মুসলিম দেশ সমূহে চিত্রশিল্পের উন্নয়ন, বিশ্ব শিল্পকলার ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত। এসব বিষয় পাঠ করে অনেক শিক্ষার্থী ইসলামী শিল্পকলা সম্পর্কে অধ্যয়ন, গবেষণা, গ্রন্থ প্রণয়ন এমনকি কেউ কেউ ক্যালিগ্রাফি চর্চার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ছেন। ফলে এভাবেই ক্যালিগ্রাফি শিল্পের চর্চা সম্প্রসারিত হয়।[৬৬]

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাংগঠনিক চর্চা ও অবদান

ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ

ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও প্রশিক্ষণের জন্য সবচেয়ে নির্ভরশীল সংগঠন হচ্ছে ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ। ১২ জুলাই ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এ পর্যন্ত ক্যালিগ্রাফি শিল্পাঙ্গনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত এ পর্যন্ত দশটি গ্রুপ ও একটি একক প্রদর্শনী এবং জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা আয়োজন করে এ সংগঠনটি। এখানে বছর ব্যাপি ক্যালিগ্রাফি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয় এবং সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীগণ সনদপ্রাপ্ত হন। এ পর্যন্ত তিনটি ব্যাচ থেকে মোট চল্লিশ জন শিল্পী ক্যালিগ্রাফির উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন। যারা এখন নিয়মিত ক্যালিগ্রাফি চর্চা করছেন। ক্যালিগ্রাফির কোর্স সম্পন্ন করার জন্য সোসাইটির নিজস্ব একটি সিলেবাস ও কোর্স আউটলাইন রয়েছে। যা নিম্নরূপ:

সিলেবাস:

১. তাত্ত্বিক:
শিল্প, চারুশিল্প, কারুশিল্প, পোস্টার, ডিজাইন (নকশা), কম্পোজিশন, ব্যালান্স, ছন্দ, ফর্ম ও শিল্পকলা, ইসলামের দৃষ্টিতে শিল্পকলা, শিল্পের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকলা, ইসলামী শিল্পকলা, মুসলিম শিল্পকলা, ইসলামী শিল্পকলার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, আব্বাসীয়, উমাইয়া, সেলযুক যুগ, ওসমানী যুগ, সুলতানী যুগ, ভারতবর্ষ, মুঘল, ক্যালিগ্রাফি, বাংলা ক্যালিগ্রাফি, চিত্র শিল্পে রং এর ব্যবহার এবং বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফার: মুর্তজা বশীর, শামসুল ইসলাম নিজামী, আবু তাহের ও ড. আব্দুস সাত্তার
প্রশিক্ষক: ইব্রাহীম মন্ডল

২. রং এর ব্যবহার:
পেন্সিল স্কেস, পানি রং, তেল রং, গোয়াস, এক্রেলিক, মিশ্র মাধ্যম, বাটিক ও রং তৈরী
প্রশিক্ষক: ইব্রাহীম মন্ডল

৩. ফন্ট:
কুফী, সুলুস, দিওয়ানী, নাসতা'লিক, মডার্ন ক্যালিগ্রাফি, ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং

Dhaka University Institutional Repository

প্রশিক্ষক: মোহাম্মদ আব্দুর রহীম

কোর্স আউটলাইন: ডিপ্লোমা ইন আর্ট এন্ড ক্যালিগ্রাফি

ক্লাস	বিষয়	প্রশিক্ষক
প্রথম	উদ্বোধনী কথা, পরিচিতি পর্ব	ইব্রাহীম মন্ডল
দ্বিতীয়	ক্যালিগ্রাফির প্রাথমিক ধারণা	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
তৃতীয়	ক্যালিগ্রাফির পদ্ধতিসমূহ, সুলুস লিপি	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
চতুর্থ	লিখা- আলিফ, বা, তা, ছা	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
পঞ্চম	প্রাকটিস- আলিফ, বা, তা, ছা	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
ষষ্ঠ	লিখা- নুন, লাম, কাফ	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
সপ্তম	প্রাকটিস- নুন, লাম, কাফ	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
অষ্টম	লিখা- ফা, ক্বাফ, ওয়াও	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
নবম	প্রাকটিস- ফা, ক্বাফ, ওয়াও	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
দশম	লিখা- লাম আলিফ, দাল, যাল, হা	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
১১ তম	প্রাকটিস- লাম আলিফ, দাল, যাল, হা	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
১২ তম	লিখা- জিম, হা, খা, আইন, গাইন	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
১৩ তম	প্রাকটিস- জিম, হা, খা, আইন, গাইন	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
১৪ তম	লিখা- ছোয়াদ, দ্বোয়াদ, ত্বোয়া, যোয়া	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
১৫ তম	প্রাকটিস- ছোয়াদ, দ্বোয়াদ, ত্বোয়া, যোয়া	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
১৬ তম	লিখা- রা, যা, ছিন, শিন	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
১৭ তম	প্রাকটিস- রা, যা, ছিন, শিন	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
১৮ তম	লিখা- মীম, হা, ইয়া	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
১৯ তম	প্রাকটিস- মীম, হা, ইয়া	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
২০ তম	সকল হরফ চর্চা	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
২১ তম	পরীক্ষা- সকল হরফ	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
২২ তম	শিল্প, চারুশিল্প, কারুশিল্প	ইব্রাহীম মন্ডল
২৩ তম	শিল্পকলা, শিল্পের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকলা	ইব্রাহীম মন্ডল
২৪ তম	ইসলামের দৃষ্টিতে শিল্পকলা, মুসলিম শিল্পকলা, ইসলামী শিল্পকলার উদ্ভব	ইব্রাহীম মন্ডল
২৫ তম	ইসলামী শিল্পকলার বিকাশ- আব্বাসীয়, উমাইয়া, সেলযুক যুগ, ওসমানী যুগ	ইব্রাহীম মন্ডল
২৬ তম	ইসলামী শিল্পকলার বিকাশ- সুলতানী যুগ, ভারতবর্ষ, মুগল	ইব্রাহীম মন্ডল
২৭ তম	ক্যালিগ্রাফি, বাংলা ক্যালিগ্রাফি, বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফার	ইব্রাহীম মন্ডল

Dhaka University Institutional Repository

২৮ তম	রং, রং এর প্রকারভেদ, মৌলিক রং, রং তৈরি	ইব্রাহীম মন্ডল
২৯ তম	প্রাকটিস- পানি রং, তেল রং, পোস্টার রং	ইব্রাহীম মন্ডল
৩০ তম	প্রাকটিস-গোয়াস, এক্রেলিক, মিশ্র মাধ্যম, বাটিক ও পেন্সিল স্কেস	ইব্রাহীম মন্ডল
৩১ তম	পোস্টার, ডিজাইন, কম্পোজিশন, ব্যালান্স, ছন্দ, ফর্ম	ইব্রাহীম মন্ডল
৩২ তম	ক্যালিগ্রাফি ও আর্ট প্রাকটিস	ইব্রাহীম মন্ডল
৩৩ তম	ক্যালিগ্রাফি ও আর্ট প্রাকটিস	ইব্রাহীম মন্ডল
৩৪ তম	পরীক্ষা- তত্ত্বীয়	ইব্রাহীম মন্ডল
৩৫ তম	শিল্পকর্ম নির্মাণ-১	ইব্রাহীম মন্ডল ও আব্দুর রহীম
৩৬ তম	শিল্পকর্ম নির্মাণ-২	ইব্রাহীম মন্ডল ও আব্দুর রহীম
৩৭ তম	শিল্পকর্ম নির্মাণ-৩	ইব্রাহীম মন্ডল ও আব্দুর রহীম
৩৮ তম	শিল্পকর্ম নির্মাণ-৪	ইব্রাহীম মন্ডল ও আব্দুর রহীম
৩৯ তম	শিল্পকর্ম নির্মাণ-৫	ইব্রাহীম মন্ডল ও আব্দুর রহীম
৪০ তম	ফাইনাল পরীক্ষা	ইব্রাহীম মন্ডল ও আব্দুর রহীম

কোর্স: হায়ার ডিপ্লোমা ইন আর্ট এন্ড ক্যালিগ্রাফি

ক্লাস	বিষয়	প্রশিক্ষক
প্রথম	উদ্বোধনী কথা, পরিচিতি পর্ব	ইব্রাহীম মন্ডল
দ্বিতীয়	শিল্পকলার প্রাথমিক ধারণা	ইব্রাহীম মন্ডল
তৃতীয়	ক্যালিগ্রাফির প্রাথমিক ধারণা	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
চতুর্থ	সুলুস লিপির ব্যবহার	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
পঞ্চম	সুলুস লিপির ব্যবহার	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
ষষ্ঠ	সুলুস লিপির ব্যবহার	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
সপ্তম	রং ও বিভিন্ন মাধ্যমের ব্যবহার	ইব্রাহীম মন্ডল
অষ্টম	সুলুস লিপিতে ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
নবম	সুলুস লিপিতে ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
দশম	সুলুস লিপির উপর পরীক্ষা	ইব্রাহীম মন্ডল
১১ তম	কুফী লিপির প্রাকটিস	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
১২ তম	কুফী লিপির প্রাকটিস	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
১৩ তম	কুফী লিপির প্রাকটিস	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
১৪ তম	কুফী লিপির প্রাকটিস	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
১৫ তম	কুফী লিপির শিল্পকর্ম তৈরি	ইব্রাহীম মন্ডল ও আব্দুর রহীম
১৬ তম	কুফী লিপির শিল্পকর্ম তৈরি	ইব্রাহীম মন্ডল ও আব্দুর রহীম
১৭ তম	কুফী লিপির উপর পরীক্ষা	ইব্রাহীম মন্ডল
১৮ তম	দিওয়ানী লিপির প্রাকটিস	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
১৯ তম	দিওয়ানী লিপির প্রাকটিস	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম

Dhaka University Institutional Repository

২০ তম	দিওয়ানী লিপির প্রাকটিস	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
২১ তম	দিওয়ানী লিপির প্রাকটিস	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
২২ তম	দিওয়ানী লিপির শিল্পকর্ম তৈরি	ইব্রাহীম মন্ডল ও আব্দুর রহীম
২৩ তম	দিওয়ানী লিপির শিল্পকর্ম তৈরি	ইব্রাহীম মন্ডল ও আব্দুর রহীম
২৪ তম	দিওয়ানী লিপির উপর পরীক্ষা	ইব্রাহীম মন্ডল
২৫ তম	নাসতা'লিক লিপির প্রাকটিস	শহীদুল্লাহ এফ. বারী
২৬ তম	নাসতা'লিকলিপির প্রাকটিস	শহীদুল্লাহ এফ. বারী
২৭ তম	নাসতা'লিকলিপির প্রাকটিস	শহীদুল্লাহ এফ. বারী
২৮ তম	নাসতা'লিকলিপির প্রাকটিস	শহীদুল্লাহ এফ. বারী
২৯ তম	নাসতা'লিকলিপির শিল্পকর্ম তৈরি	শহীদুল্লাহ এফ. বারী
৩০ তম	নাসতা'লিকলিপির শিল্পকর্ম তৈরি	শহীদুল্লাহ এফ. বারী
৩১ তম	নাসতা'লিকলিপির উপর পরীক্ষা	ইব্রাহীম মন্ডল ও আব্দুর রহীম
৩২ তম	তুঘরা লিপির ক্যালিগ্রাফি	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
৩৩ তম	তুঘরা লিপির ক্যালিগ্রাফি	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
৩৪ তম	তুঘরা লিপির ক্যালিগ্রাফি	মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
৩৫ তম	বাংলা ক্যালিগ্রাফি	শিল্পী আরিফুর রহমান
৩৬ তম	বাংলা ক্যালিগ্রাফি	শিল্পী আরিফুর রহমান
৩৭ তম	বাংলা ক্যালিগ্রাফি	শিল্পী আরিফুর রহমান
৩৮ তম	বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফার	ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান
৩৯ তম	বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি:সমস্যা ও সম্ভাবনা	ড. আব্দুস সাত্তার
৪০ তম	ভাস্কর্যে ক্যালিগ্রাফি	আমিনুল ইসলাম আমিন
৪১ তম	লোকজ ক্যালিগ্রাফি	শিল্পী সবিহ উল আলম
৪২তম	ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং	ইব্রাহীম মন্ডল
৪৩ তম	সামগ্রিক পর্যালোচনা	ইব্রাহীম মন্ডল ও আব্দুর রহীম
৪৪ তম	ফাইনাল পরীক্ষা	ইব্রাহীম মন্ডল ও আব্দুর রহীম

এ কোর্সের ভর্তি ফি মাত্র তিনশত টাকা এবং মাসিক টিউশন ফি দুইশত টাকা। প্রতি শুক্রবার সকাল ১০.০০টা হতে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত এর ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মাঝখানে জুমআর নামাজের বিরতি থাকে। প্রশিক্ষণ কোর্স গুলোতে ক্লাস নেন শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী আবদুর রহীম ও শিল্পী শহীদুল্লাহ্ এফ. বারী ও অতিথি প্রশিক্ষক বৃন্দ। এছাড়াও তারা মাঝে মাঝে ক্যালিগ্রাফির উপর সেমিনার, মুক্ত আলোচনা ও কৃতী ক্যালিগ্রাফারদের নিয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। যাতে ক্যালিগ্রাফি চর্চার প্রচার হয় এবং নবীন ক্যালিগ্রাফারগণ উৎসাহিত হন। এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে সভাপতি ও সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন যথাক্রমে শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল ও শিল্পী আবদুর রহীম।

Dhaka University Institutional Repository

এর বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক হলেন- সাইফুল্লাহ মানসুর নানাভাই।[৬৭] প্রতিষ্ঠানটি 'ক্যালিগ্রাফ আর্ট' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করত। যদিও বর্তমানে এর কার্যক্রম বন্ধ আছে।

বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমী

বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চাকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমী। প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত ক্যালিগ্রাফি প্রশিক্ষণে তেমন বেশি অবদান রাখতে পারেনি। তবে এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ ব্যক্তিগতভাবে অনেককে ক্যালিগ্রাফি শিখিয়েছেন। এ প্রতিষ্ঠানটি "ক্যালিগ্রাফি" নামে ত্রৈমাসিক একটি পত্রিকা প্রকাশের চমৎকার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং দু'সংখ্যা বেশ ভালোভাবেই প্রকাশ করেছেন। যাতে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও ক্যালিগ্রাফারের শিল্পকর্ম নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা-পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। তবে বর্তমানে এর প্রকাশনা বন্ধ রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও সেক্রেটারী হচ্ছেন যথাক্রমে- শিল্পী আরিফুর রহমান ও শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ঢাকায় এসেছিলেন ইরানের ক্যালিগ্রাফি শিল্পী নাসের নওরোজি মানেশ। তিনি বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমীর কার্যালয় পরিদর্শন ও এর সদস্যদের সাথে মত বিনিময় সভায় মিলিত হন। পরের দিন ইরানী সংস্কৃতি কেন্দ্র ও বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমীর যৌথ উদ্যোগে "সমকালীন ক্যালিগ্রাফি ঃ ইরান ও বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। যাতে দু'দেশের ক্যালিগ্রাফির তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়।[৬৮]

ইসলামী আর্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বাংলাদেশে ইসলামী আর্ট, ক্যালিগ্রাফি, স্থাপত্য, তাম্রলিপি, মুদ্রালিপি, উৎকীর্ণ লিপি সহ নানাবিধ মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধারণকারী সংগঠন ইসলামিক আর্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। এটি বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধিত একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। ইসলামী শিল্পকলার ব্যাপক প্রচার, প্রসার, চর্চা, গবেষণা ও সংরক্ষণ ইত্যাদির লক্ষ্যে এ সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে। এ সংগঠনটি ইসলামী আর্ট ও ক্যালিগ্রাফির বিস্তৃতি ও বিকাশে বেশ কয়েকটি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ও সেমিনারের আয়োজন করেছে। ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণে ক্যালিগ্রাফি, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা, টাইল্‌স, টেরাকোটা, কাঠখোদাই, ধাতবকর্ম, স্থাপত্যিক কাঠামো, হস্তশিল্প ইত্যাদির সংরক্ষণ ও এর উপর গবেষণা করে

Dhaka University Institutional Repository

যাচ্ছে। এ বিষয় সম্পর্কিত গ্রন্থ সম্বলিত একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি রয়েছে। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রায় প্রতি বছর শিল্পকলা বিষয়ক গবেষণাধর্মী লেখা নিয়ে জার্নাল প্রকাশিত হয়। ইসলামী শিল্পকলার নিদর্শনাবলীকে জাতীয়ভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে এ সংগঠনটি ইসলামিক আর্ট মিউজিয়ামের প্রস্তাব পাশ করেছে এবং তা বাস্তবায়নে অর্থ সংগ্রহ চলছে। এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ৮ জন এবং আজীবন সদস্য ৫৬ জন। বর্তমানে এর সভাপতি হলেন- অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান ও সেক্রেটারী অধ্যাপিকা রাশেদা বেগম। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাজ্ঞ ও গুণী অধ্যাপক, ডক্টর, বা বিভাগীয় চেয়ারম্যানসহ ইসলামী শিল্পচর্চা ও গবেষকদের সমন্বয়ে এ সংগঠনটির পথচলা।[৬৯]

বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চা, লালন ও প্রশিক্ষণের অন্যতম সংগঠন বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এ সংগঠনের সভাপতি বিশিষ্ট ক্যালিগ্রাফার শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম। দেশী বিদেশী ক্যালিগ্রাফারদের শিল্পকর্ম, বিভিন্ন গবেষকদের লিখিত ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক প্রবন্ধ সহ ইসলামী ক্যালিগ্রাফি ও ইসলামী শিল্পকলা বিষয়ক অসংখ্য বই সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরি ও সংগ্রহশালা রয়েছে এ সংগঠনের। ইতোমধ্যে এ সংগঠনের উদ্যোগে আরবী ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব ও বিকাশ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ সহ কয়েকটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আবদুর রহীম বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি করেছেন এবং বই প্রকাশ করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবেও অনেককে ক্যালিগ্রাফি শিখিয়েছেন।

মুঈনীয়া ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন

মুঈনীয়া ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও প্রশিক্ষণে বেশ ভূমিকা রাখছে। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হযরত মুঈনুদ্দীন আহমদ একজন পীর। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে সৈয়দ সাইফুদ্দীন আহমদ হাসান ও হোসাইনী এ সংগঠনটি পরিচালনা করছেন। ৭ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটির মাধ্যমে এদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। শিল্পী সাইফুল্লাহ সাফা প্রশিক্ষক হিসেবে ক্লাস পরিচালনা করে থাকেন। চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ও ঢাকার মিরপুর শাহ আলীতে তাদের পরচালিত একটি ফাযিল মাদরাসা ও কওমী মাদরাসা রয়েছে। যেখানে সপ্তাহে ৩ দিন ক্যালিগ্রাফি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। নতুনদের উৎসাহিত

Dhaka University Institutional Repository

করার জন্য এ সংগঠনের রয়েছে প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রম। জাতীয় পর্যায়ে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর জন্য কয়েকবার উদ্যোগ নিলেও তা সফল হয়নি। তবে অদূর ভবিষ্যতে এর কার্যক্রম আরো জোরদার হবে বলে আশা করা যায়।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতি কেন্দ্র

ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তারে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতি কেন্দ্রের রয়েছে অনবদ্য অবদান। বাংলাদেশস্থ ইরানী দূতাবাস পরিচালিত ইরানী সংস্কৃতি কেন্দ্রের নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ক্যালিগ্রাফি চর্চা, প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর আয়োজন। ইরানী সংস্কৃতি কেন্দ্র মাঝে মাঝে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে। শুধু তাই নয়- বাংলাদেশী আগ্রহী শিক্ষার্থীদেরকে ক্যালিগ্রাফি শিক্ষার মহান প্রয়াসে ইরানী সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রতিবছর আয়োজন করে ক্যালিগ্রাফি কর্মশালা এবং দু'মাস ব্যাপি ক্যালিগ্রাফি প্রশিক্ষণ কোর্স। সপ্তাহে দু'দিন বিকাল ৪.০০টা থেকে ৫.০০টা পর্যন্ত ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন ইরানের বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার ও নন্দনতত্ত্ববিদ মিসেস রেজা হাশেমী। কোর্সের ফি থাকে মাত্র পাঁচশত টাকা।[৭০]

সেন্টার ফর এশিয়ান ইসলামিক আর্ট এন্ড কালচার

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের সমন্বয়ে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেন্টার ফর এশিয়ান ইসলামিক আর্ট এন্ড কালচার (কায়াক)। যারা মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানেই আয়োজন করেছে নবীন শিল্পীদের ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী। ৯ই অক্টোবর ২০০৫ হতে দশ দিনব্যাপি জাতীয় জাদুঘরের ভাস্কর নভেরা হলে ১ম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া এই সংগঠন 'শৈল্পিক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে ইসলামী শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, শিল্প সমালোচনা, ক্যালিগ্রাফারদের সাক্ষাৎকার এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীর উপর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। যা ক্যালিগ্রাফির প্রচার ও প্রসারে আরেকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এ সংগঠনের মাধ্যমে নবীন শিল্পীদের পারস্পরিক সমন্বয় সাধন, শিল্প পর্যালোচনা এবং নতুন নতুন শিল্পচিন্তায় বেশ অবদান রাখছে বলা যায়।[৭১]

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা সমূহ

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত প্রদর্শনী সমূহ

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র বাংলাদেশের ইতিবাচক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম সূতিকাগার। ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি বিকাশের বিভিন্ন মাধ্যম তথা- ক্বিরাত, গান, অভিনয়, আবৃত্তি, বক্তৃতা, কার্টুন, সাহিত্য চর্চা, সাংবাদিকতা, চলচ্চিত্র ইত্যাদির চর্চা ও বিকাশে এ সংগঠনের রয়েছে অসামান্য অবদান। বিশেষত ইসলামী আর্ট ও ক্যালিগ্রাফির বিকাশে রয়েছে সুদৃঢ় অবস্থান ও পদচারণা। এ সংগঠনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় গত ১৯৯৮ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছর রাজধানী ঢাকায় জাতীয়ভাবে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনটির সভাপতি ও সেক্রেটারী যথাক্রমে অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর ও কবি আসাদ বিন হাফিজসহ ৩৮ জন কর্মকর্তাসহ তিন শতাধিক সদস্য ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তৃত পরিমণ্ডলে নিরন্তর সাধনা করে যাচ্ছন। প্রতিষ্ঠাকালে সংগঠনটির নাম ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র হলেও এর বর্তমান নাম সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র। নিম্নে এ সংগঠনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো-

প্রথম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-১৯৯৮

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে জাতীয় জাদুঘরে প্রথম গ্রুপ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ২৬ জুলাই-২ আগস্ট-১৯৯৮ সালে। জাতীয়ভাবে এবং রাজধানী ঢাকায় এটিই ছিল সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ যৌথ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী। এতে দেশের শীর্ষ পর্যায়ের ৫ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন শামসুল ইসলাম নিজামী, আবু তাহের, সাইফুল ইসলাম, ইব্রাহীম মন্ডল ও আরিফুর রহমান। এ প্রদর্শনীতে পাঁচ শিল্পীর অনিন্দ্য সুন্দর ক্যালিগ্রাফিতে দর্শকমন্ডলী ব্যাপকভাবে মোহিত হন বিধায় কর্তৃপক্ষ এর পর থেকে প্রতিবছর এমন আয়োজনের সাহস পায়। এ প্রদর্শনীর আহবায়ক ছিলেন শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল।[৭২]

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-১৯৯৯

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের দ্বিতীয় প্রদর্শনীটি ছিল শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডলের একক অংশগ্রহণে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী। বাংলাদেশে ক্যালিগ্রফি চর্চার অন্যতম দিকপাল এ শিল্পীর অসাধারণ অসাধারণ মোট ৫২টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয় এ প্রদর্শনীতে। যা উপস্থিত দর্শকদের আনন্দের খোরাক যোগায় এবং দর্শকদের মাঝে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। হৃদয়ের মাঝে চেতনার মশাল প্রজ্জ্বলিত হয়। ফলে পরবর্তী বছরগুলোতেও এ আয়োজনের ধারা অব্যাহত থাকে।[৭৩]

তৃতীয় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০০

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত তৃতীয় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ২০ জুন-২ জুলাই ২০০০ ইং জাতীয় জাদুঘরে। প্রদর্শনীতে সাতজন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। সেই সাতজন শিল্পী হলেন- ড. আব্দুস সাত্তার, আবদুশ শাকুর, সাইফুল ইসলাম, ইব্রাহীম মন্ডল, আরিফুর রহমান, আমিরুল হক (ইমরুল) ও মাহবুব মুর্শিদ। এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, প্রিন্ট মেকিং মিডিয়ায় মুসলিম লিপিকলার স্বার্থক প্রয়োগের নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলছেন। শিল্পী আবদুশ শাকুর, প্রাচীন বাংলা পাণ্ডুলিপির লেখামালা নতুন আঙ্গিকে তার চিত্রমালায় স্থান দিয়েছেন। শিল্পী সাইফুল ইসলাম মুসলিম লিপিকলাকে এক নতুন রূপকল্পে সাজাবার প্রয়াস পান। পবিত্র কুরআনের বাণী, হাদীস ও নীতিকথা থেকে চয়ন করে আরবী লিপির উল্লম্ব, সমান্তরাল ও কৌণিক রেখায় টান-টোন কে কখনও মসজিদের আবহে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলা হরফকেও তিনি সুচারুরূপে আরবী লিপিকলার ফর্মে স্বার্থকভাবে তার ক্যানভাসে উপস্থাপন করেছেন।

শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল-এর আরবী লিপিকলার প্রতি দুর্বলতা ও ভালবাসা তাকে ধাবিত করেছে নিরন্তর ক্যালিগ্রাফি চর্চায়। তিনি কুফী ও নাসতা'লিক লিপির সাহায্যে ঋজু ও বিসর্পিল রেখার বিন্যাস ঘটিয়ে সুন্দর লিপিকর্ম গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তার অলঙ্কৃত পাখি অবয়বে ক্যালিগ্রাফি মুঘল আমলের তুঘরা লিপির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শিল্পী আরিফুর রহমান এর দক্ষ তুলি চালনা ও বর্ণলেপনের কুশলতা তার আরবী লিপিকলার জন্য সমাদৃত হয়েছে। পরম্পরাগত ইসলামী ক্যালিগ্রাফি থেকে অনুসৃত তার চিত্রকর্ম দেশী আবহে আধুনিক আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। শিল্পী আমিরুল হক (ইমরুল) ও শিল্পী

Dhaka University Institutional Repository

মাহবুব মুর্শিদ বর্ণিল ক্যানভাসে যথাক্রমে বিসমিল্লাহ ও কুরআনের আয়াত অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।[৭৪]

চতুর্থ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০১

শিল্পীর শৈল্পিক বোধ ও বর্ণবিন্যাসের এক রূপের ছটা নিয়ে পবিত্র সীরাতুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে ২০০১ সালে জাতীয় জাদুঘরে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত চতুর্থ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। দেশের শীর্ষস্থানীয় ক্যালিগ্রাফারদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জলরং, তেলরং ও গোয়াস, এক্রিলিক ও মিশ্র মাধ্যমে করা মোট প্রায় ৭০টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। যার মধ্যে ছিল কুরআনের আয়াত, হাদীস, আরবী প্রবাদ ও নীতিবাক্য এবং কালিমার ক্যালিগ্রাফি। এ প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি ক্যাটালগও প্রকাশিত হয়। জাতীয় জাদুঘরের সর্ববৃহৎ গ্যালারীতে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পবোদ্ধাগণ। ঢাকাসহ সারাদেশ থেকে আগত দর্শকদের সরব উপিস্থিতি অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলে।[৭৫]

পঞ্চম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক পঞ্চম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৭ মে - ৪ জুন ২০০২ সালে। পবিত্র সীরাতুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে আয়োজিত পক্ষকাল ব্যাপি এ প্রদর্শনীতে চব্বিশ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন- মুর্তজা বশীর, আবু তাহের, শামসুল ইসলাম নিজামী, ড. আবদুস সাত্তার, সবিহ-উল আলম, অধ্যাপক মীর মুহাম্মদ রেজাউল করিম, রাসা, ইব্রাহীম মন্ডল, নাছির উদ্দিন আহমেদ খান, আমিনুল ইসলাম আমীন, শহীদুল্লাহ এফ. বারী, মাহবুব মুর্শিদ, মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ, মুহাম্মদ আমিরুল হক (ইমরুল), খন্দকার মনিরুজ্জামান, মুহাম্মদ মনোয়ার হোসাইন, মুবাশ্বির মজুমদার, মোহাম্মদ আবদুর রহীম, ফেরদৌস-আরা আহমদ, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, রফিকুল্লাহ গাজালী, হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, আবুদ দারদা, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ও মাসুম বিল্লাহ। প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- জাতীয় সংসদের তৎকালীন স্পীকার ব্যারিস্টার মুহাম্মদ জমির উদ্দিন সরকার এবং আলোচক হিসেবে মোস্তফা জামান আব্বাসী, অধ্যাপক আবদুল মতিন সরকার ও

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী সবিহ-উল আলম প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার। আর প্রদর্শনীর আহবায়ক ছিলেন- শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল।[৭৬]

৬ষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৩

২০০৩ সালের ১৪ জুন থেকে জুন জাতীয় জাদুঘর গ্যালারীতে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ষষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রদর্শনীতে ৩৪ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন- সবিহ-উল আলম, অধ্যাপক মীর মুহাম্মদ রেজাউল করিম, এ. এইচ. এম. বশির উল্লাহ, কামরুল হাসান কালন, ইব্রাহীম মন্ডল, আরিফুর রহমান, নাছির উদ্দিন আহমেদ খান, শহীদুল্লাহ এফ. বারী, খন্দকার মনিরুজ্জামান, বশির মেসবাহ, মোহাম্মদ আবদুর রহীম, মুবাশ্বির মজুমদার, আমিনুল ইসলাম আমীন, মাহবুব মুর্শিদ, আমিরুল হক (ইমরুল), সৈয়দ আবদুল হান্নান, মাহমুদ মোস্তফা আল মারুফ, হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, নাঈম মাহমুদী, মাসুম বিল্লাহ, মুহাম্মদ মনোয়ার হোসাইন, ফেরদৌস-আরা আহমেদ, রফিকুল্লাহ গাজালী, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, নূর আহমেদ মাসুম, ওবায়দুর রহমান ফারুক, মাসুম আখতার মিলি, আইয়ুব আলী রোকন, নাজমুন সাঈদা পলি, মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, আবুল খায়ের, আরেফা বেগম চৌধুরী (ঝিনুক), শর্মীলা কাদের ও রেশমা আখতার প্রমুখ। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত এ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী এম. শামসুল ইসলাম। সভাপতি ছিলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন- যথাক্রমে শিল্পী সাইফুল্লাহ মানছুর ও শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল।[৭৭] এ প্রদর্শনীতে নানা বৈচিত্রময় চিত্র সম্বলিত শিল্পকর্মগুলোয় অবলীলায় উঠে এসেছে নিবিড় ধ্যান ও বোধের রেখা দিয়ে এক মুগ্ধ কথোপকথন।

সপ্তম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪

২০০৪ সালের ১ জুন-১৫ জুন জাতীয় জাদুঘরের নলীনিকান্ত ভট্টাশালী গ্যালারীতে পক্ষকাল ব্যাপি সপ্তম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে ৩৪ জন শিল্পীর শতাধিক ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন- মুর্তজা বশীর,

Dhaka University Institutional Repository

আবু তাহের, শামসুল ইসলাম নিজামী, ড. আব্দুস সাত্তার, সবিহ-উল আলম, এ. এইচ. এম. বশির উল্লাহ, কামরুল হাসান কালন, রাসা, ইব্রাহীম মন্ডল, আরিফুর রহমান, নাসির উদ্দিন আহমেদ খান, শহীদুল্লাহ এফ. বারী, আমিনুল ইসলাম আমিন, মাহবুব মুর্শিদ, আমিরুল হক, খন্দকার মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ আবদুর রহীম, মুবাশ্বির মজুমদার, ফেরদৌস-আরা আহমেদ, রফিকুল্লাহ গাজালী, মাহমুদ মোস্তফা আল মারুফ, হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, আবুদ দারদা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, মাসুম বিল্লাহ, শর্মিলা কাদের, মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, ইসহাক আহমেদ, মাসুম আখতার মিলি, ফেরদৌসি বেগম, হাসান মোর্শেদ, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ফজলে বারী মামুন, ও আতা ইমরান ও নিসার জামিল প্রমুখ।[৭৮]

অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ৫ জুন-১৭ জুন ২০০৫ সালে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে। এ প্রদর্শনীতে ৩২ জন শিল্পীর বাছাইকৃত শতাধিক ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। শিল্পী মুর্তজা বশীরের 'কালিমা তাইয়েবা', আবু তাহেরের 'কালিমা', ড. আব্দুস সাত্তারের 'বাংলা বর্ণমালা', মনিরুল ইসলাম ও সৈয়দ এনায়েত হোসেন এর 'ড্রইং ও পেইন্টিং', এ.এইচ.এম. বশির উল্লাহর 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন', সাইফুল ইসলামের 'কালিমা', অধ্যাপক মীর রেজাউল করিমের 'বিসমিল্লাহ', ফরেজ আলীর 'ইকরা বিসমি রাব্বি কাল্লাযি খালাক', ইব্রাহীম মন্ডলের 'আল্লাহু আকবার', আরিফুর রহমানের 'ত্বা-সীন-মীম', শহীদুল্লাহ এফ. বারীর 'ওয়ামা আরসালনাকা', আমিনুল ইসলাম আমিনের 'ওয়া ফি আনফুসিকুম আফালা তুবছিরুন', নাসির উদ্দিন আহমেদ খান এর 'খালাক', মাহবুব মুর্শিদের 'সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইযযাতি আম্মা ইয়াসিফুন', বশির মেসবাহর 'আর রাহমান আর রাহীম', আবদুর রহীমের 'আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমা ইন্নাল কুলুব', মুবাশ্বির মজুমদারের 'বিমূর্ত', আমিরুল হকের 'কালিমা', ফেরদৌস-আরা আহমেদের 'বিমূর্ত', মোস্তফা আল মারুফের 'বিমূর্ত', হা. মীম কেফায়েতুল্লাহর 'বিমূর্ত', আবুদ দারদা মুহাম্মদ নূরুল্লাহর 'কালিমা', ইসহাক আহমেদের 'আল্লাহু', মাসুম বিল্লাহর 'বিসমিল্লাহ', আতা ইমরানের 'আরবী বর্ণমালা', মাসুম আখতার মিলির 'হুয়াল্লাহু', নিসার উদ্দিন জামিলের 'আল্লাহু নুরুস সামা ওয়াতি ওয়াল আরদ', ফেরদৌসী বেগমের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু', মহিউদ্দিন আহমেদের 'আল জান্নাতু তাহতা আকদামিল উম্মাহাত', ফজলে বারী মামুনের 'লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকভীম', আব্দুল্লাহর 'কালিমা', এবং মুর্শিদ

Dhaka University Institutional Repository

আলমের 'ইন্নাল্লাহা আলা কুলি শাইয়িন কাদীর' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে প্রদর্শনীর উপর একটি প্রতিবেদন লিখেন ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী।[৭৯]

নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৬

২০০৬ সালের ৬ মে -২০ মে জাতীয় জাদুঘরের নলীনিকান্ত ভট্টাশালী গ্যালারীতে পক্ষকাল ব্যাপি অনুষ্ঠিত হয়, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত সপ্তম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী। এ প্রদর্শনীতে ২৬ জন শিল্পীর প্রায় একশত ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। এ প্রদর্শনীতে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তারা হলেন- ড. আব্দুস সাত্তার, সৈয়দ এনায়েত হোসেন, এ. এইচ. এম. বশির উল্লাহ, সাইফুল ইসলাম, অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম, ফরেজ আলী, ইব্রাহীম মন্ডল, আরিফুর রহমান, জাহাঙ্গীর হোসাইন, শহীদুল্লাহ এফ বারী, আমিনুল ইসলাম আমিন, কৃষাণ মোশাররফ, মাহবুব মুর্শিদ, বশির মেসবাহ, মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, মুবাশ্বির মজুমদার, আমিরুল হক (এমরুল), মুহাম্মদ আবুল ফজল, ফেরদৌস-আরা আহমদ, মাহমুদ মোস্তফা আল মারুফ, আবুদ দারদা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, ইসহাক আহমেদ, ফেরদৌসী বেগম, নিসার জামিল, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ও মোর্শেদুল আলম প্রমুখ। প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে সাদেক খান এর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। এ প্রদর্শনীটির আহবায়ক ছিলেন শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল।[৮০]

দশম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৮

২০০৮ সালের ১৫ জুন-৩০ জুন পর্যন্ত পক্ষকাল ব্যাপি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের দশম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী। বর্ণাঢ্য এ প্রদর্শনীতে ৩৯ জন নবীন প্রবীণ ক্যালিগ্রাফার অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী শিল্পীগণ হলেন- ড. আব্দুস সাত্তার, সবিহ-উল-আলম, এ. এইচ. এম বশির উল্লাহ, আহমেদ নওয়াজ, অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম, ভাস্কর রাসা, ফরেজ আলী, ইব্রাহীম মন্ডল, জাহাঙ্গীর হোসাইন, শহীদুল্লাহ এফ বারী, আমিনুল ইসলাম আমিন, মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মাহবুব মুর্শিদ, নাসির উদ্দিন আহমেদ খান, আমিরুল হক (এমরুল কায়েস), বশির উল্লাহ, মোহাম্মদ আবদুর রহীম, ফেরদৌস আরা আহমেদ, মাহমুদ মোস্তফা আল মারুফ, ইসহাক আহমেদ, ফেরদৌসী বেগম, শর্মিলা কাদের, জামিল হামিদী, মোঃ আব্দুল্লাহ, মোরশেদুল আলম, মাসুম বিল্লাহ, মোঃ

Dhaka University Institutional Repository

কামাল আহমদ, আজিজুর রহমান তালুকদার, হাসনাইন, মোঃ আতাউর রহমান, জাকির হোসাইন জুয়েল, মোঃ তাওফিকুর রহমান (তুহান), বাচ্চু ধর পাল, মাহফুজুর রহমান শিমুল, এইচ. এম আব্দুল্লাহ আল মামুন, নাহিদ রোকসানা, আতাউল্লাহ, মুহাম্মদ মহিউদ্দিন ও আবু দারদা প্রমুখ।

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন- ইসলামী আর্ট অর্গানাইজেশন এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। সভাপতি ছিলেন- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক ভূঁইয়া শফিকুল ইসলাম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর ও আহবায়ক ইব্রাহীম মন্ডল। প্রদর্শনী উপলক্ষে শিল্পীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও একটি করে ক্যালিগ্রাফি সহ একটি আকর্ষণীয় ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়। যাতে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৮ শিরোনামে ড. আব্দুস সাত্তারের একটি লেখা প্রকাশিত হয়।[৮১]

জাতীয় শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা-২০১১

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র ২৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে পবিত্র রবিউল আউয়াল ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজন করে প্রথম জাতীয় শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা-২০১১। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার মোট ১৮৭ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্লে থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ক গ্রুপে ১১৯ জন এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ৬৮ জন ক্ষুদে আঁকিয়ে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তারা বাংলা, ইংরেজি ও আরবী ভাষায় অক্ষর সাজিয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে তাদের চিত্রকর্ম। তাদের রংতুলিতে নান্দনিকভাবে ফুটে উঠে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শ্রেষ্ঠত্বগাথা আল্লাহু আকবার, বিসমিল্লাহ, আল্লাহর গুণবাচক নাম ও পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের অংশবিশেষ। এছাড়া তারা এঁকেছে ৫২ এর ভাষা শহীদের রক্তে রাঙানো মহান একুশের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক স্থাপনা ও প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়।

শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী হামিদুল ইসলাম, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী ও শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিযোগিতায় ক গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে- সুমাইয়া ফাতিমা শরীফ, মাসকুরা বিনতে মান্নান ও মুবাশ্বির রহমান সিদ্দীকি

Dhaka University Institutional Repository

স্বচ্ছ এবং খ গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে- সাদিয়া নার্গিস, মুহাম্মদ ইমরান হোসাইন ও রাসেল আহমদ। বিজয়ী প্রত্যেককে নগদ অর্থ, ক্রেস্ট বই ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।[৮২]

বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

মহাগ্রন্থ আল কুরআন আরবী ভাষায় রচিত। আল কুরআনের ক্যালিগ্রাফি বুঝার জন্য বাংলা ক্যালিগ্রাফি চর্চার বিষয়টি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ যে ভাষারই ক্যালিগ্রাফি হোক না কেন প্রথমে এর প্রতি আগ্রহ, উদ্দীপনা ও উদ্বেলতা সৃষ্টি হলে স্বভাবতই আরবী ক্যালিগ্রাফির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে। তাই আরবী ক্যালিগ্রাফির বিকাশের জন্য বাংলা ক্যালিগ্রাফির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নিম্নে বাংলাদেশে আয়োজিত এ যাবত কালের বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমী

১৪১০ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমীর উদ্যোগে জাতীয় জাদুঘরের নভেরা হল গ্যালারীতে ২০০৩ সালের ১৪ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল সাতদিন ব্যাপি 'প্রথম বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীর অর্থায়নে ছিল- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, যুবক, আইকাব হাউজিং লিমিটেড, আল বারাকা ইসলামিক হাসপাতাল ও পপুলার লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড। এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন- আরিফুর রহমান, ফেরদৌস-আরা আহমেদ, মুবাশ্বির মজুমদার, হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, মাসুম আখতার মিলি ও রফিকুল্লাহ গাজালী। এ প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে দু'টি লেখা প্রকাশিত হয়। যার একটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট এর শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়ের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রফিকুল আলম এর লেখা 'নান্দনিক শিল্প ক্যালিগ্রাফি ঃ বাংলাদেশে এর চর্চা প্রসঙ্গে' এবং অন্যটি ছিল শিল্পী আরিফুর রহমান এর 'বাংলা বর্ণমালায় ক্যালিগ্রাফি'।[৮৩]

বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী -২০০৫

আমার দেশ ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ জাতীয় জাদুঘরের নভেরা হল গ্যালারীতে তিনদিন ব্যাপি যৌথভাবে বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। আয়োজনে ছিল- বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমী। এতে পনের জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন- আরিফুর রহমান, ইব্রাহীম মন্ডল, বশির মেসবাহ, মাহবুব মুর্শিদ, মুবাশ্বির মজুমদার, ফেরদৌস-আরা আহমদ, হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, মাসুম আখতার মিলি, ইসহাক আহমেদ, মোস্তফা আল মারুফ, আবুদ দারদা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, আতা ইমরান, মাসুম বিল্লাহ, নূর আহমেদ মাসুম, শাহ ইফতেখার তারিক প্রমুখ। প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এ কে এম ইয়াকুব আলীর 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি- সম্ভাবনা ও প্রত্যাশা' শীর্ষক একটি লেখাও প্রকাশিত হয়।[৮৪]

শিল্পী আরহাম-উল-হক চৌধুরী

২০০৭ সালের ১৭ হতে ২৭ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শিল্পী আরহাম-উল-হক চৌধুরী এর 'একক বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত শিল্পকর্মে ছিল শিল্পীর স্বাতন্ত্রতার ছাপ। তিনি প্রচলিত কিছু প্রবাদ বাক্য বাছাই করে নিয়ে চমৎকার রংয়ের ব্যবহারে বাংলা বর্ণমালার মাধ্যমে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন - 'বাঁশ বাগানের ভেলকি' লাইনটিতে তিনি কালো রং ব্যবহার করে তার মধ্যে সুচারুরূপে লিখেছেন 'যেমন শরা, তেমন হাঁড়ি, গড়ে রেখেছে কুমার' লাইনটি লেখার মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে একটি মাটির হাঁড়ি। তার শিল্পকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- প্রাকৃতিক ও প্রাত্যাহিক জীবনের নানা উপাদান ব্যবহার করে তিনি তাঁর ছবির একটি ভিত্তি দেন, কিন্তু এর মূল ফর্মের যোগান দেয় বাংলা বর্ণমালা।[৮৫]

একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

শিল্পী মুর্তজা বশিরের একক প্রদর্শনী

১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে The Light (নূর বা জ্যোতি) শিরোনামে একটি একক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী আয়োজন করেন শিল্পী মুর্তজা বশির। তাঁর এ প্রদর্শনীতে অনেকগুলো ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। তিনি তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে প্রথমত জায়নামাজ, তসবিহ, তাবিজ প্রভৃতি লোকজ মটিফ ও সোলেমানী মটিফকে জ্যামিতিক প্যাটার্নে ব্যবহার করেছেন। যাতে তাঁর শিল্পকর্মে নিজস্ব ক্রিয়েটিভিটি লক্ষ করা যায়। এ প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়। যার প্রচ্ছদে একটি ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্মের ছবি দেওয়া আছে। যেখানে একটি হাতের মধ্যে আল্লাহ লিখে আল্লাহর ক্ষমতা এবং আল্লাহ শব্দের চারপাশে চারটি রংয়ের বিন্যাসকে সর্বময় ক্ষমতার প্রতিকী উপস্থাপন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫ সালের ২৭ অক্টোবর দৈনিক সংগ্রামে শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারীর একটি ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন- ১৯৭৯ সালে তাঁর হজ্জযাত্রা কালে হিজবুল বাহারের নামাজ কক্ষে শিল্পী মুর্তজা বশিরের দুটো ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং তিনি দেখেছেন। এ শিল্পকর্ম দু'টিতে সোনালী মেটাল রং ব্যবহার করেছেন। ৮০ এর দশকের শেষভাগে এসে তিনি বাংলার স্বাধীন সুলতানদের উপর গবেষণা শুরু করেন ফলে সুলতানী আমলের শিলালিপির তুঘরা লিপি তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে 'কালিমা তৈয়্যবা' শিরোনামে ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। রং ও হরফের আশ্চার্য সম্মিলনে তাঁর প্রদর্শনী ভাস্বর হয়ে উঠে।[৮৬]

শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডলের একক প্রদর্শনী

পবিত্র সীরাতুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডলের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৮ ই জুলাই-২৮ জুলাই ১৯৯৯ সালে জাতীয় জাদুঘরে। এতে জলরং, তেলরং ও গোয়াস মাধ্যমে করা তার মোট ৫২টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। যার মধ্যে ছিল- শুরুতেই, বিপ্লবের ঘোষণা, শান্তি কামনা, নির্ভরতা, শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা, সকল প্রশংসা, আত্ম সমর্পন, আমি হাজির, সুন্দরতম নাম, প্রথম নির্দেশ, সদা উজ্জ্বলকৃত, বেহেশতি পাথর, অবিনশ্বর সত্তা, অকৃতজ্ঞ হয়ো না, সত্য সমাগত, তিনি আল্লাহ, বিশ্বের রহমত, দরূদ, শুভ সূচনা, রূপময় আল্লাহ, পরশমনি, আশেক-মাশুক, সিয়াম, গ্রাম-বাংলা, উত্তম মানুষ, তেজারত, গ্রাম-বাংলা, তাহাজ্জুদ, বিপর্যয়, পাহাড়ী নিসর্গ, জীবন যাত্রা, সকালের যাত্রা, আল্লাহর নাম, মাছ ধরা, গাড়িয়াল ভাই, কাজের সন্ধানে, নৌকা, পবিত্রতম নাম ও সকলি তাঁর দান ইত্যাদি শিরোনামে এসব শিল্পকর্ম নির্মাণ করেন। এ প্রদর্শনী উপলক্ষে ক্যাটালগে 'ইব্রাহীম মন্ডলের হস্তলিখন শিল্প' শিরোনামে সৈয়দ আলী আহসানের একটি লেখা প্রকাশিত হয়।[৮৭]

শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

২০০০ সালের ৩-১১ জুন জাতীয় জাদুঘরের মিলনায়তন লবিতে শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। যে প্রদর্শনীতে বাংলা ও আরবী মিলে মোট ৩৭টি অনিন্দ্য সুন্দর ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। চমৎকার ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর বর্ণ ও তুলির চমৎকার কম্পোজিশনে

Dhaka University Institutional Repository

নির্মিত এসব শিল্পকর্ম ছিল দর্শকদের হৃদয় হরণকারী। প্রদর্শনীর আহবায়ক ও সদস্য সচিব ছিলেন যথাক্রমে- গিয়াস কামাল চৌধুরী ও মাসুদ মজুমদার। এর অর্থায়নে ছিল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, কালচারাল কোর্স ইউ.কে, যুবক, ইয়ুথ গ্রুপ, চামু ডেন্টাল ক্লিনিক। এ প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে সৈয়দ আলী আহসানের 'হস্তলিখন শিল্প', নাসির মাহমুদ এর 'আরিফুর রহমানের ক্যালিগ্রাফি' এবং বিদ্যুৎ বিহারীর বাংলা বর্ণমালায় ক্যালিগ্রাফি শীর্ষক লেখা প্রকাশিত হয়। এ প্রদর্শনীতে কম্পিউটার গ্রাফিক্সের করা- উদ্বোধন, সর্বোত্তম, আমানত, অবদান, বিশ্বাস, উত্তম আদর্শ, ক্যালিগ্রাফি, অন্বেষণে, প্রারম্ভিকা, আলিফ-লাম-মীম, আলো, বিসমিল্লাহ, শ্রেষ্ঠত্ব, আহবান, প্রার্থনা-১, প্রার্থনা-২, কলম, বাংলা ভাষা, প্রশ্নবোধক, আমার প্রার্থনা, আল্লাহর পথে, শুরু, আমার বিশ্বাস, জ্ঞানের জন্য, অনুগ্রহ, প্রথম বাণী, ওয়াটার কালারে- রাসূল (সাঃ) প্রশস্তি-১, ২, ৩, ৪ ও মহত্ব এবং পোস্টার কালারে- ব্যবসা, জীবন বিধান, সংগ্রাম, সম্মান, ঐক্য, পবিত্রতা ইত্যাদি শিরোনামে ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়।[৮৮]

শিল্পী বশির মেসবাহর দ্বিতীয় একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

মরহুম কাজী নোমান আহমদ স্মরণে শিল্পী বশির মেসবাহ ২০০৬ সালে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ৩১ জুলাই থেকে ৯ই আগস্ট পর্যন্ত দশদিন ব্যাপি 'দ্বিতীয় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী'র আয়োজন করেন। যাতে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য সম্পন্ন ২৮টি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। যার মধ্যে ছিল, গোয়াশ মাধ্যমে- স্মরণ, উৎকৃষ্ট পথ, আশা, বড়ত্ব, জানা, সুদ, প্রশংসা, মিশ্র মাধ্যমে- মুক্তিদাতা, সুদ, সূরা ইখলাস, অনুগ্রহ, তেল রংয়ে- বড়ত্ব, আল্লাহ, এক্রিলিক মাধ্যমে- বাসমালাহ, জ্ঞান, কালিমা, কালির মাধ্যমে সূরা ফাতিহা ও সূরা আর রহমানের শ্রেষ্ঠত্ব, ডিজিটাল প্রিন্টে- বিসমিল্লাহ, ফ্লাশ-ব্যাকে- আল্লাহ ইত্যাদি শীর্ষক ক্যালিগ্রাফি। অর্থায়নে ছিল- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল আমার দেশ। প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রদর্শিত ক্যাটালগে তৎকালীন আমার দেশ সম্পাদক আমানুল্লাহ কবির ও সাবেক সংসদ সদস্য কাজী শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন কায়কোবাদ শুভেচ্ছা বাণী দেন এবং বশির মেসবাহর ক্যালিগ্রাফির উপর 'শিল্প ও বিশ্বাস' শিরোনামে সমালোচনা মূলক নিবন্ধ লিখেন- শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ।[৮৯]

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিনের তৃতীয় একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

বাংলাদেশের প্রখ্যাত ক্যালিগ্রাফার শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিনের তৃতীয় একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী- ২ থেকে ৮ আগস্ট-২০০৮ এশিয়াটিক সোসাইটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামিক আর্ট অর্গানাইজেশন এর অর্থায়নে ও এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশের সহযোগিতায় আয়োজিত উক্ত প্রদর্শনীতে শিল্পী আমিনের প্রায় অর্ধশত শিল্পকর্ম স্থান পায়। তিনি সুরভিত ক্যানভাসে বহুমাত্রিকতায় তেলরং, জল রং ও মিশ্র মাধ্যমে মানব দেহের গঠন, বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন পদ্ধতিসহ বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে আরবী ও বাংলা ভাষায় ক্যালিগ্রাফি করেন। তাছাড়া বিভিন্ন ধাতব পদার্থ যথা- পাথর ও গ্লাসের সাহায্যে আকর্ষণীয় বিভিন্ন শিল্প নির্মাণ করেন। বিশেষত 'আলিফ-লাম-মীম' ও 'ইকরা বিসমি' দ্বারা ভাস্কর্য ক্যালিগ্রাফি দর্শক মহলে রীতিমত বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।

তিনি বাংলাদেশে একটি ইসলামী আর্ট মিউজিয়ামের স্বপ্ন উপস্থাপন করেছেন। Proposed Islamic Art Meusiam Layout টি তাঁর অসামান্য পরিশ্রম, সাধনা ও স্বপ্নের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ড. আব্দুস সাত্তার বলেন- শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন আরবী বর্ণমালাকে অবলম্বন করে সুন্দর ও আকর্ষণীয় শিল্প রচনা করেছেন। তাঁর চিত্রে আরবী বর্ণমালার পাশাপাশি মানুষের হাত, লতাপাতা সহ আরো বহুবিধ বিষয়ের সমাহার লক্ষ্য করা যায়। যা তাঁর শিল্পকে আরো সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলে। তাঁর শিল্পে এক নতুনত্বের স্বাদ বিদ্যমান। তাঁর এ প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে মোহাম্মদ আবদুর রহীম কর্তৃক লিখিত শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিনের ক্যালিগ্রাফি ও মাসুম বিল্লাহর- ক্যালিগ্রাফি ভাস্কর্য ও সুধীজনের মন্তব্য স্থান পায়।[৯০]

শিল্পী ফেরদৌস আরা আহমেদের দ্বিতীয় একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

২০০৮ সালের ২ থেকে ৭ এপ্রিল বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় চিত্রশালায় শিল্পী ফেরদৌস আরা আহমেদের দ্বিতীয় একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সুন্দরতম নাম: মেহেদী পাতার রংয়ে শিরোনামে প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ফুলের প্রতিকৃতির উপর মেহেদী পাতার রসে মহান আল্লাহর ৯৯টি নামের অপূর্ব উপস্থাপনা বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি চর্চায় আরেক নতুন মাত্রা যোগ করে। এতে তিনি আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতির দিকে ধাবিত হয়েছেন এবং দেশজ ফুলের নকশার অভ্যন্তরে আল্লাহর গুণবাচক ক্যালিগ্রাফি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করেছেন। এজন্য তিনি চয়ন করেছেন- জবা, কেয়া, বকুল, শিমুল, পদ্ম, জারুল,

Dhaka University Institutional Repository

কদম ও অপরাপর দেশজ ফুলের মটিফ। আরবী লিপির পাশাপাশি তিনি বাংলা অক্ষর বিন্যাস করে আল্লাহর নামসমূহের বাংলা অর্থসহ ক্যালিগ্রাফি করেছেন। যা দর্শকদের এ ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান প্রদানে সাহায্য করে। তাঁর চিত্রে শুধু একটি লালচে ব্রাউন বর্ণ ব্যবহার করেছেন। দক্ষতার সাথে এই সীমিত বর্ণ ব্যবহারের ফলে যে হাফটোন ও জলরং এর আবহ সৃষ্টি করেছে তাতে তাঁর একক বর্ণলেপনের একঘোয়েমিতা প্রশমিত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে- সুরা ফাতিহা, কালিমা, সালাম ইত্যাদি। তিনি এসবকে দেশজ ঐতিহ্য ও পরম্পরার সাথে সম্পৃক্ত করে বিন্যাস করেছেন। তাঁর দক্ষ হাতের অনিন্দ্য সুন্দর ক্যালিগ্রাফিকে বিন্যাস করেছেন নকশী কাঁথা, শীতল পাটি, জামদানী শাড়ি ও দেশজ ফুলের ও লতাপাতার নকশার অভ্যন্তরে।[৯১]

শিল্পী সাইয়েদ জুলফিকার জহুরের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

২০০৯ সালের ২০-২৬ আগস্ট ঢাকার ধানমন্ডিস্থ দৃক গ্যালারীতে 'ক্যালিগ্রাফি অন কুরআনিক কসমোলজি' শীর্ষক সপ্তাহ ব্যাপি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ১৯৬৮ সালের ৭ অক্টোবর যশোর শহরে জন্মগ্রহণকারী জুলফিকার জহুর দারুল উলুম দেওবন্দ হতে দাওরাহ এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হতে থিওলজিতে মাস্টার্স পাশ করেন। তিনি একাধারে একজন আর্কিটেক্ট, গবেষক, জ্যোতির্বিদ, মসজিদের খতিব ও ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি একজন ব্যতিক্রম ধারার ক্যালিগ্রাফার। তিনি তাঁর প্রদর্শনীতে পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াতকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছবি সংযোজন করে গ্রাফিক্সের মাধ্যমে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। আয়াত ও ছবির অপূর্ব কম্বিনেশনে প্রত্যেকটি অনন্য শিল্প হিসেবে ফুটে উঠেছে। যা দর্শকদেরকে যেমন কুরআনের আয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। তেমনি তাদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছে। প্রায় দেড় সহস্রাধিক বছর পূর্বে আল কুরআন মহাজগত সম্পর্কে অনেক নির্ভুল তথ্য দিয়েছে। আর অতি সম্প্রতি নাসার হাবল টেলিস্কোপ মহাকাশে করেছে কাব্যিক দৃষ্টিপাত। এ দু'টির সমন্বয়েই মূলত তাঁর ক্যালিগ্রাফির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। যা বিজ্ঞানমনস্কদের জন্য নতুন দুয়ার উন্মোচন করে।[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য প্রদর্শনী

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, টঙ্গী শাখায় প্রথম পোস্টার ও ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

২০০৪ সালের ১৪-১৭ জানুয়ারি ৪ দিন ব্যাপি তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, টঙ্গী শাখার শহীদ আব্দুল মালেক মিলনায়তনে প্রথম পোস্টার ও ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। যাতে মোট পঁচিশ জন শিল্পীর অংশগ্রহণে প্রায় ১২৫টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। যাতে প্রায় মানসম্মত ৩০ টি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। ছাত্র সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত প্রদর্শনীটির আহবায়ক ছিলেন সিরাজুল ইসলাম বেগ এবং সদস্য সচিব ছিলেন সাইফুল্লাহ মানসুর নানাভাই। এতে যারা অংশ নেন তারা হলেন- কাজী সাইফুল ইসলাম, কাজী মুহিউদ্দীন মাসুম, আব্দুল্লাহ আল ইহসান, সাইফুল্লাহ মানসুর নানাভাই, হোসাইন মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ফারজানা খান টুম্পা, নূরুল্লাহ, মোসলেহ উদ্দিন বাবু, যোবায়ের, বাকী বিল্লাহ, রাশেদুল ইসলাম নাঈম, লুৎফর রহমান, শোয়াইব হোসেন প্রমুখ।[৯৩] প্রদর্শনীর শুরুতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদরাসার সাংস্কৃতিক কমিটির আহবায়ক মাওলানা সাইদুল ইসলাম এবং সভাপতি ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা সফিকুল্লাহ আল মাদানী। প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়।

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, টঙ্গী শাখায় দ্বিতীয় তুলি উৎসব

গত ১৫-১৭ই মে তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা টঙ্গী শাখার ক্যাম্পাসে ছাত্র সংসদের উদ্যোগে দ্বিতীয় বর্ণাঢ্য তুলি উৎসব ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পাসের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ও এস এম সুলতান গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রদর্শনীতে মোট ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণে প্রায় দেড় শতাধিক ক্যালিগ্রাফি, চিত্রকর্ম ও দেয়ালিকা স্থান পায়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত সহস্রাধিক দর্শনার্থীর পদচারণায় মুখরিত হয় ক্যাম্পাস। দর্শনার্থী বিশিষ্টজনরা মন্তব্য বোর্ড ও বইয়ে তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। উৎসবের প্রথম দিন আহবায়ক তাজদিদ বিন ওয়াদুদের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব গোলাম কিবরিয়ার পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা টঙ্গী শাখার উপাধ্যক্ষ মাওলানা সফিকুল্লাহ আল মাদানী, মুহাদ্দিস মাওলানা মিজানুর রহমান, স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ইদ্রিসুল আলম

Dhaka University Institutional Repository

মিলন, ছাত্র সংসদের ভিপি হাসনাইন আহমেদসহ টঙ্গী এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।[৯৪] উৎসবটি সকলের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়।

HSBC ব্যাংক আয়োজিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

HSBC ব্যাংক তার ইসলামিক ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস 'আমানাহ' এর পরিচিতি উপলক্ষে ২০১০ সালের ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত গুলশানের 'কায়া' গ্যালারীতে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। বাংলাদেশের প্রধান শিল্পী ও ক্যালিগ্রাফার মুর্তজা বশির এর তৈলরং নির্মিত ১২টি অনন্য শিল্পকর্ম এ প্রদর্শনীতে স্থান পায়। পবিত্র কুরআনের শুরুতে মুকাত্তয়াত আয়াত ও প্রতিকৃতি সমূহকে ক্যানভাসের উপরে অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো- The Muqatta't শিরোনামে ক্যানভাসের উপর লাল, নীল, সবুজ ও সাদা রংয়ে আরবী হরফ 'ত্বা-সীন-মীম' অঙ্কন করেন। যার মাঝে সুদৃশ্য সাদা রংয়ের সংমিশ্রণ ঘটান। The Muqatta't-10 শিরোনামে লাল ও হাল্কা সবুজ রংয়ের সংমিশ্রণে 'আলিফ-লাম-মীম', 'আলিফ-লাম-রা' অঙ্কন করেন। The Muqatta't-2 শিরোনামে নীল, সাদা ও গাঢ় লাল, সাদা, নীল ও উজ্জ্বল সবুজ রংয়ে 'ত্বাহা' অঙ্কন করেন। The Muqatta't-4 শিরোনামে নীল, সাদা ও লাল, রং ব্যবহার করে রং 'ইয়াসিন' অঙ্কন করেন। যা দর্শকদের নয়ন জুড়িয়ে দেয়। ক্যালিগ্রাফি কর্মগুলো HSBC ব্যাংকের গ্রাহকরা ক্রয় করেন আর এ অর্থ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আহসানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল তহবিলে জমা দেন।[৯৫]

ইরান সংস্কৃতি কেন্দ্র ও শিল্পকলা একাডেমীর ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

২০০৭ সালের ৮-১৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় চিত্রশালা গ্যালারীতে ইরান সংস্কৃতি কেন্দ্র ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর যৌথ উদ্যোগে দশদিন ব্যাপি এক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।[৯৬] আল কুরআনের আলোকে ক্যালিগ্রাফি ও পেইন্টিং শীর্ষক এ প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব- এ. বি. এম. আব্দুল হক চৌধুরী। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট এর অধ্যাপক শিল্পী মাহমুদুল হক এবং ইরানী দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সিলর ড. এম আর হাশেমী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক কামরুল হাসান।

Dhaka University Institutional Repository

প্রদর্শনীতে সাতজন ইরানী শিল্পীর ৫২টি শিল্পকর্ম স্থান পায়। সেই সাতজন শিল্পী হচ্ছেন- আব্দুল্লাহ কিয়ানী, সিয়াবুশ লতিফী, হামিদ নিরুমান্দ, মুহাম্মদ আলী ফারাসাতী, খোরাসানী, সেদাঘাত জাব্বারী ও নুবিজাদেহ। তাঁরা আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াত, কালিমা, দরুদ ও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম কে কাগজ ক্যানভাসে জল ও তেল রংয়ের মাধ্যমে চমৎকার ক্যালিগ্রাফি করেছেন। এছাড়া কাঠ ও টাইলসের উপরও নান্দনিক ক্যালিগ্রাফি করেছেন। আল কুরআনের আয়াতকে তারা দৃষ্টিনন্দন ভাবে ভাস্কর্যেও উপস্থাপন করেছেন। এসব শিল্পকর্মের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে সূরা হামদ, আল্লাহু আকবর, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, কালিমা, সূরা বাকারা, ইয়া আবা আবদিল্লাহ, আসমাউল হুসনা, আয়াতুল কুরসি, ফাসাব্‌বিহ বিহামদি রাব্বিকা, হুয়াস সামি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদি।

আল কুরআন রিসার্চ একাডেমীর প্রথম আল কুরআন প্রদর্শনী

২০০১ সালের ২৩-২৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় জাদুঘরে আল কুরআন রিসার্চ একাডেমী আয়োজিত তিনদিন ব্যাপি আল কুরআন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন শরীফের ত্রিশ পারার সম্পূর্ণ আরবী হরফের বৈচিত্রপূর্ণ সংস্করণের এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন- সাবেক প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ। পবিত্র কুরআন শরীফের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এর তরজমা, তাফসীর এবং এ সংক্রান্ত প্রায় চারশত গ্রন্থ প্রদর্শনীতে স্থান পায়। এ ছাড়া রাসূল (সাঃ) এর সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আরবী হস্তাক্ষর ও এর বিবর্তনের একশত চৌদ্দটি ক্যালিগ্রাফিও এতে প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীতে রাজশাহীর হামিদুজ্জামান লিখিত বৃহদাকার একটি কুরআনের ক্যালিগ্রাফি সবার নজর কাড়ে। যা তিনি দীর্ঘ আট বছর ধরে কঠোর সাধনা করে সম্পন্ন করেন। প্রদর্শনীর তিন দিনই সকল বয়সের নারী-পুরুষ দর্শকে পরিপূর্ণ ছিল জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারীটি।[৯৭]

আল কুরআন রিসার্চ একাডেমীর দ্বিতীয় আল কুরআন প্রদর্শনী

আল কুরআন রিসার্চ একাডেমীর উদ্যোগে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ২৩ থেকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচ দিন ব্যাপি দ্বিতীয় আল কুরআন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য হলো- বাংলাদেশের জনগণ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পবিত্র কুরআনের প্রতি আগ্রহ-উদ্দীপনা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা। এতে দর্শকগণ আরবী, বাংলা ও ইংরেজি সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার ও বিভিন্ন আকৃতির বৈচিত্রপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

অজস্র কুরআন শরীফের একত্র সমাবেশের পাশাপাশি শিল্পী সাইফুল ইসলাম, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন সহ কয়েকজন বিদেশী শিল্পীর কৃত পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের কয়েকটি ক্যালিগ্রাফি কর্ম স্থান পায়। প্রদর্শনীর মূল আকর্ষণ ছিল- বাংলাশের রাজশাহী জেলার জন্মগ্রহণকারী কৃতিশিল্পী মোঃ হামিদুজ্জামান এর হস্তলিখিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কুরআন সমূহের মধ্যে অন্যতম কুরআন শরীফটি এ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছরের কঠোর সাধনার ফসল এ কুরআন শরীফটি। আর্ট পেপারের উপরে কালো লেখা কুরআন শরীফটির ওজন ৬০ কেজি তথা ১ মন ২৫ সের। মোট ১১০০ পৃষ্ঠার এ কুরআন শরীফটি লিখতে সর্বমোট ৩৫০ দোয়াত কালি ব্যয় হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে এ প্রদর্শনীটি আয়োজন করা হয়।[৯৮] এ প্রদর্শনীর মাধ্যমে যেমন দর্শকদের মাঝে কুরআনের প্রতি অগাধ ভালবাসা জন্মে তেমনিভাবে ক্যালিগ্রাফির প্রতি তাদের আকর্ষণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

পঞ্চদশ জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী

২৬ ডিসেম্বর ২০০২ থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত মাসব্যাপি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চদশ জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী-২০০২। এতে প্রায় ৬০০ শিল্পীর দেড় হাজার শিল্পকর্ম জমা পড়লেও এর মধ্যে ২৩৮ জন শিল্পীর ২৮৬ ও আমন্ত্রিত বিশিষ্ট শিল্পীদের ১৫ টি সহ মোট ৩০১ টি শিল্পকর্ম স্থান পায়। এর মধ্যে প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন ও রফিকুল্লাহ গাজালীর অসাধারণ ২ টি ক্যালিগ্রাফি বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। শিল্পী আমিনের জিকির শিরোনামে লেখা আল্লাহ শব্দ এবং রফিকুল্লাহ গাজালীর শ্রেষ্ঠত্ব শিরোনামে নির্মিত ক্যালিগ্রাফি দু'টি দর্শক মহলে বেশ সাড়া ফেলে। জলরং, তেলরং, এক্রিলিক ছাপচিত্র, টেম্পেরা, মিশ্র মাধ্যম, গ্রাফিক্স ও ভাস্কর্যসহ নানাবিধ শিল্পকর্মের মাধ্যমে দেশীয় ও স্বকীয় সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন।[৯৯]

তেহরান ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের ৫ ক্যালিগ্রাফার

২০০২ সালের ৩ অক্টোবর ইরানের রাজধানী তেহরানে ২৮ টি দেশের দু'হাজার শিল্পী, ক্যালিগ্রাফার ও গবেষকদের তিন হাজারের অধিক শিল্পকর্ম নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ও সেমিনার। এতে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, লেবানন, ডেনমার্ক, সিরিয়া, মিশর, জাপান, কাতার, কুয়েত, চীন, সুইডেন, আরব আমিরাত, জার্মানী, রাশিয়া, ভারত, তুরস্ক, জর্দান, বাহরাইন, আমেরিকা,

Dhaka University Institutional Repository

আজারবাইজান, সৌদি আরব, মরক্কো, তাজিকিস্তান, নেদারল্যান্ড, লিবিয়া, ও তিউনিসিয়ার শিল্পীগণ অংশগ্রহণ করেন। এ প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ থেকে ক্যালিগ্রাফি সোসাইটির মোট পাঁচজন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন- শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ বারী, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন ও শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম প্রমূখ।[১০০]

এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী

এশিয়া মহাদেশভূক্ত দেশগুলোর অংশগ্রহণে প্রতি দু'বছরে একবার দ্বি-বার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ১২তম প্রদর্শনীটি বাংলাদেশের ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী ৩৩টি দেশের মোট সাড়ে তিনশত শিল্পকর্ম স্থান পায়। যার মধ্যে শুধু বাংলাদেশী শিল্পীদের শিল্পকর্মের সংখ্যা প্রায় দুইশত। প্রদর্শনীতে ইরান তুরস্কের প্রায় ত্রিশটি ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম স্থান পায়। গ্রান্ড প্রাইজ প্রাপ্ত তিন শিল্পীর একজন ছিলেন ইরানের ক্যালিগ্রাফার সেদাঘাত জাব্বারী। তিনি পবিত্র নামসমূহ শিরোনামে ক্যালিগ্রাফি করেন। তিন ভাগে বিভাজিত সোনালী ক্যানভাসে হরফের অস্পষ্ট কম্পোজিশন রয়েছে এর বর্ণগভীরতায়। হরফগত আবদ্ধতার সমষ্টিতে সেসব পবিত্র নাম সহজে পড়া যায় না। আর সহজে পড়াটাও জরুরী নয় বরং শিল্পগত আবেদনটিই এখানে মূখ্য। কারণ শিল্পকর্ম তো আর সংবাদপত্র নয় যে চোখ বুলালেই ম্যাসেজ মিলবে। শিল্পের ম্যাসেজ বাস করে অনেক গভীরে। তাই এটি উপলব্ধি ও করতে হয় অত্যন্ত গভীরে গিয়ে।[১০১]

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক এশিয় চারুকলা প্রদর্শনীতে যে সকল ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। তার প্রত্যেকটি চিত্রই এর জনপ্রিয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলাদেশেও ক্যালিগ্রাফি চিত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এ প্রদর্শনীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল- শিল্পীদের স্বকীয়তা ও বুদ্ধি-কৌশলে উপস্থাপিত দৃষ্টিনন্দিত শিল্পসমূহ। শিল্পের বিন্যাস কিংবা কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অনেক শিল্পে কাব্যিক রূপ আরোপেরও প্রচেষ্টা রয়েছে। ফলে শিল্প কোমলতায় এবং নান্দনিক রসে হয়েছে সমৃদ্ধ। হয়েছে হৃদয়গ্রাহী। ঘনবনরূপ সজ্জা এবং বর্ণের সমারোহ ক্যানভাসকে ঔজস্বিতা দান করেছে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করলে নির্দ্বিধায় বলা যায়- বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিল্পকলার বিশেষ প্রদর্শনী

ইসলামী শিল্পকলার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ১৯৭৮ সালে ৩ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিল ঢাকা জাতীয় জাদুঘরে আয়োজন করা হয় বিশেষ প্রদর্শনীর। পঁচিশ দিন ব্যাপি সরকারি উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ প্রদর্শনীতে মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য ফুটে উঠে। এ প্রদর্শনীতে ১২টি বিষয়ের মোট ৩৪১টি শিল্পকর্ম স্থান পায়। হস্তলিখিত কুরআন, বিভিন্ন ধরনের হস্তখিন, মুঘল মিনিয়েচার, ক্যালিগ্রাফি, জলরংয়ের পেইন্টিং, ডকুমেন্ট, উৎকীর্ণ লিপি, মুদ্রা, স্থাপত্য, পোশাক-পরিচ্ছেদ, অস্ত্র-শস্ত্র ও ডেকোরেটিভ আর্ট ইত্যাদি বিষয়ের প্রায় তিনশত শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। এতে খাজা শামসুদ্দিন মাহমুদ গুলজার ও নাসতা'লিক এবং মুহাম্মদ ইউসুফ নাসতা'লিক ও গুলজার লিপিতে কয়েকটি ক্যালিগ্রাফি কর্ম প্রদর্শন করেন। যা আরবী ক্যালিগ্রাফি ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এ উপলক্ষে 'বাংলাদেশে ইসলামী শিল্পকলা' নামে একটি ক্যাটালগ প্রকাশিত হয় যা সংকলন করেন জাতীয় জাদুঘরের তৎকালীন পরিচালক এনামুল হক।[১০২]

কাতিব-ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও প্রদর্শনী

আরবী হস্তলিখনই মূলতঃ একটি পরিপূর্ণ শিল্প। আর আরবী বর্ণের এ সুদৃশ্য প্যাটার্নের যাত্রা শুরু হয়েছিল কাতিবে ওহীদের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে শিল্পী সবিহ-উল-আলম তাঁর লেখা থেকে রেখা নামক গ্রন্থে বলেন- ১৪০০ বছর আগে যে সকল কাতিব পবিত্র কুরআন শরীফ নকল করতে শুরু করেন তাদের হাতের লেখা ছিল ভারী সুন্দর। সুন্দর হাতের লেখা খুব উচুদরের শিল্পকর্ম হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল। তখন যে কাতিবের হাতের লেখা যত সুন্দর ছিল তাকে তত বড় শিল্পীর মর্যাদা দেওয়া হত। একারণেই হাতের লেখা সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন করার জন্য কাতিবরা দস্তুরমত সাধনা করেছেন। কাতিব হিসেবে যারা শৈলীনির্ভর কাজে নিজেদের প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন এ রকম দু'জন খ্যাতিমান কাতিব হচ্ছেন- মাওলানা গরিবুল্লাহ মাসরুর ইসলামাবাদী ও মাওলানা সিরাজুল হক ইসলামাবাদী।

মাওলানা গরিবুল্লাহ মাসরুর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে পঁচিশ খানা বইয়ের লেখক ও অনুবাদক। তিনি কিতাবাতে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন, 'নেক তাহরির' নামে তিনি একটি মূল্যবান বই লিখেছেন, যাতে হাতে-কলমে আরবী হরফের কয়েকটি শৈলী দেখা যায়। এছাড়া ছোট-বড় দশখানা কুরআনের কপি এদেশীয় নাসখী লিপিতে লিখেছেন। এ কপিগুলো এমদাদিয়া লাইব্রেরি ছাপার ব্যবস্থা করেছে। মাওলানা

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজুল হক ইসলামাবাদীও কিতাবাতে সুখ্যাতি পেয়েছেন। তিনি ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা অনুবাদসহ রিয়াদুস সালেহীনের প্রথম খন্ডের কুরআন ও হাদীসের বাণীকে আরবী নাসখ, সুলুসের মিশ্রিত রূপে লিখেছেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হচ্ছে- ঢাকা বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের মিহরাবের উপর কালিমা, গম্বুজের ভেতর, বাইরে গেটের ওপর আল্লাহু আকবর সহ আরো যেসব ক্যালিগ্রাফি রয়েছে, সেগুলো তিনি ডিজাইন করে দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশে যে সকল শিল্পী ক্যালিগ্রাফি চর্চা করছেন তাদের অধিকাংশই দেশে চর্চা করছেন। কেউ কেউ বিদেশেও আছেন। যেমন- শিল্পী মনিরুল ইসলাম। 'দি ইসপেন্ডার অব ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি' নামক বইটিতে তার কথা বলা হয়েছে। তিনি মাদ্রিদে শিল্পচর্চা করছেন। এছাড়া মাঝে মধ্যে অন্যের ক্যালিগ্রাফিকে কপি করে প্রদর্শনী, ম্যুরাল ইত্যাদি করছেন এমন শিল্পীও রয়েছেন। শিল্পী শামীম শিকদার ঢাকা এয়ারপোর্ট রোডে এবং এয়ারপোর্টের সামনে ক্যালিগ্রাফি ম্যুরাল করেছেন। এ ম্যুরালগুলোয় ব্যবহৃত ক্যালিগ্রাফি অন্য ক্যালিগ্রাফারদের শিল্পকর্ম থেকে কপি করা হয়েছে।

ক্যালিগ্রাফি করতে গিয়ে শিল্পীগণ কুরআন ও হাদীসের বাণী, আরবী প্রবাদ-প্রবচন, কবিতার ছত্র প্রভৃতি ছাড়া শুধুমাত্র হরফ দিয়েও ক্যালিগ্রাফি করেছেন। যাকে 'আল হুরুফিয়াহ' বলা হয়। এভাবে ট্রাডিশনাল ও বিমূর্ত দুই ধারাই ক্যালিগ্রাফির চর্চা এদেশের শিল্পীগণ করছেন।[১০৩]

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লোকজ ক্যালিগ্রাফি

বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি চর্চার কথা বলতে গেলে লোকজ ধারার ক্যালিগ্রাফির কথা উল্লেখ করতে হয়। প্রাচীনকাল থেকে বাংলা লিপিকিারগণ বিভিন্ন পুঁথি পুস্তক লিখতে বা নকল করতে গিয়ে বাংলা বর্ণমালার যে ধরণ ব্যবহার করেছেন সেগুলো আজও কালের সাক্ষী হয়ে নমূনা স্বরূপ আমাদের আর্কাইভস গুলোতে সংরক্ষিত আছে। সাধারণত তালপাতার বা তুলট কাগজে লেখা এসব প্রাচীন লিপি আমাদের হস্তলিপি চর্চার লোকজ ধারার ঐতিহ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এসব লোকজ ধারার লেখাগুলোর মধ্যেও শিল্পগত ব্যতিক্রমের বা বিবর্তনের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। আরবী হস্তলিপির প্রথম দিকে গাছের ডাল, হরিণের চামড়া, পাথর কিংবা শক্ত জিনিসের উপর লিখতে গিয়ে এর যেরূপ ফুটে উঠেছে সেটি কুফিক রীতি নামে পরিচিত। পরবর্তীতে এটি কিছুটা নাসখ লিপিতে বিবর্তিত হয়েছে। এসব কঠিন বস্তুর উপর লেখার সময় কুফিক জালী স্টাইলের ছাপ বেশি লক্ষ্য করা যায়।[১০৪]

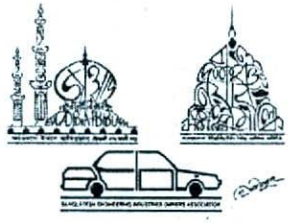

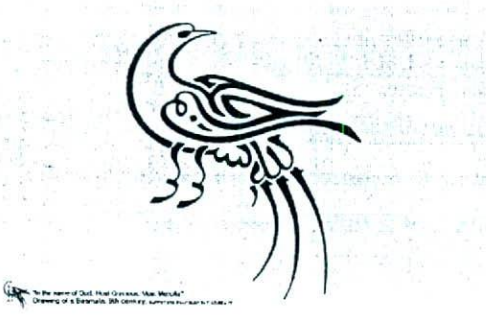

আমাদের জনজীবনে আবহমান কাল ধরে চলে আসা লোকজ সংস্কৃতিতে অবচেতন মনে ক্যালিগ্রাফি চর্চার একটি ঐতিহ্য লক্ষ্য করা যায়। নকশী কাথায়, জায়নামাজে, তালের পাখায়, বালিশের কভারে ফুল লতা-পাতা, নানা জীবজন্তুর ছবি, মসজিদের মিনার ও নানান মটিফ আঁকার পাশাপাশি আল্লাহু, মুহাম্মদ, মা ইত্যাদি লেখা ও ছন্দোবদ্ধ বাণী লেখার সময় এক ধরণের ক্যালিগ্রাফিক ইমেজ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তাল পাতার পাখায় ছিদ্র করে লেখা এবং ধান বা তেতুল বিচি দিয়ে আটার প্রলেপে লেখায়ও চমৎকার

Dhaka University Institutional Repository

লিপিশৈলীর বহু বর্ণিল লোকজ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। পাট শোলা দিয়েও এক ধরণের লেখার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

লোকজ ক্যালিগ্রাফি হাজার বছরের প্রাচীন একটি ধারা। পুঁথিপত্র, মসজিদের নামফলক, কাষ্ঠ খণ্ড ও বাঁশের চাঁচ দিয়ে নির্মিত জিনিসপত্র, ধান ও মাছের আশ দিয়ে বানানো শিল্পকর্ম আমাদের নিকট বেশ পরিচিত। এছাড়া বাস, ট্রাক, রিকশা, অটোরিকশা, টেম্পু, ট্রলার ও জাহাজ সহ বিভিন্ন যানবাহনে কমার্শিয়াল পেইন্টারদের উদ্ভাবিত নান্দনিক আচড়ে আল্লাহ, মুহাম্মদ, বিসমিল্লাহ, কালেমা ও বিভিন্ন দোয়ার ক্যালিগ্রাফি খুব সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদের দেশের পল্লী গ্রামের মেয়েরা সূচিকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ, মুহাম্মদ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ইত্যাদি কাপড়ে ফুটিয়ে তুলেন। তাছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন- কলমদানী, ব্যাগ, শো-পিস, ফুলদানি, তৈজষপত্র এমনকি জামাকাপড়েও ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[১০৫] অনেক সময় গ্রামীন মহিলাদের পিঠা তৈরির কাজেও ক্যালিগ্রাফির মত বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশা ব্যবহার করতে দেখা যায়।

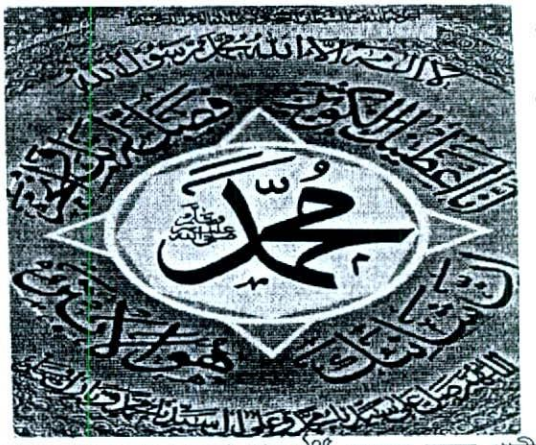

বিশ্ব বিখ্যাত স্থাপত্য শিল্পী লুই আই ক্যান এর নকশায় প্রতিষ্ঠিতবাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন বিশ্ব স্থাপত্য কর্মের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ স্থাপত্য কর্মের মূল আকর্ষণ হলো সংসদ কক্ষ। সংসদের কার্যক্রম শুরু হয় 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' দিয়ে। তাই সংসদের অধিপতি স্পীকারের কুরসির উপরিভাগে স্থাপন করা হয়েছে একটি ঐতিহিসিক শিল্পকর্ম। সেখানে জুট ট্যাপেস্ট্রি শিল্প মাধ্যমে করা হয়েছে বাংলা ক্যালিগ্রাফি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। আর এ শিল্পকর্মটি করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী মরহুম রশিদ চৌধুরী। বাংলাদেশে ট্যাপেস্ট্রি শিল্প মাধ্যমের স্বার্থক প্রয়োগকারী এবং লোকজ ধারার প্রয়োগে পথিকৃৎ শিল্পী রশিদ চৌধুরী তাঁর সমগ্র অর্জনকে ফুটিয়ে তুলেছেন এ শিল্পকর্মে। আর বাংলাদেশে বিসমিল্লাহ শব্দটি শুধু অর্থগত ভাবেই নয় লোকজ অর্থেও এটি শুরুর প্রতীকি মূল্যে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে সমাদৃত।

Dhaka University Institutional Repository

গত শতাব্দীর শেষ দশক হতে প্রিন্ট মিডিয়ায় কারুকাজ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় প্রিন্টিং জগতে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার অনেক বেশি বেড়ে গেছে। শিল্পী আরিফুর রহমান, ইব্রাহীম মন্ডল, বশির মেসবাহ, মুবাশ্বির মজুমদার, আমিনুল ইসলাম, হা.মীম কেফায়েতুল্লাহ, রফিকুল্লাহ গাজালী, মাসুম বিল্লাহ, শাহ ইফতিখার তারিক ও আল মারুফ সহ অনেকে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্যালিগ্রাফির প্রচার, প্রসার ও বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছেন। প্রিন্ট মিডিয়ায় খবরের কাগজ, ক্যালেন্ডার, গিফট আইটেম, ভিউকার্ড ইত্যাদি ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ইবনে সিনা, আইসিএস, সহ বিভিন্ন প্রডাকশন সেন্টার ক্যালেন্ডার, ডায়েরী, ভিউকার্ড ইত্যাদিতে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভাস্কর্যে ক্যালিগ্রাফি

ভাস্কর্য ক্যালিগ্রাফি শিল্পাঙ্গনে এক অনন্য নব সংযোজন ও ইসলামী শিল্পের সর্বোচ্চ আসনে আসীন করার জন্য এক অনুপম মাইলফলক। এটি এমন এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ যা লিপি ফলকের মহত্তের উন্মোচন। রাসূল (সাঃ) বলেছেন 'বুইসতু লিকাছরিল আসনাম'। (আল হাদীস) অর্থাৎ আমি মূর্তির বিনাশ সাধনের জন্যই এ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। অথচ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন সড়কের মোড়ে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ও অফিস আদালতে সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন প্রতিকৃতি গড়ে তোলার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এসব মূর্তি তথা মানুষের প্রতিকৃতি বানিয়ে ঘরে বা বাহিরে কিংবা রাস্তার মোড়ে স্থাপন করা হচ্ছে। অথচ এর বিপরীতে ক্যালিগ্রাফি কেন্দ্রিক ভাস্কর্য হতে পারে। এতে শিল্প সুষমার সঙ্গে যেকোন পরিসরে স্থাপনযোগ্য ত্রি-মাত্রিক পট ও প্রাসঙ্গিকতায় ক্যালিগ্রাফির সৌন্দর্য বিশ্ব শিল্পে সমাদৃত।[১০৬]

এভাবে সম্প্রতি স্থাপিত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সামনে হাইওয়ের মাঝখানে অনবদ্য ভাস্কর্য ক্যালিগ্রাফি শিল্পপ্রেমী দর্শক মহলে রীতিমত অনুভূতির সঞ্চার করেছে। শিল্পাঙ্গনের সামগ্রিক আবহে ভাস্কর্যে ক্যালিগ্রাফির দরজা ক্রমেই উন্মুক্ত হচ্ছে। ইতোমধ্যেই শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল- ইকরা, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, শিল্পী আরিফুর রহমান- আল্লাহ, মুহাম্মদ, আলিফ-লাম-মীম, ও আলিফ বিন্যাস এবং শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন- ইকরা, আলিফ-লাম-মীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম শীর্ষক ক্যালিগ্রাফি ভাস্কর্যের রূপকল্প নির্মাণ করেছেন। বায়তুল মোকাররম মসজিদের প্রতিস্থাপনের জন্য এগুলো তৈরী করা হলেও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের অর্থভীতির কারণে এ মহৎ কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বিশ্বের কুয়েত, সৌদি আরব, দুবাই ও ইরানে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ভাস্কর্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশেও যদি সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সামনে, জনবহুল রাস্তার মোড়ে, সংসদ ভবন চত্বরে, বঙ্গভবন মোড়ে, বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন পার্কের সামনে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করতে ক্যালিগ্রাফি ভাস্কর্য নির্মাণে এগিয়ে আসা যায় তাহলে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব প্রকাশের প্রতিফলন ঘটবে। কারণ এদেশের নব্বই ভাগ মানুষই মুসলমান। আর তা করা হলে এর

শিল্প সুষমা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং শিল্পকলার ক্ষেত্রে সংযোজন হবে আরেকটি নতুন মাত্রা।

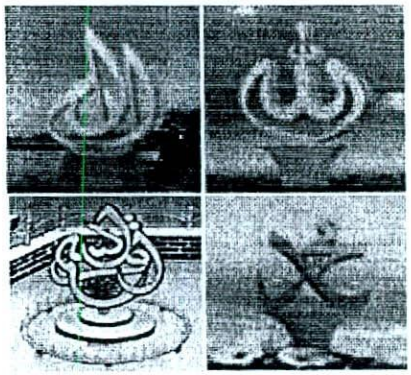

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিমূর্ত ক্যালিগ্রাফি

চারুশিল্প অবচেতন মনের বহিঃপ্রকাশ। কিছু দেখে দুঃখে কিংবা আনন্দে মনের আবেগে যা প্রকাশ হয়ে থাকে। আর শিল্প হলো মনের আবেগ অনুভূতির রং, রেখা ও কর্মের মাধ্যমে নান্দনিক উপস্থাপনা। যার মধ্যে থাকতে হয় রসবোধ। অন্যকথায় শিল্প হলো- সৃষ্টি অথবা আবিষ্কার, অনুকরণ নয়। যা ইলুয়েশন তৈরি করে, দর্শকদের ভাবায়, তাড়িত করে। সম্প্রতি বাংলাদেশের অনুষ্ঠিত এশিয়ান চারুকলা প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত হলেন ইরাকের বিখ্যাত শিল্পী সাদী আল কাবী। তাঁর ছবির বিষয়বস্তু ছিল ক্যালিগ্রাফি- মরুভূমিতে শিলালিপি। ১৯৯১ সালে এশিয়ান চারুকলা প্রদর্শনীতে পাকিস্তানের শিল্পী গুলজীর লিপিশৈলী- ১, ২, ৩, ৪ নামে চারটি ছবি প্রদর্শিত হয়। যা দর্শকদের দৃষ্টি কাড়ে। ক্যানভাসে স্পেচুলা আবার কোথাও ব্রাশ দিয়ে আঁকা তার ছবি মোটা তেলরংয়ে তাঁর যে ব্রাশিং তা দর্শকদের রীতিমত মুগ্ধ করেছে। তাঁর ছবি দেখে মনে হয় যে তা আরবী লেখা কিন্তু কী লেখা তা বুঝা বড়ই দুরূহ।

২০০০ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের চিত্র প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের শিল্পী কালিদাস কর্মকারের যে ছবি পুরস্কার পায় তা ছিল একটি বিমূর্ত ক্যালিগ্রাফি। আরবী ক্যালিগ্রাফির ধারাসমূহ পরোক্ষভাবে সমকালীন নকশা প্রণয়নে বিমূর্ত মুর্তিতে সহায়তা করে। যা এখন পর্যন্ত মনোরমভাবে শব্দের উপস্থাপন এবং হরফের প্রতিস্থাপনা উন্মুক্ত করে উত্তর আধুনিক দুয়ার। এ উদ্দেশ্যেই সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে এবং অন্যান্য ভাষায় ও সংস্কৃতির জন্য ব্যক্ত করে যে, লিখিত শব্দ হচ্ছে- অলৌকিক ক্ষমতার বস্তু এবং লেখার নিয়ম-কানুন হচ্ছে জাদু। যা শুধুমাত্র উস্তাদ ক্যালিগ্রাফারের কলাকৌশল ও দক্ষতার মাঝে সেতু বন্ধন তৈরি করে না। বরং সাথে সাথে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যও সমুন্নত করে। ফলে বিমূর্ত ক্যালিগ্রাফির ক্ষেত্রে শিল্পকলার সেই মূলনীতিটি স্মরণ রাখা উচিৎ-

Dhaka University Institutional Repository

মূর্ত ছবি আঁকতে না জানলে তার বিমূর্ত ছবিমূর্তি আকার অধিকার নেই। অর্থাৎ ক্যালিগ্রাফির মৌলিকজ্ঞান না থাকলে তার জন্য বিমূর্ত ক্যালিগ্রাফি না করাই উত্তম।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাণ্ডুলিপিতে ক্যালিগ্রাফি

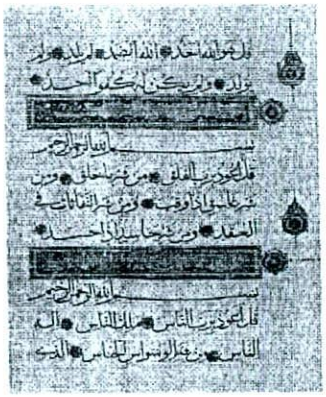

আগেকার দিনে কুরআন শরীফ কিংবা অন্যান্য বই পুস্তক ছাপানো হতো না বরং তা সুন্দর হস্তলিখনের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ বা সংরক্ষণ করা হতো। ফলে তখন সুন্দর হস্তলিখনের কদর ছিল ব্যাপক। শিল্পীরা ক্যালিগ্রাফির বিভিন্ন ফন্টে কুরআন শরীফ কিংবা কোন গ্রন্থ লিখত। যাকে পাণ্ডুলিপি বলা হয়ে থাকে। নিম্নে বিভিন্ন সময়ে লিখিত কিছু পাণ্ডুলিপির সাইজ, লেখার মাধ্যম, ব্যবহৃত ফন্ট, কাতিব ও এগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হলো-

পবিত্র আল কুরআনঃ

- ১৬৮০ সালে খাজা শেখ কর্তৃক ৭-৩/৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৫ ইঞ্চি প্রস্থ নাসখ লিপিতে লিপিবদ্ধ কুরআন। যা উপস্থাপন করেন- সাইয়েদ মাহমুদ তাইফুর। যার প্রথম পৃষ্ঠাটি নীল ব্যাকগ্রাউন্ডে স্বর্ণের এবস্ট্রাক্ট ডিজাইনে সজ্জিত ছিল। যার শিরোনাম গুলোও ছিল স্বর্ণালঙ্কার যুক্ত।
- ৫ মে ১৭২৯ সালে মুহাম্মদ রিজা কর্তৃক ৭-১/৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৪-১/২ ইঞ্চি প্রস্থ নাসখ লিপিতে লিপিবদ্ধ কুরআন। সাইয়েদ মাহমুদ তাইফুর কর্তৃক উপস্থাপিত এ কুরআনের প্রথম ২ টি পৃষ্ঠায় স্বর্ণালী ব্যাকগ্রাউন্ডে ফুলের মোটিফে সজ্জিত ছিল। এর শিরোনাম ছিল স্বর্ণালঙ্কারের মত।
- অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাবজাদা খাজা আহসানুল্লাহ কর্তৃক উপস্থাপিত ১০-৩/৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৬-১/২ ইঞ্চি প্রস্থ কুরআন যা নাসখ লিপিতে লিপিবদ্ধ। যার প্রথম ৪ টি পৃষ্ঠা স্বর্ণালী, লাল, নীল ও সবুজ রংয়ের বিন্যাসে সজ্জিত। ৩য় ৪র্থ পৃষ্ঠার বর্ডারগুলোতে ছিল ফুলের মোটিফ।
- উনবিংশ শতাব্দীতে নাসখী লিপিতে করা ১০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৬-১/২ ইঞ্চি প্রস্থ কুরআনের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। যার কাতিবের নাম জানা যায়নি। যার শুরুর ২ টি পৃষ্ঠা লাল, নীল,

Dhaka University Institutional Repository

কালো ও স্বর্ণালী রংয়ে সজ্জিত। আর বাকী সব পৃষ্ঠাগুলোর আউটলাইন গুলো ছিল নীল ও স্বর্ণালী বর্ণে করা।

- বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে নাসখী লিপিতে করা ১২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৭-৩/৪ ইঞ্চি প্রস্থ কুরআনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপন করেন- গোলাম জিলানী। যার প্রতিটি পৃষ্ঠায় ১৫টি করে লাইন ছিল। এর প্রথম, মাঝখান ও শেষ লাইনগুলো লাল এবং অন্যান্য গুলো কালো রংয়ে সজ্জিত ছিল।
- বিংশ শতাব্দীতে ৩৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৭-৩/৪ ইঞ্চি প্রস্থ কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন- আবুল ফাতহ। এজতেবাউর রহমান খান কর্তৃক উপস্থাপিত পাণ্ডুলিপিটি ছিল নাসখী লিপিতে করা। এর প্রথম অংশটুকু ছিল স্বর্ণালী বর্ণে ও বাকীগুলো ছিল হাল্কা স্বর্ণালী বর্ণে। যার আয়াতগুলো এরাবেস্ক এর উপর অঙ্কিত ছিল।
- বিংশ শতাব্দীতে এজতেবাউর রহমান খান উপস্থাপন করেন- ১-১/৪ ইঞ্চি স্কয়ার সাইজের কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি। যা ছিল নাসতা'লিক লিপিতে লিখিত। যার চতুষ্পার্শ্বের আউটলাইন গুলো ছিল লাল বর্ণের দ্বৈত সারিতে সজ্জিত। আর ভেতরের পৃষ্ঠাগুলো ছিল কমলা, নীল ও স্বর্ণালী বর্ণে সজ্জিত।
- ১৯৭৭ সালে নাসখী লিপিতে ১২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৮-১/২ ইঞ্চি প্রস্থ একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন- জাহানারা বেগম। মেশিন উৎপাদিত পিঙ্ক পেপারে লিপিবদ্ধ এ পাণ্ডুলিপির প্রতি পৃষ্ঠায় কালো বর্ণে ২০ লাইন করে লেখা হয়।

<u>অন্যান্য পাণ্ডুলিপি:</u>

- **শরহ-ই-রুবাইয়াত:** ১৪৭৭ সালে সাইয়েদ মাহমুদ তাইফুর ৮-৫/৮ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৫ ইঞ্চি প্রস্থ একটি পাণ্ডুলিপি উপস্থাপন করেন। এটি একটি পারস্য কাব্যগ্রন্থ। যা রচনা করেন-নূরুদ্দীন আব্দুর রহমান। এটি নাসতা'লিক লিপিতে লিপিবদ্ধ ।
- **মাখযান আল আছার:** ৭-৩/৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৫ ইঞ্চি প্রস্থ নাসতা'লিক লিপিতে লিপিবদ্ধ এ পাণ্ডুলিপি উপস্থাপন করেন- অধ্যাপক এ. বি. এম হাবীবুল্লাহ। এটি ছিল গাঁজা অধিবাসী ইলিয়াস আবু মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন রচিত একটি পারস্য কাব্যগ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

- **শাহনামা:** এজতেবাউর রহমান খানের উপস্থাপিত পাণ্ডুলিপিটি ছিল ৯-১/৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৫-১/৮ ইঞ্চি প্রস্থ। এটি তুস নগরীর আবুল কাশেম ফেরদৌসি কর্তৃক রচিত বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক পারস্য মহাকাব্য। যাতে রয়েছে ষাট হাজার শ্লোক।
- **জুসতান:** ১৬৫০ সালে নাসতা'লিক লিপিতে ১০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৭ ইঞ্চি প্রস্থ একটি পাণ্ডুলিপি উপস্থাপন করেন- এজতেবাউর রহমান খান। যা ছিল সম্রাট শাহজাহানের ব্যক্তিগত কপি। এর মূল রচয়িতা হলেন- শেখ সাদী (১১৮২-১১৯২)।
- **লাতাইফ-ই-আশরাফী:** লাল মুহাম্মদ হোসাইনি মোবারকপুরী ১৭৫৩ সালে নাসতা'লিক লিপিতে ১৩-১/৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৮৩/৪ ইঞ্চি প্রস্থ একটি পাণ্ডুলিপি উপস্থাপন করেন। এটি হাজী গরিব আল ইয়ামেনী কর্তৃক সংকলিত সুফিতত্ত্বের উপর লিখিত একটি গ্রন্থ। যা উপস্থাপন করেন-ড. এম. ই কারীম।
- **ফতওয়ায়ে আলমগীরী:** এটি ৪টি ভলিউমে করা ফিক্‌হ শাস্ত্র তথা আইন বিষয়ক পাণ্ডুলিপি। ১৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৯-১/৪ ইঞ্চি প্রস্থ এ পাণ্ডুলিপি আরবী ভাষায় নাসখী লিপিতে করা হয়। এটি সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের অনুরোধে মোল্লা নিজাম উদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত উলামা বোর্ডের মাধ্যমে এটি সংকলিত হয়।
- **মাকতুল হোসাইন:** বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে পাওয়া যায় এ পাণ্ডুলিপিটি। যার দৈর্ঘ্য ছিল ১২ ইঞ্চি প্রস্থ ছিল ৭ ইঞ্চি । এটি মুহাম্মদ খাঁন রচিত একটি কাব্যকর্ম। যাতে ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের নৃশংস ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।
- **কিফায়াতুল মুসাল্লিন:** এটি মুসলমানদের রীতি ও পদ্ধতির উপর রচিত একটি আরবী পাণ্ডুলিপিটি। যা লিখিত হয়েছিল ১২১৮ সালে। যা পরবর্তীতে ১৬৩৯ সালে শেখ মুত্তালিব বাংলায় অনুবাদ করেন। ১১ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৬-১/২ ইঞ্চি প্রস্থ এ পাণ্ডুলিপিটি চট্টগ্রামে পাওয়া যায়।[১০৭]

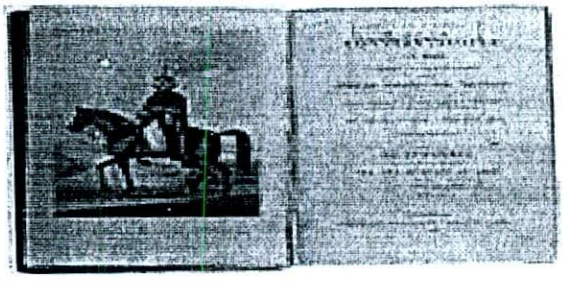

Dhaka University Institutional Repository

নবম পরিচ্ছেদ

উৎকীর্ণ লিপি

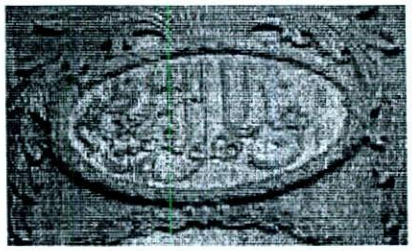

- **আবুল ফজল ইউজবাক এর সিতলম্যাথ উৎকীর্ণ লিপি:** রাজশাহী জেলার সিতলম্যাথ এলাকায় ১২৫৪ সালে আরবী ভাষায় একটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। নাসখী লিপিতে করা এর দৈর্ঘ্য ছিল ১৪-৩/৪ ইঞ্চি ও প্রস্থ ছিল ৫৩-১/২ ইঞ্চি। এটি একটি প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপি। এটি ছিল ইমারত আল মুবারক তথা পবিত্র গঠন যাতে ৪টি লাইন ছিল।[১০৮]
- **জালাল উদ্দীন শাহ এর উৎকীর্ণ লিপি:** ১১ মার্চ ১৪২৭ ঢাকার মান্দ্রায় তুঘরা লিপিশৈলীর একটি উৎকীর্ণ লিপিকর্মের সন্ধান পাওয়া যায়। ২১ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৩০-১/২ ইঞ্চি প্রস্থ এ উৎকীর্ণ লিপিটি প্রথমে স্থাপত্যের জন্য ব্যবহৃত হত।[১০৯]
- **নশ্বালগলী নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ এর উৎকীর্ণ লিপি:** ২৩ জুন ১৪৫৯ ঢাকার নাশ্বালগালী উৎকীর্ণ লিপিটি পাওয়া যায়। ১৩ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ২৩-১/২ ইঞ্চি প্রস্থ এ লিপিটি তুঘরা লিপিতে নির্মিত।
- **রুকন উদ্দীন বরবক শাহ এর তেজপুর উৎকীর্ণ লিপি:** ১৪৫৮ সালে টাঙ্গাইল জেলার তেজপুরে একটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। ২০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ২৩-১/২ ইঞ্চি প্রস্থ এ উৎকীর্ণ লিপিটি তুঘরা লিপিতে করা। এটি ছিল রুকনউদ্দীন বরবক শাহ এর আমলে নির্মিত মসজিদ আল জামিয়াহ এর কালো প্লেটে সংরক্ষিত।

Dhaka University Institutional Repository

- **নাসির উদ্দিন নুসরাত শাহ এর উৎকীর্ণ লিপি:** ১৫৫২ সালে ঢাকার সোনারগাঁয়ে এ উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। যার দৈর্ঘ্য ১৫-৩/৪ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৪৭ ইঞ্চি। এ উৎকীর্ণ লিপিটি তুঘরা লিপিতে করা। এটি একটি মসজিদ এবং তা বায়তুল ছেকায়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- **আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এর সিলেট উৎকীর্ণ লিপি:** ১৫১২ সালে সিলেটে একটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। যার দৈর্ঘ্য ১৩ ইঞ্চি ও প্রস্থ ২৭-১/২ ইঞ্চি। এ উৎকীর্ণ লিপিটি নাসখী লিপিতে করা।
- **সম্রাট জাহাঙ্গীরের করটিয়া উৎকীর্ণ লিপি:** ১৬১০ সালে টাঙ্গাইল জেলার করটিয়ায় ফারসী ভাষায় একটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। যার ১৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৫৩ ইঞ্চি প্রস্থ। এ উৎকীর্ণ লিপিটি নাসতা'লিক লিপিতে করা। যা মেহদী আলী খান পন্নী কর্তৃক উপস্থাপিত।
- **শাহ সুজার বড় কাটরার উৎকীর্ণ লিপি:** ১৬৪৪ সালে ঢাকার বড় কাটরায় আরবী ভাষায় একটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। যার ৫৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৫৬ ইঞ্চি প্রস্থ এ উৎকীর্ণ লিপিটি নাসখী লিপিতে করা। যা উপস্থাপন করেন হাকীম ইরতিজাউর রহমান খান।
- **আওরঙ্গ জেবের উৎকীর্ণ লিপি:** ১৪৮৫ সালে ফারসী ভাষায় একটি উৎকীর্ণ লিপির সন্ধান মিলে সিলেট শহরে। ২৩ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৪৫ ইঞ্চি প্রস্থ এ উৎকীর্ণ লিপিটি নাসতা'লিক লিপিতে করা।
- **সম্রাট মুহাম্মদ শাহের উৎকীর্ণ লিপি:** ১১৫১ সালে বরিশাল জেলার সুতালুরে একটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। ১৬-১/২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৩২-১/২ ইঞ্চি প্রস্থ এ উৎকীর্ণ লিপিটি নাসতা'লিক লিপিতে নির্মিত। যা মসজিদের গঠনের জন্য নির্মিত হয়।
- **সম্রাট শাহ আলমের ফুলচৌকি উৎকীর্ণ লিপি:** ১৭৭২ সালে রংপুর জেলার ফুলচৌকি এলাকায় একটি উৎকীর্ণ লিপিটির সন্ধান পাওয়া যায়। নাসতা'লিক লিপিতে নির্মিত এ উৎকীর্ণ লিপিটির দৈর্ঘ্য ৫৩ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১৩-৩/৪ ইঞ্চি।
- **করটিয়ার কাঠ নির্মিত উৎকীর্ণ লিপি:** ১১ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৫৯-১/২ ইঞ্চি প্রস্থ একটি উৎকীর্ণ লিপি ১৯০৯ সালে টাঙ্গাইল জেলার করটিয়ায় সন্ধান পাওয়া যায়। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ লিপিটি ভারতের কলকাতা জাদুঘরে সংরক্ষিত হয়। যা ছিল নাসখ লিপিতে করা।
- **ইট নির্মিত উৎকীর্ণ লিপি:** সপ্তদশ শতাব্দীতে আরবী ভাষায় কয়েকটি উৎকীর্ণ লিপির সন্ধান মিলে। এ শিল্পকর্মের মাধ্যম ছিল নাসখী লিপি।[১১০]

Dhaka University Institutional Repository

দশম পরিচ্ছেদ

মুদ্রা লিপি

- **দিল্লীর সম্রাট ও সুলতানদের স্বর্ণমুদ্রা:** আলা আল দুনিয়া ওয়াল দ্বীন, ফরিদ আল দুনিয়া ওয়াল দ্বীন (১৫৪০-১৫৪৫) জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮), মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) ও মুহাম্মদ শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬) ইত্যাদির মুদ্রালিপির সন্ধান মিলে।
- **বাংলার সুলতানদের মুদ্রালিপি:** সুলতান ফখরুদ্দিন আদ দুনিয়া ওয়াল দ্বীন, সুলতান সাইফুদ্দিন আদ দুনিয়া ওয়াল দ্বীন এর তৈরিকৃত মুদ্রালিপি।
- **দিল্লীর সুলতানাতের সিলভার মুদ্রা:** গিয়াস আল দুনিয়া ওয়াল দ্বীন আবুল মুজাফ্ফর বলবন (১২৬৬-১২৮৭), মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১), ফরিদ আল দুনিয়া ওয়াল দ্বীন আবুল মুজাফ্ফর শেরশাহ (১৫৪০-১৫৪৫), জালাল আল দুনিয়া ওয়াল দ্বীন আবুল মুজাফ্ফর ইসলাম শাহ (১৫৪৫-১৫৫২), মুহাম্মদ শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮), মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) ও মুহাম্মদ আদিন শাহ (১৫৫২-১৫৫৬) এর মুদ্রালিপি।
- **বাংলার সুলতানদের সিলভার মুদ্রা:** শামস আল দুনিয়া ওয়াল দ্বীন আবুল মুজাফ্ফর ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২), ফখর আল দুনিয়া ওয়াল দ্বীন আবুল মুজাফ্ফর মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯), শামস আল দুনিয়া ওয়াল দ্বীন আবুল মুজাফ্ফর ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭), ইমাম আল আজম আবুল মুজাহিদ সিকান্দর শাহ (১৩৫৭-১৩৮৯), গিয়াস আল দুনিয়া ওয়াল দ্বীন আবুল মুজাফ্ফর আজম শাহ (১৩৮৯-১৪১০), জালাল আল দুনিয়া ওয়াল দ্বীন আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ শাহ (১৪১৫-১৪৩২), নাসির আল দুনিয়া ওয়াল দ্বীন আবুল মুজাফ্ফর মাহমুদ শাহ

Dhaka University Institutional Repository

(১৪০০-১৪৫৯), রোকন আল দুনিয়া ওয়াল দ্বীন আবুল মুজাহিদ বরবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪), জালাল আল দুনিয়া ওয়াল দ্বীন আবুল মুজাফ্ফর ফতেহ শাহ (১৪৮১-১৪৮৭), আলা আল দুনিয়া ওয়াল দ্বীন আবুল মুজাফ্ফর নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩১), গিয়াস আল দুনিয়া ওয়াল দ্বীন আবুল মুজাফ্ফর মাহমুদ শাহ (১৫৫৬-১৫৬০), গিয়াস আল দুনিয়া ওয়াল দ্বীন আবুল মুজাফ্ফর বাহাদুর শাহ (১৫৩২-১৫৩৮), জালাল আল দুনিয়া ওয়াল দ্বীন আবুল মুজাফ্ফর মাহমুদ শাহ (১৫৬০-১৫৬৩) ও দাউদ শাহ কাররানী (১৫৭২-১৫৭৬) এর শাসনামলের মুদ্রালিপি।

- **মুঘল সম্রাটদের সিলভার মুদ্রা:** জহির আল দ্বীন মুহাম্মদ বাবুর পাদশাহ গাজী (১৫২৬-১৫৩০), মুহাম্মদ হুমায়ুন শাহ গাজী (১৫৩০-১৫৪০), জালাল আল দ্বীন মুহাম্মদ আকবর পাদশাহ গাজী (১৫৫৬-১৬০৫), নূর আল দ্বীন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর পাদশাহ গাজী (১৬০৫-১৬২৭), শিহাব আল দ্বীন মুহাম্মদ শাহজাহান পাদশাহ গাজী (১৬২৭-১৬৫৭), মুহি আল দ্বীন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর পাদশাহ গাজী (১৬৫৮-১৭০৭), ফররুখ সিয়ার পাদশাহ (১৭১৩-১৭১৯), মুহাম্মদ শাহ পাদশাহ গাজী (১৭১৯-১৭৪৭) ও মুহাম্মদ শাহ আলম পাদশাহ গাজী (১৭৫৯-১৮০৬) এর মুদ্রালিপি।[১১১]

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ পরিচ্ছেদ

গবেষণামূলক গ্রন্থ, ম্যাগাজিন, পত্রিকা, প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন

১. গ্রন্থ রচনা

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি বিষয়ে গবেষণামূলক প্রথম রচনা লিখেন পারেস ইসলাম সৈয়দ মুস্তাফিজুর রহমান। তাঁর বিভিন্ন রচনা ১৯৭৪-৭৫ সালে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয় তার পিএইচডিকৃত বই 'মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি' এবং শিল্পকলা একাডেমী থেকে 'ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি' শিরোনামে তার আরেকটি বই প্রকাশিত হয় । যা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক প্রথম বই।

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান ইসলামিক আর্টের উপর পিএইচডি করেছেন। তাঁর অসংখ্য রচনার মধ্যে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির উপর আলোকপাত করেছেন। ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'মুসলিম লিপিকলা' শিরোনামে একটি বই প্রকাশিত হয়। তাঁর এ বইটিতে ক্যালিগ্রাফির ইতিহাস, ক্যালিগ্রাফারদের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে।

ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলীর দু'টি বই 'সিলেকট এ্যারাবিক এন্ড পারসিয়ান এপিগ্রাফ' (১৯৮৮) ও 'মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প' (১৯৮৯) নামক দু'টি বই প্রকাশিত হয়। বই দু'টিতে ক্যালিগ্রাফি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর অসংখ্য লেখায় ক্যালিগ্রাফি নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

শিল্পী সবিহ-উল আলম চট্টগ্রাম আর্ট কলেজ এর প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল। ক্যালিগ্রাফির উপর তাঁর দু'টি বই রয়েছে। 'লেখা থেকে রেখা' (১৯৮০) ও 'কারুকাজে জাদুকর' (১৯৮৮) নামে বই দু'টি শিশুদের উপযোগী করে লেখা হলেও মূলতঃ এ বই দু'টি গবেষণামূলক রচনা।

Dhaka University Institutional Repository

২. পত্রিকা-ম্যাগাজিন

- **ক্যালিগ্রাফ আর্ট:** ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ ২০০৩ সালের আগস্ট মাস থেকে ক্যালিগ্রাফ আর্ট নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। মোহাম্মদ আবদুর রহীম সম্পাদিত এ পত্রিকায় ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক প্রতিবেদন, ক্যালিগ্রাফি সোসাইটির নিয়মিত কার্যক্রমের খবর, ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংবাদ, ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক বই পরিচিতি, বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফারদের পরিচিতি ও তাদের শিল্পকর্ম, হাতে কলমে ক্যালিগ্রাফি শিক্ষা সহ উৎসাহ ও প্রণোদনামূলক এ পত্রিকাটি নতুনদের মাঝে আশার প্রদীপ জ্বালিয়েছে। পত্রিকাটির মূল্য- ৫ টাকা। সত্যিই এটি যেন সত্য ও সুন্দরের বাহক ও সৌন্দর্যের নির্মল আধার এবং সুরুচিপূর্ণ শিল্পের প্রচার মাধ্যম।
- **শৈল্পিক:** সেন্টার ফর এশিয়ান ইসলামিক আর্ট এন্ড কালচার (কায়াক) 'শৈল্পিক' নামে একটি পত্রিকা বের করে যাতে ইসলামী শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, শিল্প সমালোচনা, ক্যালিগ্রাফারদের সাক্ষাৎকার এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীর উপর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। যা ক্যালিগ্রাফির প্রচার ও প্রসারে আরেকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

৩. প্রবন্ধ সমূহ

বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও জার্নালে ক্যালিগ্রাফি বিষয়ের উপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল লেখা প্রকাশিত হয়। নিম্নে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো-

- আরবী লিপি ও ইসলামী হস্তলিপিকলা- ড. আবদুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯১
- ইসলামী ক্যালিগ্রাফির উৎস ও প্রকাশ- সাইফুল ইসলাম, সাহিত্য সংস্কৃতি স্মারক-১৯৯৬, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা
- ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি ঃ উৎস ও সাংস্কৃতিক বিকাশ- সাইফুল ইসলাম, দৈনিক সংগ্রাম, ৪ঠা এপ্রিল-১৯৯৭
- ২৬ শে এপ্রিল-১৯৯৭, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১লা জুলাই-১৯৯৭, শিকড় ম্যাগাজিনে এবং প্রেক্ষণের মার্চ-১৯৯৮ সংখ্যায় একই শিরোনামে লেখাটি পুনঃ প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- কম্পিউটার গ্রাফিক্স ক্যালিগ্রাফি ও মৌলিকতার প্রশ্ন- আমিন আল আসাদ, দৈনিক ইনকিলাব- ৮ জুলাই-২০০০
- ক্যালিগ্রাফিতে নারী- মহিউদ্দিন আহমেদ, দৈনিক ইনকিলাব, ৬ জুন-২০০৬
- আরবী ক্যালিগ্রাফির শৈলী বিষয়ক কথাকতা- মোহাম্মদ আবদুর রহীম, দৈনিক সংগ্রাম, ১৫ নভেম্বর-২০০৬
- আরবী ক্যালিগ্রাফিতে নাসখী লিপি- মোহাম্মদ আবদুর রহীম, দৈনিক সংগ্রাম, ১৮ জুন ২০০৪
- বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চা : প্রয়োজন ঐতিহ্য আর আধুনিকতার সম্মিলন- আরিফুর রহমান, দৈনিক ইনকিলাব, ৩ জুন-২০০২
- সমকালীন ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- মোহাম্মদ আবদুর রহীম, দৈনিক সংগ্রাম, ১৪ অক্টোবর-২০০৫
- বিশ্বাসী মায়েদের হাতে ক্যালিগ্রাফি কুরআন- মোহাম্মদ আবদুর রহীম, দৈনিক সংগ্রাম, ৮ ডিসেম্বর-২০০৬
- ইসলামী ক্যালিগ্রাফিতে মুহাম্মদ শব্দের নান্দনিক উপস্থাপন- মোহাম্মদ আবদুর রহীম, দৈনিক সংগ্রাম, ২৬ জুলাই-২০০৬
- শিল্পকলার নামে কাব্যকলা- ইবনে সাইজ উদ্দিন, দৈনিক সংগ্রাম, ৮ইং আগস্ট-২০০৪
- ক্যালিগ্রাফি শিল্পের কথা সূত্র খাত আততাহীয়ে ইরান- দৈনিক সংগ্রাম, ১১ জানুয়ারি-২০০৫
- ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ইতিহাস- ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক মাহজুবাহ- জানুয়ারি-২০০৬ অনুকরণে প্রকাশিত ক্যাটালগ
- সংস্কৃতি ও ক্যালিগ্রাফি- ইব্রাহীম মন্ডল, জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্মারক-২০০৬
- ইসলামী শিল্পকলা ও ক্যালিগ্রাফি- ইব্রাহীম মন্ডল, ছাত্রসংবাদ সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা-২০০৩
- ইসলামী ক্যালিগ্রাফি সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা- দৈনিক ইত্তেফাক ধর্ম ও জীবন বিভাগ
- ইলাহে খাতামী আধুনিক ক্যালিগ্রাফিতে ইরানী মহিলা ক্যালিগ্রাফার- মোহাম্মদ আবদুর রহীম, দৈনিক সংগ্রাম, ১ জানুয়ারি-২০০৬
- চাঁদের বুকে আজান ও কালেমা শরীফের অনুপম ক্যালিগ্রাফি- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর

Dhaka University Institutional Repository

- কোরআনের হস্তলিপি- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর
- যেদিন মানুষ বলবে পালাব কোথায়- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর, ২ ডিসেম্বর ২০০৫
- ক্যালিগ্রাফি নান্দনিক বর্ণবিন্যাস- সাঈদ আহমেদ, দৈনিক ইনকিলাব, ১ নভেম্বর-২০০২
- ক'জন ক্যালিগ্রাফারকে নিয়ে কয়েক টুকরো কথা- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর, ২৬ মে-২০০৬
- মুমিনের বুকে কালেমার শিকড়- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর
- শিল্পের সাতকাহন- হা.মীম কেফায়েতুল্লাহ
- নান্দনিক ক্যালিগ্রাফি- আরিফুর রহমান, দৈনিক যুগান্তর, ২৬ জুন-২০০৯
- ইসলামী ক্যালিগ্রাফি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ- মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, সাহিত্য সংস্কৃতি, সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা-২০০১
- শিল্পকলার সৃজনশীলতা- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর
- মৌচাকে আল্লাহ নামের ক্যালিগ্রাফি- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর
- মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর
- ইরানের মালিক মিউজিয়াম- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর
- সৃষ্টির প্রতীক সবুজ- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর
- মানবদেহের নিদর্শন: যে নিজেকে চিনেছে সে আল্লাহকে চিনেছে- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর
- ক্যালিগ্রাফি শিল্পের অতীত বর্তমান- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক খবরপত্র, ১৭ মে-২০০৬
- স্বর্ণমুদ্রার লেখা কালিমা তায়্যিবা- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর, ৯ ডিসেম্বর-২০০৫
- অ্যারাবেস্কু ও ক্যালিগ্রাফি শিল্পের অগ্রগতি- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর
- তাঁর সৃষ্টির কোন অসঙ্গতি নেই- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর, ১১ নভেম্বর-২০০৫
- সূর্যের আলো থেকে রংধুন ছিটকে পড়ে- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর, ১১ নভেম্বর-২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

- ভূ-পৃষ্ঠের নিদর্শন- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর
- প্রকৃতি আল্লাহর জিকির করে- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর
- ক্যালিগ্রাফারদের সামাজিক মর্যাদা- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর
- নীল এ আর্মস্ট্রং যখন চাঁদে- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর, ২১ এপ্রিল-২০০৬
- বাংলাদেশে কুরআন চর্চায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ভূমিকা- মোহাম্মদ আবদুর রহীম, দৈনিক সংগ্রাম
- ক্যালিগ্রাফির অতীত-ভবিষ্যত- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর
- কুরআনের শৈল্পিক ক্যানভাসে মানব জীবন- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর, ১৭ ফেব্রুয়ারি-২০০৩
- শিল্প সাহিত্য সমৃদ্ধ দেশ ইরান- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর, ২৪ নভেম্বর-২০০৬
- ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্পের বিকাশ ও বর্তমান সমাজে প্রভাব- ইব্রাহীম মন্ডল, মাসিক তানযীমুল উম্মাহ
- ইরানের ইসলামী ক্যালিগ্রাফি এবং এর সমকালীন বৈশিষ্ট্য সমূহ- ইরানী সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত প্রচারপত্র
- ইসলামী ক্যালিগ্রাফিতে কুফী লিপি- দৈনিক বাংলাবাজার, ১৮ই জুলাই-১৯৯৭
- ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- দৈনিক সংগ্রাম, ১লা আগস্ট-১৯৯৭
- ইসলামিক ক্যালিগ্রাফিতে বাসমালাহ ঃ সাংস্কৃতিক প্রভাব ও প্রেক্ষিত- সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ৫ ডিসেম্বর-১৯৯৭
- ইসলামিক ক্যালিগ্রাফিতে থুলুত লিপি- দৈনিক বাংলাবাজার, ৩রা এপ্রিল-১৯৯৮
- কাশ্মীরের ক্যালিগ্রাফার ও ক্যালিগ্রাফি- দৈনিক বাংলাবাজার, ১৭ই এপ্রিল-১৯৯৭
- ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি ঃ প্রাথমিক পর্যায়- দৈনিক বাংলাবাজার, ১৯শে জুন-১৯৯৭
- ইসলামিক ক্যালিগ্রাফিতে মাগরিবী লিপি- দৈনিক বাংলাবাজার, ১০ই জুলাই-১৯৯৭
- ক্যালিগ্রাফি শিল্পের প্রভাবেই বিমূর্ত শিল্পের উৎপত্তি- দৈনিক বাংলাবাজার, ২৪ই জুলাই ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

- ধারাবাহিক রচনা হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাসিক অগ্রপথিক পত্রিকার অক্টোবর-১৯৯৯ সংখ্যায় 'ইসলামী ক্যালিগ্রাফি যুগে যুগে'
- আল আকলাম আস সিত্তাহ- মাসিক অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর-১৯৯৯
- ইসলামিক ক্যালিগ্রাফিতে রং ও হরফ বিন্যাস- মাসিক অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর-১৯৯৯
- ক্যালিগ্রাফির দুই জনক - মাসিক অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর-২০০০
- শেকড়ের সন্ধানে- মাসিক অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ-২০০১
- আরবী হরফের ক্যালিগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য- মাসিক অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর-২০০১
- গোঁড়ার কথা- মাসিক অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি-২০০২
- টেকনিক ও পরিভাষা- মাসিক অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ-২০০২
- তাশকীল- মাসিক অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল-২০০২
- যন্ত্রপাতি ও উপাদান- মাসিক অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন-২০০২
- স্থাপত্যে ক্যালিগ্রাফি- দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ শে জুন-২০০২
- শিল্পী আরিফুর রহমানের ক্যালিগ্রাফি- দৈনিক সংগ্রাম ,১৯ শে জুলাই-২০০২
- চব্বিশ শিল্পীর ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ঃ বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের উত্থান- অগ্রপথিক, আগস্ট-২০০২
- শিলালিপি ও মুদ্রায় ক্যালিগ্রাফি
- ফার্সী লিপিকলা ঃ উৎপত্তি ও বিকাশ- আহমদ আলী ও আ. ক. ম. আবদুল কাদের- ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর-১৯৯৭
- তুঘরা লিপিশৈলী ঃ উৎপত্তি ও বিকাশ- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, জুন-১৯৯৮
- বাংলায় বিভিন্ন আরবী লিখনশৈলীর ব্যবহার ঃ একটি সমীক্ষা- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, জুন ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

- ইসলামী ক্যালিগ্রাফির উৎস ও বিকাশ ঃ সাম্প্রতিক তৎপরতা- মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, দৈনিক সংগ্রাম, ৩১শে জুলাই-১৯৯৮
- বাংলাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই আগস্ট-১৯৯৮
- বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চা- দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ই সেপ্টেম্বর
- ইসলামী ক্যালিগ্রাফি ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ- শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, ত্রৈমাসিক প্রেক্ষণ, জুলাই-সেপ্টেম্বর-১৯৯৮
- এ লেখাটির কপি দৈনিক বাংলাবাজার -২০০০ ও স্বদেশ সংস্কৃতি পত্রিকা-২০০১ এ ছাপা হয়
- ক্যালিগ্রাফিঃ ইসলামী শিল্পকলার গোঁড়ার কথা- সাহিত্য সংস্কৃতি স্মারক, জুলাই-২০০০
- একুশ শতকের ক্যালিগ্রাফি শিল্প ঃ শিল্পীদের করণীয়- সাহিত্য সংস্কৃতি স্মারক, সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা-২০০১
- ইব্রাহীম মন্ডলের ইসলামী শিল্প-সৌকর্যের অনুপম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী- সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা-২০০১
- ইসলামী ক্যালিগ্রাফি: সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা- আলাউদ্দিন রুমি, দৈনিক ইনকিলাব
- কুরআন বিজ্ঞান ও ক্যালিগ্রাফি- দৈনিক যুগান্তর, ১লা আগস্ট-২০০৮
- ক্যালিগ্রাফি চর্চার কলাকৌশল- দৈনিক যুগান্তর, ১১ই জুন-২০০০
- বাংলা বর্ণমালায় ক্যালিগ্রাফি- দৈনিক যুগান্তর, ১৯ শে জুন-২০০১
- আরবী ক্যালিগ্রাফির কলাকৌশল- দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ই সেপ্টেম্বর-২০০১
- আল কুরআনের লিপিবৈচিত্র- দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ই সেপ্টেম্বর-২০০১
- বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফির চর্চা, প্রয়োজন ঐতিহ্য আর আধুনিকতার সম্মিলন- দৈনিক ইনকিলাব, ৩রা জুন-২০০২ ও দৈনিক যুগান্তর, ৭ই জুন-২০০২
- ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অবদান ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী- শরীফ আব্দুল গোফরান, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১২ মে-২০০৬
- বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি শিরোনামে দু'টি ম্যাগাজিনে দু'জন লেখক বিশ্লেষণধর্মী রচনা লিখেছেন

Dhaka University Institutional Repository

- 'অনন্যা' ঈদ সংখ্যা-২০০০-এ লিখেছেন কুদরত-ই-মাওলা এবং 'অন্য দিন' জুন-২০০০ সংখ্যায় লিখেছেন মোমিন রহমান
- শিল্পী আরিফুর রহমানের ক্যালিগ্রাফি একটি পর্যালোচনা- নাসির মাহমুদ, দৈনিক ইনকিলাব, ১০ই জুন-২০০০
- অলংকরণ বিদ্যায় আরবী লিখনশৈলী- মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, মাসিক নিউজ লেটারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত
- ইব্রাহীম মন্ডলের হস্তলিখন শিল্প- সৈয়দ আলী আহসান, ক্যাটালগ: ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-১৯৯৯
- ২০০০ সালে অনুরূপ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর ক্যাটালগে ড. নাজমা খান মজলিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা ছাপা হয়
- ২০০১ সালে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের আয়োজিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর ক্যাটালগে শিল্পীর সবিহ-উল আলমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষণমূলক লেখা ছাপা হয়
- বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চা, ড. আব্দুস সাত্তার, ক্যাটালগ: পঞ্চম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর-২০০২
- ক্যালিগ্রাফি অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পকর্ম- সাহেদ আহমেদ চৌধুরী, দৈনিক যুগান্তর, ১২ই আগস্ট-২০০২
- শিল্পী আরিফুর রহমানের ক্যালিগ্রাফি ঐতিহ্য সমর্পিত- নাজমুল হায়দার, মাসিক কলম, আগস্ট-অক্টোবর ২০০২

প্রতিবেদন

- ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান সাহিত্য সংস্কৃতি, সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা-২০০৪
- ১০ শিল্পীর অংশগ্রহণে চতুর্থ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে- শরীফ বায়েজিদ মাহমুদ, সাহিত্য সংস্কৃতি, সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা-২০০১
- ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের নিয়মিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর তিন বছর- মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, সাহিত্য-সংস্কৃতি' স্মারক-২০০০

Dhaka University Institutional Repository

- চব্বিশ শিল্পীর ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী- আতিক হেলাল, দৈনিক ইনকিলাব, ২৪শে মে-২০০২
- জাতীয় যাদুঘরে আকর্ষণীয় পঞ্চম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ঃ এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন- অধ্যাপক মীর মুহাম্মদ রেজাউল করিম, দৈনিক সংগ্রাম, ২৪শে মে ২০০২
- নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী- শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি
- দ্বাদশ দ্বি-বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনীর ক্যালিগ্রাফি- মানাম মায়মুন, ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি
- নান্দনিকতায় সমৃদ্ধ ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫- অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম, দৈনিক সংগ্রাম, ১৯ জুন-২০০৫
- দশ শিল্পীর ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ঃ একটি পর্যালোচনা- আদনান মালেক, দৈনিক সংগ্রাম
- মোহাম্মদ আবদুর রহীমের দুবাইয়ের আন্তর্জাতিক আরবী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ২০০৬ শিল্পাঙ্গনে আলোড়ন তুলেছে- দৈনিক সংগ্রাম, ৫ এপ্রিল-২০০৬
- ক্যালিগ্রাফি শিল্পী আবদুর রহীমের সাক্ষাৎকার- সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ২০শে সেপ্টেম্বর-২০০২
- হা. মীম কেফায়েতুল্লাহর ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪ ক্যালিগ্রাফি শ্রেষ্ঠদের শীর্ষশিল্প- দৈনিক সংগ্রাম, ২০ জুন-২০০৫
- পবিত্র কুরআন এবং ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বর্ণাঢ্য প্রদর্শনী- আতিক হেলাল, দৈনিক নয়াদিগন্ত ২৮ সেপ্টেম্বর-২০০১
- পবিত্র কুরআন এবং ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বর্ণাঢ্য প্রদর্শনী- আতিক হেলাল, দৈনিক নয়াদিগন্ত ১২ জানুয়ারি-২০০৭
- নগর জুড়ে চারুকলার প্রদর্শনী, শিল্পীদের রং তুলিতে উদ্ভাসিত হয়েছে স্বদেশ স্বকালের স্বরূপ- আশিষ-উর-রহমান শুভ, দৈনিক জনকণ্ঠ
- নতুন ধারার ক্যালিগ্রাফার আমিনুল ইসলাম- শাকের হোসাইন শিবলী, দৈনিক যুগান্তর
- গোলাপ ফোটার সময় ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর
- আত্মার প্রতিচ্ছবি ক্যালিগ্রাফির অনিন্দ্য সুন্দর প্রদর্শনী ঢাকায়- দৈনিক যুগান্তর

Dhaka University Institutional Repository

- অনিন্দ্য সুন্দর ক্যালিগ্রাফিতে মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি- শাহাবুদ্দীন চৌধুরী, দৈনিক আমার দেশ, ৭ মে-২০০৬
- জাতীয় জাদুঘরে আকর্ষণীয় ৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন- অধ্যাপক মীর মোঃ রেজাউল করিম, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ২৪ মে-২০০২
- নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী একটি পর্যালোচনা- মহিউদ্দিন সুমন, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ মে-২০০৬
- ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ২০০৫ শিল্পের নান্দনিক ভূবনে- ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী- দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৪ জুন-২০০৫
- নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী- ইব্রাহীম মন্ডল, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২২ মে-২০০৬
- তেহরানের আন্তর্জাতিক কুরআন প্রদর্শনী- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর, ১লা জুলাই-২০০৫
- ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত ৯ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ২০০৬- অধ্যাপক মীর মোঃ রেজাউল করিম, দৈনিক সংগ্রাম, ১৭ মে ২০০৬
- ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪ প্রাণস্পর্শী চিত্রিত শিল্পায়ন- হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, দৈনিক খবর পত্র
- ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে নবম আরবী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী- সাদেক খান, দৈনিক খবরপত্র, ১০মে-২০০৬
- The Splender of Islamic calligraphy- Star Art & Entertainment, The Daily Star, 27 December-2010
- সংস্কৃতির সাথে নগ্নতা ও অশ্লীলতার কোন সম্পর্ক নেই- দৈনিক সংগ্রাম, ২ জুন-২০০৪
- পঞ্চদশ জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী-২০০২: ইসলামী ক্যালিগ্রাফি, দৈনিক যুগান্তর
- বাংলাদেশের ইসলামী ক্যালিগ্রাফির একটি গ্রহণযোগ্য পরিবেশ তৈরি হয়েছে- দৈনিক সংগ্রাম
- মতামত: অজ্ঞতার কারণেই ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রতি এই অবজ্ঞা- সাইফুল ইসলাম, দৈনিক ইনকিলাব
- বাংলায় ক্যালিগ্রাফি করা যায় কি না সেই প্রচেষ্টায় আছি- শিল্পী আরিফুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. Rihla Ibn Batuta- English,Tr. Agha Mahdi Hussain Baroda, 1953 P.-35

২. Memories Archaeological Survey of India No- 29, Specimen No- 3

৩. S Ahmed. IB, Fig- 26

৪. Selection Arabic and Parsian Epigraph & Ibid- Dr. AKM Yaqub Ali, Fig-35

৫. EIM 1933-34, P.- 45, Plate-11, Vol-4, P.-203, Fig- 46, APE, P.-35-36

৬. মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা- ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, ২৫ জুন-১৯৯৬, পঞ্চম সংস্করণ, রাজশাহী, পৃ-২৯৩

৭. প্রবন্ধঃ ইসলামী ক্যালিগ্রাফি ও শিল্পকলা- ইব্রাহীম মন্ডল, ছাত্র সংবাদ- সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা-২০০৩

৮. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, অক্টোবর-২০০২, ঢাকা, পৃ-৬৩

৯. ক্যাটালগঃ ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

১০. The Daily Star, 27 December-2010

১১. মুসলিম ক্যালিগ্রাফি- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-১৫৩

১২. প্রবন্ধঃ শ্রেষ্ঠদের শীর্ষশিল্প- হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, দৈনিক সংগ্রাম, ২০ জুন-২০০৪

১৩. মুসলিম ক্যালিগ্রাফি- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-১৫৪

১৪. আব্দুস সাত্তারের শিল্পকর্ম- ঢাকা, অক্টোবর-২০০২, পৃ-১০২

১৫. মুসলিম ক্যালিগ্রাফি- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-১৫৪

১৬. ক্যাটালগঃ ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

১৭. ক্যাটালগঃ ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

১৮. মুসলিম ক্যালিগ্রাফি- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-১৫৪

১৯. প্রতিবেদনঃ ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪-অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, সাহিত্য সংস্কৃতি, সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা-২০০৪

২০. ক্যাটালগঃ ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

২১. মুসলিম ক্যালিগ্রাফি- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ঢাকা, ২০০৫,পৃ-১৫৫

২২. ক্যাটালগ: ৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

২৩. ক্যাটালগ: ৫ম ও ৬ষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২-০৩, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

২৪. ক্যাটালগ: ৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

২৫. ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

২৬. প্রাগুক্ত

২৭. www.syfulart.com

২৮. ক্যাটালগ: ৮ম ও ৯ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫-০৬, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

২৯. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, অক্টোবর-২০০২, ঢাকা

৩০. ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৩১. প্রাগুক্ত

৩২. ক্যালিগ্রাফ আর্ট- ১ম সংখ্যা, আগস্ট-২০০৩, ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ, ঢাকা

৩৩. ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৩৪. মুসলিম ক্যালিগ্রাফি- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-১৫৭

৩৫. ক্যাটালগ: ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৩৬. প্রবন্ধ: শ্রেষ্ঠদের শীর্ষশিল্প- হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, দৈনিক সংগ্রাম, ২০ জুন-২০০৪

৩৭. দৈনিক মানবজমিন-১৮ফেব্রুয়ারি-২০০০

৩৮. মুসলিম ক্যালিগ্রাফি- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-১৫৯

৩৯. ক্যাটালগ: বশির মেসবাহ'র একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, ঢাকা

৪০. ক্যাটালগ: ৬ষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৩, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৪১. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, অক্টোবর-২০০২, পৃ-৭৩

৪২. ক্যাটালগ: ৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৪৩. ক্যাটালগ: ৬ষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৩, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৪৪. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, অক্টোবর-২০০২, পৃ-৭৫-৭৬

৪৫. ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. প্রবন্ধ: ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও বিকাশ- নাসির উদ্দিন আহমেদ খান

৪৭. প্রবন্ধ: ক্যালিগ্রাফিতে নারী- মহিউদ্দিন আহমাদ, দৈনিক ইনকিলাব, ৬ জুন-২০০৬

৪৮. ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৪৯. মুসলিম ক্যালিগ্রাফি- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-১৬২

৫০. মুসলিম ক্যালিগ্রাফি- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-১৬১

৫১. ক্যাটালগ: ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৫২. প্রাগুক্ত

৫৩. প্রাগুক্ত

৫৪. ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫ম, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৫৫. ক্যাটালগ: ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৫৬. ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৫৮. সংশ্লিষ্ট শিল্পীর নিকট প্রেরিত প্রশ্নপত্রের উত্তরের আলোকে

৫৯. অত্র প্রতিষ্ঠানের ক্যালিগ্রাফি প্রশিক্ষক শিল্পী এইচ এম আবদুল্লাহ আল মামুনের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য

৬০. অত্র প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত ক্যালিগ্রাফি ক্লাসে প্রশিক্ষণ দান, সরাসরি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ ও প্রদর্শনী পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য

৬১. শিল্পী বশির মেসবাহ ও আবুদ দারদা মুহাম্মদ নূরুল্লাহর সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য

৬২. প্রতিষ্ঠানের পরিচালক শিল্পী আমিরুল হকের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য

৬৩. প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল শিল্পী আরিফুর রহমানের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য

৬৪. প্রতিষ্ঠানের পরিচালক শিল্পী মাহবুবুল ইসলাম বাবুর সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য

৬৫. সিলেবাস, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৬৬. সিলেবাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৬৭. অত্র সংগঠনের অফিস ও ক্লাস পরিদর্শন এবং এর সভাপতি ও সেক্রেটারীর সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

৬৮. প্রতিবেদন: ক্যালিগ্রাফির ঐতিহ্যিক বলয়- ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা

৬৯. Islamic Art- Edited by Dr. Nazimuddin Ahmeds, Dr. Syed Mahmdul Hasan-2007, Dhaka, P-13-17

৭০. ইরানী সংস্কৃতি কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য

৭১. প্রতিবেদন- সেন্টার ফর এশিয়ান ইসলামিক আর্ট এন্ড কালচার আয়োজিত ১ম নবীন শিল্পী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী- মিরাজ রহমান, ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি, জুন-২০০৬

৭২. ক্যাটালগ: ১ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-১৯৯৮, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৭৩. প্রদর্শনীর আহবায়ক শিল্পী ইব্রাহিম মন্ডলের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য

৭৪. ক্যাটালগ: ৩য় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০০, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৭৫. প্রদর্শনীর আহবায়ক শিল্পী ইব্রাহিম মন্ডলের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য

৭৬. ক্যাটালগ: ৫ ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৭৭. ক্যাটালগ: ৬ষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৩, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৭৮. ক্যাটালগ: ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৭৯. ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৮০. ক্যাটালগ: ৯ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৬, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৮১. ক্যাটালগ: ১০ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৮, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৮২. বার্ষিক প্রতিবেদন- সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, সাহিত্য সংস্কৃতি, সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা-২০১১, এপ্রিল, পৃ-৩৯৪

৮৩. ক্যাটালগ: বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৩, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৮৪. ক্যাটালগ: বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৮৫. দৈনিক আজকের কাগজ, ২৭ ফেব্রুয়ারি-২০০৭

৮৬. প্রবন্ধ: একজন বটবৃক্ষ- মোহাম্মদ আবদুর রহীম, ক্যালিগ্রাফ আর্ট, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আগস্ট-২০০৩, ঢাকা

৮৭. ক্যাটালগ: শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডলের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-১৯৯৯

৮৮. ক্যাটালগ: শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৩

৮৯. ক্যাটালগ: বশির মেসবাহ'র একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

৯০. Catalogue: Calligraphy of Aminul Islam Amin, 3rd Solo Caqligraphy Exhibition, Dhaka-2008

৯১. ক্যাটালগ: শিল্পী ফেরদৌস আরা আহমেদের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৮

৯২. Catalogue: Calligraphy on Quranic cosmology by sayed Zulfiquar Zahur, Dhaka-2009

৯৩. প্রতিবেদন: তা'মীরুল মিল্লাতে পোস্টার ও ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত- দৈনিক সংগ্রাম, ১৮ জানুয়ারি-২০০৪

৯৪. ক্যাম্পাস আয়োজন, মাসিক ব্যতিক্রম, ডিসেম্বর-২০০১

৯৫. The Splender of Islamic calligraphy- Star Art & Entertainment, The Daily Star, 27 December-2010

৯৬. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১২ই জানুয়ারি-২০০৭

৯৭. প্রতিবেদন: পবিত্র কুরআন ও ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বর্ণাঢ্য প্রদর্শনী- দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ সেপ্টেম্বর-২০০১

৯৮. প্রচারপত্র: মহিমান্বিত কুরআন প্রদর্শনী, ঢাকা, ২০০৫

৯৯. নগর জুড়ে চারুকলার প্রদর্শনী, শিল্পীদের রং-তুলিতে উদ্ভাসিত হয়েছে স্বদেশ স্বকালেরর স্বরূপ, আশীষ উর্ হমান, দৈনিক জনকণ্ঠ

১০০. ক্যালিগ্রাফ আর্ট, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আগস্ট-২০০৩, ঢাকা

১০১. প্রতিবেদন-১২তম দ্বি-বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী ক্যালিগ্রাফি প্রসঙ্গে- মানাম মায়মুন, ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি, জুন -২০০৬

১০২. Catalogue of the special exhibition of Islamic Art in Bangladesh, Dacca museum, 3-28 April-1978

১০৩. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, অক্টোবর-২০০২, ঢাকা, পৃ-৭৯

১০৪. প্রবন্ধ: বাংলা ক্যালিগ্রাফি ও ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক ভাবনা, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, স্মারক-ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, জুলাই-২০০২, পৃ-১২৪-১২৫

১০৫. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, অক্টোবর-২০০২, ঢাকা, পৃ-৭৯

১০৬. ক্যাটালগ: আরিফুর রহমানের ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী- ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

১০৭. বাংলাদেশে ইসলামী শিল্পকলা, এনামুল হক, জাতীয় জাদুঘর, এপ্রিল-১৯৭৮, ঢাকা, পৃ-১৭-২০

১০৮. বাংলাদেশ ললিতকলা, সংখ্যা-১, নং- ২, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ-৯১-৯৪

১০৯. জার্নাল: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ ললিতকলা, ঢাকা, ১৯৫২, প-১৬৫

১১০. প্রাগুক্ত, পৃ-২৪-২৬

১১১. প্রাগুক্ত, পৃ-২৭-২৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আরবী ক্যালিগ্রাফির প্রভাব

সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ

বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের কৃতিত্ব

বাংলাদেশের শিল্পকলায় এক মহান ধারা

ক্যালিগ্রাফি সত্য ও সুন্দরের পথ প্রদর্শক

ক্যালিগ্রাফি রুচিবোধের বহিঃপ্রকাশ

অন্তর্নিহিত রহস্যের উদঘাটন

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আরবী ক্যালিগ্রাফির প্রভাব

মানুষ স্বভাবতই সৌন্দর্য প্রিয়। আর তাই মানুষ শিল্পের প্রতি এত বেশি আসক্ত। মানুষের শিল্প চেতনা যদি হয় নেতিবাচক তাহলে তা কোন জাতি বা দেশের জন্য হয় মারাত্মক ক্ষতিকর। আর তার বিপরীতে যদি তা হয় ইতিবাচক তাহলে তা হবে কল্যাণকর। আর এ কল্যাণকর পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য ইসলামী চারু ও কারু শিল্পের বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। কারণ চারু ও কারু শিল্পে ইসলামের ছোঁয়া থাকলে মানুষ অশ্লীলতা থেকে এমনকি প্রচ্ছন্ন শিরক থেকেও রক্ষা পেতে পারে। আর তাই আমাদের দেশে ইসলামী আবহ সৃষ্টির জন্য চারু ও কারু শিল্পের চর্চা চলছে। যার অন্যতম হচ্ছে আরবী ক্যালিগ্রাফি চর্চা। তাই শুধু ইসলামী সংস্কৃতিতেই নয় বরং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আরবী ক্যালিগ্রাফির প্রভাব বিদ্যমান।

১. সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ

বিশ্ব শিল্পকলার অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে- লিপিশিল্প। ইসলামী শিল্পকলায় হরফের শিল্প তথা ক্যালিগ্রাফি একদিকে যেমন জাগতিক নান্দনিক ও হৃদয়ে অবেগে পরিপূর্ণ তেমনি আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক ভাবনার নির্যাস, সৌন্দর্য সুধা পানের সাথে পবিত্র ও পূণ্যানুভূতি হৃদয়ে আবিষ্ট করে এ শিল্প দর্শনে। এর অন্তর্নিহিত ব্যাঞ্জনা শিল্পীদের হাত দিয়ে ক্যানভাসে বর্ণিল হয়ে উঠে। হরফগুলো নিজস্ব পরিমন্ডলে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়। এতে দক্ষতা ও নিপুণ কুশলতা যেমন প্রতিভাত হয়ে উঠে। অলৌকিক দ্যোতনাও তেমনি সেখানে ঝিলিক দিয়ে যায়। বিভিন্ন বর্ণের সুষম প্রয়োগ, দর্শন, চিন্তা, নিজস্বধারার উপস্থাপনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় ক্যালিগ্রাফারদের শিল্পকর্মে।

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ক্যালিগ্রাফিকে খুব ভালবাসতেন। তাই তিনি তৎকালীন বিখ্যাত লিপিকার হযরত যায়েদ বিন সাবিতকে সঙ্গে রাখতেন। শান্তির ছায়াতলে ইসলামী বিশ্বাসী এ জনসমষ্টির মাধ্যমে নতুন এক সভ্যতার জন্ম হয়। যা পৃথিবীর জন্য আশির্বাদ স্বরূপ। এই একত্ববাদ বিশ্বাসীদের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে যে শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে উঠে তাই ইসলামী সংস্কৃতি। একত্ববাদে বিশ্বাসীদের শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্রোধ সংযত করা এবং অপরাধীদের ক্ষমা করা শেখায়। মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব, ভালবাসা, সদ্ব্যবহার ও সম্প্রীতি শিক্ষা দেয়। জীবনকে সম্মানিত করে তুলে, অনাদর্শবাদীকে আদর্শবাদী, মুর্খ ও অজ্ঞকে বিজ্ঞ এবং সাহসহীন মানুষকে সাহসী করে তুলে। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান বলেন- Calligraphy is the Art of penmenship, inspired by devine will, It is now a global Art practical by eminent and devoted calligraphers through out the muslim world.[১]

২. বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত

বিশ্বব্যাপি মুসলিম এবং ইসলামী সংস্কৃতি আজ এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যেন একটি প্রাচীন বৃক্ষ তার বহুদূর বিস্তৃত ফুলের ডালপালা গুলোকে ছড়িয়ে রেখেছে। আর এ ডালপালাগুলোতে বহুবর্ণের ফুলের মত মুসলিম স্থপতি, শিল্পী, লেখক এবং চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ তাদের মহান ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যিক নিদর্শনকে নবরূপে নতুন সাজে প্রতিনিয়ত প্রস্ফুটিত করে চলেছেন। তাদের এ কাজের অন্তর্নিহিত উদ্দীপনা ও প্রবাহকে আল হাল্লাজের রহস্যময় ও আধ্যাত্মিক কবিতার সাথে তুলনা করা যায়। ক্যালিগ্রাফি আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পকলায় প্রভাব বিস্তার করেছে। যার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে বিখ্যাত শিল্পী পলক্লীর বিভিন্ন চিত্রকর্মে। তার ডকুমেন্ট বা দলীল নামে ছবিটির কতগুলো আরবী বর্ণমালা ছাড়া আর কিছুই নয়। তার রেখাঙ্কণেও আরবী ক্যালিগ্রাফির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

আরবী ক্যালিগ্রাফি ইউরোপীয় শিল্পেও প্রভাব বিস্তার করেছে। আরবী না জেনেও ইউরোপীয়রা আরবী লেখার অনুকরণে নকশা করেছে। কাপড়ের বুননে ও নকশাতে আরবী লিপিকলার নকশা অনুসরণ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিক শিল্প আন্দোলনের অন্যতম দিকপাল পাবলো পিকাসোর জন্ম স্পেনের আন্দালুসিয়া অঞ্চলে। এ অঞ্চল আরবদের অধীনে ছিল প্রায় ৭০০ বছর। এখানকার নকশায় ইসলামী জ্যামিতিক মন্ডল কলার প্রভাব খুব সুস্পষ্ট। বিখ্যাত শিল্পী অঁরি মতিস তাঁর ছবির অনুপ্রেরণা পান ইরানী গালিচা থেকে। তাঁর ছবির রং ও কর্ম গালিচা থেকে নেয়া। তিনি তাঁর অবিমিশ্র রং এর পাশাপাশি সংস্থাপনের মাধ্যমে রংয়ের আবেদন ফুটিয়ে তুলেছেন।[২]

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া পাশ্চাত্য শিল্পকলায় ইসলামী লিপিকলার প্রভাব দেখা যায়। পাশ্চাত্যেও আলঙ্কারিক নকশায় কুফি রীতি ম্যাজিকের মত কাজ করেছে। এর প্রতিফলন দেখা যায়- ইতালি, স্পেন, ইংল্যান্ড, ও ফ্রান্সের গীর্জা ও সমাধির অঙ্গসজ্জায়। এমনকি ভ্যাটিকানের সেন্ট পিটার্সের গীর্জার সুউচ্চ ফটক কালিমা দ্বারা শোভিত। স্পেনের মামিয়ায় খৃস্টান যাজক ওকপার স্বর্ণমুদ্রায় কালিমা খোদিত আছে। শুধু তাই নয়, নীল এ আর্মস্ট্রং যখন চাঁদের বুকে পদার্পণ করলেন তখন যেদিকেই তাকান সেদিকেই দেখতে পেলেন আরবীতে লেখা ক্যালিগ্রাফি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' মহান আল্লাহ অবিশ্বাসীদের নিকট এ প্রমাণ করলেন যে আল্লাহ ব্যতিত কোন মাবুদ নেই এবং রাসূল (সাঃ) আল্লাহর বান্দাহ বা রাসূল।[৩] বিংশ শতাব্দীর চিত্র শিল্পেও ইসলামী শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রভাব পড়েছে। বিমূর্ত শিল্পের জনক মন্ড্রিয়ান ক্যালিগ্রাফি শিল্পে মুগ্ধ হয়ে বিমূর্ত শিল্পের জন্ম দেন। বিমূর্ত শিল্পের ফিগার নেই, কর্ম আছে। শিল্পীরা ক্যালিগ্রাফির বদলে ফর্ম ব্যবহার করেছেন তাদের চিত্রকর্মে। বলা যায়- পৃথিবীর শিল্পের বিমূর্ততার উদ্ভব এখান থেকেই।

৩. আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের কৃতিত্ব

বর্তমানে বাংলাদেশের কৃতিশিল্পীরা স্বদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথেষ্ট অবদান রাখছেন। তারা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছেন। বিভিন্ন দেশের আমন্ত্রণে শিল্পীরা প্রদর্শনী ও সেমিনারে অংশ নিচ্ছেন। গত ৯-১৮ সেপ্টেম্বর ইরানের জরগান শহরে অনুষ্ঠিত ১৮তম আন্তর্জাতিক তরুণশিল্পী শিল্পকলা উৎসবে বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফার হাসান মোরশেদ প্রথম পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রাচ্যকলা বিভাগের এমএফএ প্রথম পর্বের ছাত্র। বিশ্বের ২১ টি দেশের দুই শতাধিক শিল্পীর অংশগ্রহণে এ প্রতিযোগিতায় এ বিরল সম্মান লাভ করেন।[৪] এর মাধ্যমে মুসলিম দেশ সমূহের সাথে ইসলামিক কালচারের সাথে একটি সেতু বন্ধন তৈরি হচ্ছে।

আরব সভ্যতার উত্থানের পেছনে যে উপাদান গুলো সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, তা হলো- প্রথমতঃ কুরআন, দ্বিতীয়তঃ ইসলাম পূর্ব কবিতা এবং চুড়ান্ত পর্যায়ে ক্যালিগ্রাফি ও স্থাপত্য। আরবী ক্যালিগ্রাফির গাঠনিক আকৃতি রূপদানকল্পে আরব ক্যালিগ্রাফারগণ জ্যামিতিক ও প্রাকৃতিক উপাদানের প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছেন। এর সাথে আধ্যাত্ম অনুভব ভাষার প্রতি একান্ত

Dhaka University Institutional Repository

ভালবাসা ক্যালিগ্রাফির উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। সারা বিশ্বে লিপিকলার শিল্পময় স্থান তুলনা করে অবধারিতভাবে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শীর্ষস্থান দখল করে আছে।

ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতা, সৌন্দর্যময়তা, প্রদানে প্রত্যাগ্রহ ও পিপাসা বিশ্বাসের প্রতি অঙ্গীকার ধর্মীয়ভাবে তীক্ষ্ণ শিল্পবোধ সম্পন্ন ক্যালিগ্রাফারদের কঠোর সাধনা ও আত্মনিয়োগের ফলে বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি বিশ্বখ্যাত মর্যাদায় আসীন হয়েছে। যারা ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে অতি উৎসাহী, অত্যন্ত সচেতন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত তারা বিষয়গুলো নিয়ে ভাববেন সেটাই স্বাভাবিক। কারণ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী অনেক শিল্পীই ক্যালিগ্রাফি শিল্প নিয়ে ভাবেন এবং পত্র-পত্রিকায় লিখে থাকেন। এদের অনেকে ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। অর্জন করেছেন আন্তর্জাতিক শিল্পমানের অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এ সকল শিল্পীসহ সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি বিশ্ব দরবারে সম্মানজনক স্থান করে নিতে সক্ষম হবে- এ প্রত্যাশা সকলের।

৪. বাংলাদেশের শিল্পকলায় এক মহান ধারা

ইসলাম ক্যালিগ্রাফি শিল্পের সর্ববৃহৎ চালিকা শক্তি। মহান আল্লাহ তায়ালা নানা অপূর্ব সাজে সজ্জিত করেছেন সবুজ ঘাস, পত্র-পল্লব, বৃক্ষের শাখা, বনাঞ্চলের প্রাণী এবং সবকিছুতেই বিধাতার অনন্য ও অসাধারণ পরিপূর্ণতা আমরা দেখতে পাই। বিশ্বাসের নির্ভরতায় শিল্পীরা আল্লাহর এরূপ দক্ষতাকে অত্যন্ত অভিনিবেশ এবং অন্তরিকতার সাথে অবলোকন করেন। সৃষ্টির সকল বিমুগ্ধতাকে গ্রহণ করে শিল্পীরা তা রং ও রেখায় প্রকাশ করে থাকেন।[৫] ক্যালিগ্রাফি শিল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট শিল্পবোদ্ধা, গবেষক ও জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেন- শিল্প প্রকরণ ও শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে হস্তলিখন শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কোথাও শিল্পের সূত্রপাতে হস্তলিখনের অনুশীলন করতে হয়। আবার কোথাও হস্তলিখন শিল্প পূর্ণাঙ্গ শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

জাপান, চীন ও কোরিয়াতে চিত্রকলায় হস্তক্ষেপ করার পূর্বে একজন শিক্ষার্থীকে হস্তলিখনের অনুশীলন অবশ্যই করতে হয়। শুধু তাই নয়, মহাগ্রন্থ আল কুরআন এর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্যালিগ্রাফি চর্চার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে ইসলামী শিল্পকলা গ্রন্থে বলা হয়েছে- The beautiful

Dhaka University Institutional Repository

writting in Arabic script was employed to enhance the apeal of the words of Quran which was cultivated by the muslim from the earliast times.[৬]

৫. ক্যালিগ্রাফি সত্য ও সুন্দরের পথ প্রদর্শক

ক্যালিগ্রাফি বা যে কোন শিল্পকলা শুধুমাত্র সাজ সজ্জার উপকরণ নয়। বরং এটি সত্য, সুন্দর ও স্বচ্ছতার বহিঃপ্রকাশ। সঠিক ও আলোর পথের দিশারী। অসত্যকে সত্য, অসুন্দরকে প্রাণবন্ত, আদর্শহীনকে আদর্শবান বানানো, নির্জীব ও অলস মানুষকে নির্ভীক ও সাহসী করে তোলা শিল্পীদের কাজ। তারা তাদের তুলির বলিষ্ঠ রেখায় ছড়িয়ে দিতে পারেন সঠিক চেতনা ও বিশ্বাসের অনুপম ম্যাসেজ। যারা ক্যালিগ্রাফিকে বিষয়বস্তু করে থাকেন তারা হলেন অনিন্দ্য সুন্দরের সাধক, ধারক, বাহক ও ঈর্ষণীয় সমাজের সদস্য। তারা নিজ নিজ বিচার বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে জাতিকে অগ্রগতি, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করেন। রাজনৈতিক সংঘাত, সন্ত্রাস, অসভ্যতা, বিশৃংখলা, অন্যায় ও অপশক্তির বিরুদ্ধে সর্বদাই সোচ্চার। কারও রক্তচক্ষু, কোন প্রকার লোভ-লালসা কিংবা কোন মহলের প্ররোচনা সত্যিকার একজন ক্যালিগ্রাফারকে আদর্শচ্যুত করতে পারে না। তাই তাদের মর্যাদা জাতির সর্বোচ্চ শিখরে।

সততা, বিশ্বস্ততা ও তাদের মৌলিক অবদানই এ অবস্থানকে সুদৃঢ় করে। এরা শুধু দেশ নয় মানব জাতির সম্পদ। এরা অন্ধকারময় পরিবেশকে আলোকিত করে। জাতিকে সত্যের পথ দেখায়। যে শিল্পীর সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক যত গভীর সে শিল্পী তত সৎ ও স্বাধীন। কারণ তাদের ধারণা শিল্প শিল্পের জন্য নয়, শিল্প জীবনের জন্য, শিল্প সত্যের জন্য, সুন্দরের জন্য।[৬] শিল্প সাহিত্য মানুষকে সুন্দর ও মানবিক চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে এবং সমাজে শান্তি ও আনন্দের প্রবাহ বইয়ে দেয়। আজকের দিনে বিশ্বময় একটি সমাজের এ পাগলা ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে মানুষ শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় মানবিক আচার আচরণে নিজেকে যত ব্যাপৃত রাখবে ততই মানব জাতির এক মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে।

৬. ক্যালিগ্রাফি রুচিবোধের বহিঃপ্রকাশ

চারুলিপি বা নান্দনিক লৈখনশৈলির চর্চার প্রতি মানুষের আকর্ষণ এবং এর সংগ্রহের রেওয়াজ অনেক দিনের। রুচিশীল ব্যক্তি মাত্রই তার ড্রইং রুমে আর প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাচারি ঘরে এ অভিজাত শিল্পকে

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রহ করার রুচিবোধ প্রত্যক্ষ করা যায়। রুচিশীল ও সংস্কৃতিবান মানুষ সৌন্দর্যের পূজারী। শিল্পের স্বভাব হচ্ছে- আনন্দ উৎপাদন, অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ। আর এ আনন্দের ধারা দু'ধরণের হতে পারে। একটি অনিষ্টকর বা অকল্যাণকর। আর অন্যটি সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক। যাকে আমরা বলতে পারি Arts for human sake বা মানবতার জন্য শিল্প। এ আনন্দের সাথে নৈতিকতার সংযোগ ঘটে তখনই তা হয়ে উঠে মহোত্তম শিল্প। আর বিশ্ব শিল্পের ইতিহাসে ক্যালিগ্রাফি এমনই এক শিল্প যার রয়েছে একটি স্বতন্ত্র ধারা। বাংলাদেশে ইসলামী শিল্পকলা গ্রন্থে এনামুল হক বলেছেন- Islamic Art (Calligraphy) has indeed expended the horizon of civilization. A refined and hrythomical expression of a rich and inspiring aesthetics experience epitomics its spirit.

৭. অন্তর্নিহিত রহস্যের উদঘাটন

মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট মহাবিশ্বের বিস্ময়কর সৃষ্টি সমূহের সেরা হলো মানুষ। আর সেই মানুষের মধ্যে যারা গবেষক, বিশ্লেষক এবং বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী তারাই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিরহস্য ও গভীর তত্ত্ব বিষয়ে নিরলস কাজ করে থাকেন। বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্নিহিত রহস্য উদঘাটনে নানাভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করে থাকেন। এমনিভাবে যারা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিরহস্যের তত্ত্ব উদঘাটনে বিরামহীনভাবে কাজ করে চলছেন নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে চিত্রশিল্পীগণ অন্যতম। একজন শিল্পী সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট কোন বিষয়কে যেভাবে, যে দৃষ্টিতে দেখেন একজন সাধারণ মানুষ সেভাবে, সে দৃষ্টিতে দেখেন না। সাধারণ একটি বৃক্ষের কচিপাতা, তার বেড়ে উঠা, তার রং বদলের পর্যায় ও প্রক্রিয়া, পাতার গঠন প্রকরণ প্রভৃতি বিষয়ে একজন শিল্পী যেভাবে আগ্রহ নিয়ে গবেষণা করেন এবং সেই পর্যবেক্ষণের পর্যায় এবং অভিজ্ঞকতাকে যেভাবে রংয়ে রেখায় প্রকাশ করেন একজন সাধারণ মানুষ সেভাবে চিন্তা কিংবা কাজ করেন না কিংবা সেখানে কখনও ভাবেনও না। এজন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শিল্পীকে পছন্দ করেন। কারণ শিল্পীরা আল্লাহর সৃষ্ট বিষয়গুলোর রহস্য উৎঘাটন পূর্বক সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেন এবং তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করেন।

আদিকাল থেকেই মানুষকে নানা বিষয়ে সচেতন করতে এবং বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শিল্পীরা এভাবে শিল্প চর্চা করেছেন। এর মধ্যে ধর্মীয় শিল্প চর্চার বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে। সৃষ্টিকর্তা কিভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের জন্য ধর্মীয় বিধি-বিধানের

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলন করেছেন। এসকল বিষয়ে শিল্পী তার উপলব্ধিকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। হযরত নূহ (আঃ) এর প্লাবন, নামাজ, রোজা, ঈদ, কুরবানী, কুরআন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্নভাবে চিত্র রচনা করেছেন। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বাণী, বাণীর মর্মার্থ, অক্ষর বিন্যাস ও মর্মার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর সমন্বয়ে রং-রসের ব্যাঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলেছেন অপূর্ব সুন্দর চিত্রকর্মসমূহ। যে চিত্রকর্ম বিশ্বশিল্পের জগতকে করেছে সমৃদ্ধ এবং সেরা শিল্পীদের করেছে অনুপ্রাণিত। আধ্যাত্মিক বাণী সমৃদ্ধ ক্যালিগ্রাফি, শিল্পের বর্ণবিন্যাসের রূপব্যাঞ্জনায় আকৃষ্ট হয়ে ভিন্ন ধর্মের বহু বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী তাদের শিল্পের পরিচর্যা করেছেন। ক্যালিগ্রাফির বর্ণিল বর্ণের উপস্থাপন কৌশলের বিষয় গুলোকে তাদের শিল্পে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিল্পকর্ম সমূহকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও আধ্যাত্মিক রসে সমৃদ্ধ ক্যালিগ্রাফি শিল্প সম্প্রতি বাংলাদেশেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. An introduction to Islamic Calligraphy

২. প্রবন্ধ: ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্পের বিকাশ ও বর্তমান সমাজে প্রভাব- ইব্রাহীম মন্ডল, মাসিক তানযীমুল উম্মাহ

৩. চাঁদের বুকে আযান ও কালিমা শরীফের অনুপম ক্যালিগ্রাফি- আমিনুল ইসলাম আমিন, দৈনিক যুগান্তর, আগস্ট-২০০৬

৪. দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ সেপ্টেম্বর-২০১১

৫. শিল্প ও বিশ্বাস- হা. মীম কেফায়েত, ক্যাটালগ: শিল্পী বশির মেসবাহ'র একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৬, ঢাকা।

৬. Islamic Art in Bangladesh- Catalogue of special exhibition , National museum, 3-8 April, 1978

৭. প্রবন্ধঃ একুশ শতকের ক্যালিগ্রাফিঃ শিল্পীদের করণীয়- ইব্রাহীম মন্ডল, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা-২০১১, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, পৃ-১৩৩

৮. Islamic Art in Bangladesh- Catalogue of special exhibition , National museum, 3-8 April, 1098

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে আরবী ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও এর বিকাশে সমস্যা সমূহ

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব

ক্যালিগ্রাফির ভাল প্রতিষ্ঠানের অবিদ্যমানতা

শিক্ষা কারিকুলামে ক্যালিগ্রাফির অনুপস্থিতি

অর্থনৈতিক সংকট

সংঘবদ্ধতার অভাব

অভিন্ন প্রকাশভঙ্গীর অভাব

ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে ধারণার কমতি

আরবী ভাষা সম্পর্কে কম জানা

অবমাননার ভয় থাকা

ক্যালিগ্রাফির উপকরণের অপ্রতুলতা

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে আরবী ক্যলিগ্রাফি চর্চা ও এর বিকাশে সমস্যা সমূহ

১. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব

মুসলিম শিল্পকলার মধ্যে লিপিকলা নিঃসন্দেহে সর্বাধিক পরিমার্জিত ও সুষমামণ্ডিত। আরবদের মত অন্য কোন জাতি লিখন পদ্ধতিকে শিল্পকলার মাধ্যম হিসেবে গভীর মনোনিবেশের সাথে ব্যবহার করেনি। অন্যদিকে পারস্যবাসীদের মধ্যে লিপিশিল্পের যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও রীতি কৌশল ব্যাপকতা লাভ করেছে তা অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। আরব ও পারস্যবাসীরা হীরা জহরত অপেক্ষা লিপিকলাকে অধিকতর মর্যাদা দিত। তাদের কাছে হস্তলিপি শিল্প অন্যান্য শিল্প মাধ্যম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতো। রেখাঙ্কণ শিল্প এমন এক সম্মোহনী শক্তির অধিকারী ছিল যে রাজা বাদশাহ থেকে শুরু করে অতি নগণ্য লিপিকার পর্যন্ত সকল স্তরের অনুরাগকে শুধু মোহাচ্ছন্নই করে রাখত না; বরং তাদের মধ্যে লিপিকলার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে প্রতিযোগিতাও হতো। একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ লিপিকার জনগণের শুধু শ্রদ্ধারই পাত্র ছিলেন না; বরং রাজা বাদশাহগণ তাদের রাজ্যে এ ধরণের লিপিকারদের বসবাসে গর্ববোধ করতেন।[১]

ইসলামী শিল্পকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিগত শতাব্দী গুলোতে মুসলিম শাসকগণ ইসলামী শিল্পকলা বিশেষত ক্যালিগ্রাফির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার দরুণ ক্যালিগ্রাফি শিল্পীরা যেমন উৎসাহ উদ্দীপনা ও সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছিলেন তেমনিভাবে ক্যালিগ্রাফির চর্চাও ছিল পুরো সাম্রাজ্য জুড়ে। ওসমানীয় সুলতানী আমলে সুলতানগণ রাজদরবারে ক্যালিগ্রাফারদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তৎকালীন সীলমোহর, মনোগ্রাম, দলীল-দস্তাবেজ, রাজকীয় ফরমান, রাষ্ট্রীয়পত্র, নথিপত্র, স্থাপত্য বিষয়ক অলঙ্করণ যেমন- মসজিদ, রাজপ্রাসাদ, তোষাখানা প্রভৃতির দেওয়াল গাত্রে, কাঠের দরজায়, আসবাবে যেমন- সিন্দুকে আলমারীতে কিংবা সুসজ্জিত আসনে রুচিশীল নকশার সাথে নামাঙ্করণের ক্ষেত্রে কোন মূল্যবান বাণী লিপিবদ্ধ করার জন্য ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করা হত।[২]

Dhaka University Institutional Repository

শুধু তাই নয়, তৎকালীন সময়ে ইসলাম প্রচারের জন্য যেমন অনেক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এদেশে আগমন করতেন ঠিক তেমনিভাবে বিভিন্ন দেশ হতে খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফারগণ বাংলাদেশে আসতেন এবং ক্যালিগ্রাফি শিখাতেন। যেমন- কাবুল থেকে মজিদ অব কাবুল, ইরান থেকে রাফি অব ফাইজুন এ দেশে আগমন করে ক্যালিগ্রাফির চর্চা, প্রচার ও প্রসার করেছেন। পরবর্তীতে তা আর লক্ষ্য করা যায়নি। বিশেষত স্বাধীনতা উত্তর সময়ে। অবশ্য গত শতাব্দীর শেষ দিকে আবার নব উদ্যমে ক্যালিগ্রাফি চর্চা শুরু হয়েছে। কিন্তু যথাযথ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য-সহযোগিতার অভাবে নান্দনিক এ শিল্পের কাঙ্ক্ষিত বিকাশ ও চর্চা হচ্ছে না। কারণ একটি চারাগাছ যেমন বেড়ে উঠার জন্য আলো বাতাস চায় কিন্তু যথাযথভাবে তা না পেলে তা বিকশিত হয় না। তেমনি একজন উদীয়মান শিল্পীর প্রয়োজন উৎসাহ উদ্দীপনা ও পৃষ্ঠপোষকতা। আর শিল্পীগণ যথাযথভাবে পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচর্যা পেলে নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ পান। অন্যথায় অঙ্কুরেই ঝরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

২. ক্যালিগ্রাফির ভাল প্রতিষ্ঠানের অবিদ্যমানতা

শিল্পকলা তথা ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা যেমন প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার। কেননা এতে একটি বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহ্যিক নীতিমালা ও কলাকৌশল রয়েছে। বিশেষ করে ক্যালিগ্রাফি হাতে-কলমে শিখার মত শিক্ষক নির্ভর একটি শিল্প। প্রত্যেকটি হরফ ও স্টাইলের রয়েছে পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য। এগুলো জানা থাকলে ক্যালিগ্রাফির শৈল্পিক রস আস্বাদন করা সহজ হয়।[৩] ক্যালিগ্রাফির যে ধারাগুলো রয়েছে, তা আয়ত্ত করতে হলে শিক্ষকের সহযোগিতা একান্তই অপরিহার্য। মুসলিম-অমুসলিম সব শিল্প বোদ্ধাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এভাবে- "মহান ক্যালিগ্রাফি হচ্ছে মহান মিউজিক বা সঙ্গীতের মতো। এটা আয়ত্ত করতে হয় তীক্ষ্ণ মনোসংযোগ দিয়ে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে এবং অত্যন্ত কষ্টসাধ্য সাধনা ও নিয়মতান্ত্রিক ও সুশৃঙ্খল বিধি-বিধান মেনে চলে।"

ইবনুল বাওয়াব তাঁর আল মানসুব আর ফায়িক গ্রন্থে বলেছেন- এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে, কেউ এটি হুট করে শিখে ফেলবে বরং ক্যালিগ্রাফির সুক্ষ্ম সৌন্দর্যকে আয়ত্ত করার জন্য ওস্তাদের নিকট গোপন কৌশল শিখে নিয়ে নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে। প্রতিদিন গলা সাধার মতো ক্যালিগ্রাফির কলম দিয়ে অনুশীলন চালিয়ে যেতে হয়। হাতে-কলমে ক্যালিগ্রাফির গুপ্ত কৌশলগুলো শিখে নিতে হয়। শিক্ষক যদি সুক্ষ্ম কৌশল গুলো দেখিয়ে না দেন, তাহলে আক্ষরিক নিপুণতা বলতে যা বুঝায় সেটা আয়ত্ত করা প্রায়

Dhaka University Institutional Repository

অসম্ভব। এজন্য খাগের কলম কাটা এবং সেটি দিয়ে হরফকে স্বাচ্ছন্দ্যে লেখা সম্বন্ধে বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফি গবেষক কাজী আহমদ যথার্থই মন্তব্য করেছেন। তিনি কলমের প্রতীক এভাবে বর্ণনা করেছেন- মানবের কাছে প্রভূর দেয়া সব জ্ঞানের বাহন হচ্ছে কলম।[৪]

তাছাড়া শিল্পকলা ও ক্যালিগ্রাফির গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং এ শিল্পের প্রভাব ও এর ইতিহাস না জানা থাকলে অন্তঃসারশূন্য হবে। অতএব ক্যালিগ্রাফির একাডেমিক প্রতিষ্ঠান খুবই প্রয়োজন। বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম আর্ট কলেজ ও অনেক আর্ট স্কুল রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এককভাবে ক্যালিগ্রাফির উপর কোন প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান এবং ক্যালিগ্রাফির উপর বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন শিক্ষক নেই বললেই চলে। ইরানের সংগঠন 'দ্যা ইরানিয়ান ক্যালিগ্রাফারস এসোসিয়েশন' এর দেশে-বিদেশে মোট ২৩০টি শাখা রয়েছে। কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত এ সংস্থার মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রতিবছর কয়েক হাজার ক্যালিগ্রাফার বের হয়।[৫] ১৯৭২ সালে দিল্লীতে যে ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তার অন্যতম বিষয় ছিল লিপিকলা। যেখানে সাইয়েদ মুহাম্মদ নামে একজন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার শিক্ষা দান করতেন।[৬]

৩. শিক্ষা কারিকুলামে ক্যালিগ্রাফির অনুপস্থিতি

শিক্ষা কোন জাতি ও সমাজের মেরুদণ্ড। সুতরাং শিক্ষা কারিকুলামের মধ্যে যে সংস্কৃতি ও শিল্প অন্তর্ভূক্ত থাকবে তাই জাতি ও সমাজের মাঝে প্রতিফলিত হবে। বিশ্বব্যাপি শিল্পকলার এ চরম উৎকর্ষতার যুগেও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় চারুকলার অনেকগুলো শাখার মধ্যে ক্যালিগ্রাফি শিল্পটি অন্তর্ভূক্ত নেই। তাই সৃজনশীল এই শিল্পের গুরুত্ব, তাৎপর্য, ও সামগ্রিকভাবে এর প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারছে না। ফলে বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চা কাঙ্ক্ষিত মানে বাড়ছে না। অথচ পশ্চিমা বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচিতে ক্যালিগ্রাফি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।[৭]

তাছাড়া আরবী ক্যালিগ্রাফির গভীরে যেতে হলে লিপিগুলো সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। আমরা বাংলাভাষী বিধায় আরবী ক্যালিগ্রাফির সুক্ষ্ম শৈলীভিত্তিক পার্থক্য যেমন ধরতে পারি না তেমনি এর অন্তর্নিহিত স্বাদও আস্বাদন করতে পারিনা। পৃথিবীতে একমাত্র ট্রাডিশনাল আরবী ক্যালিগ্রাফির-ই রয়েছে বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা ও কলা-কৌশল। শিল্পের এই ধ্রুপদি ধারায় যারা পদচারণা করে এর রস আস্বাদন

Dhaka University Institutional Repository

করতে আগ্রহী তাদের জন্য এর সম্যক ধারণা অত্যাবশ্যক। এজন্য বাংলাদেশের শিক্ষা কারিকুলামে এর অন্তর্ভূক্তি অতীব প্রয়োজন।

৪. অর্থনৈতিক সংকট

শিল্পকর্ম একটি সৌখিন ও মানসিক আনন্দদায়ক একটি মাধ্যম যা নির্মাণ করতে অর্থাৎ রং-তুলি, ক্যানভাস সহ নানাবিধ উপকরণ কিনতে ও ব্যবহার করতে বেশ টাকা-পয়সা খরচ হয়। তাছাড়া প্রদর্শনীর আয়োজন ও বিভিন্ন মাধ্যমে এর প্রচার ও বিকাশ ঘটানোর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তা যেমন এককভাবে কোন ব্যক্তি বা শিল্পীর পক্ষে বহন করা সম্ভব হয় না, তেমনিভাবে এর অভাবে শিল্পী নিজে অনেক সময় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। যেমন ইসলামিক আর্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে একটি ইসলামিক আর্ট মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের কৃতিমান ক্যালিগ্রাফার শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন এ মিউজিয়ামের একটি অসাধারণ ডিজাইনও করেছিলেন যা অর্থাভাবে আজও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১৯৮১ সালে এ সংগঠনের সভাপতি ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসানকে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এর অর্থায়নের আশ্বাস দিলেও তার মৃত্যুর পর আর কোন সরকারই একাজে অগ্রসর হয়নি। যাতে ঐ মিউজিয়ামের ডিজাইনার অনেকটা হতাশই হয়েছেন।[৮] তথাপিও এ সংকট উত্তরণে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসছেনা। এভাবে মূলত এ শিল্পের ব্যাপক চর্চা ও বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে।

৫. সংঘবদ্ধতার অভাব

ক্যালিগ্রাফি শিল্পকে জাতীয় সংস্কৃতিতে রূপ দেওয়ার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে যারা ক্যালিগ্রাফি চর্চা করছেন, তাদের মধ্যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা অনুপস্থিত। তাছাড়া ক্যালিগ্রাফি শিল্পের চর্চার ক্ষেত্রে চিন্তার অনৈক্য রয়েছে। গবেষণার সুবাদে নবীন-প্রবীন প্রায় একশত ক্যালিগ্রাফারের সাথে আমার কথা হয়েছে। যাদের মধ্যে শিল্পচিন্তায় অনৈক্য বিদ্যমান। চারুকলায় শিক্ষা গ্রহণ করে যারা ড্রইং ও পেইন্টিং-এ অভিজ্ঞ তারা বর্ণিল ক্যানভাসে নানাবিধ পারিপার্শিকতার মাঝে আরবী লিপির বিভিন্ন রেখার টানে কিছু আবেগ নির্মাণ ও গভীরভাবে প্রকাশক ইল্যুশনকে ভাল ক্যালিগ্রাফি শিল্প বলছেন। তারা বলছেন

Dhaka University Institutional Repository

ট্রাডিশনাল ধারায় শুধুমাত্র সুন্দর হস্তলিখন করলে তা আবার ক্যালিগ্রাফি শিল্প হয় কীভাবে? কেননা শিল্প তো হবে নব নব আঙ্গিকে সৃষ্টি। অনুকরণকে তো আর শিল্প বলে আখ্যা দেয়া যায় না।

আর যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ ছাড়াই ক্যালিগ্রাফি চর্চা করে চলছেন, তারা মনে করেন কোন ধারা অনুসরণ না করে রং-বেরংয়ের ক্যানভাসে বর্ণমালা বসিয়ে দিলেই তা শিল্প হয় না। বরং এর মাঝে বর্ণবিন্যাসের ব্যাকরণ অনুসরণ অবশ্যই জরুরি। এ চিন্তার বৈপরিত্বটা অনেকটা 'ভাষা আগে না ব্যাকরণ আগে' এ বিতর্কের মতোই । তবে যাই হোক, চিন্তার এ অনৈক্য অবশ্যই বড় একটি সমস্যা।

৬. অভিন্ন প্রকাশভঙ্গীর অভাব

বর্তমানে বাংলাদেশে যারা ক্যালিগ্রাফি চর্চা করছেন, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই ধর্মীয় অনুভূতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক বর্ণবিন্যাস এবং প্রকাশ ভঙ্গিতে অভিন্নতা রয়েছে। অথচ শিল্পের রীতিনীতি এর বিপরীতধর্মী।[৯] অর্থাৎ শিল্প হবে নব নব আঙ্গিকের সৃষ্টি। যাতে কোন প্রকার অনুকরণ থাকবে না। এক শিল্পীর শিল্প অন্য শিল্পীর শিল্পকর্মের সাথে মিলে মিশে একাকার হবে না। অথচ বাংলাদেশে যারা ক্যালিগ্রাফি করছেন তাদের অনেকের নিকট এ দিকটি খুবই অস্পষ্ট। বিগত কয়েক বছরে অনুষ্ঠিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীগুলো তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এ সকল প্রদর্শনীর অনেক চিত্রই প্রাচীন ইরানী ক্যালিগ্রাফির অনুরূপ।

এসব কর্মে একই ধারায় বর্ণবিন্যাস ছাড়া আধুনিকায়ন কিংবা শিল্পীর স্বতন্ত্র ধারা নির্মাণের কোন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। অথচ বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যারা ক্যালিগ্রাফি চর্চা করছেন, তাদের প্রত্যেকের কাজে নিজ নিজ ধারা সৃষ্টির প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যেমন- আলজেরিয়ার রশিদ কোরেশী, জর্ডানের রফিক লোহান, প্যালেস্টাইনের ইয়াসির ডুইক, ইরানের এম. এহসায়ী, আরমাফি, কাতারের আলী হাসান আল জাবের, ওমানের মুহাম্মদ বিন ফাদেল বিন সাঈদ আল হাসনী, সিরিয়ার আব্দুল লতিফ আল স্মৌদ ও মালয়েশিয়ার পনিবিন আমীর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে ধারণার কমতি

কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ, উদ্দীপনা ও চাহিদা থাকার জন্য শর্ত হচ্ছে - ঐ বিষয়টি সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা থাকা। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের নানামুখী চিন্তা, ব্যস্ততা, ও নানাবিধ বাস্তবতার কারণে এসব শিল্পকর্ম দেখেন না, পড়েন না বা বুঝেন না। কারণ শিল্পবোদ্ধাগণ ছাড়া এবস্ট্রাক্ট ফর্ম, নান্দনিক সৌকর্য, টেক্সচার ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিকগুলো দর্শক খুব কমই বুঝে থাকে। অতএব এর চর্চার কোন প্রশ্নই উঠেনা। কিছু মানুষ শিল্পপ্রেমী হলেও আরবী ভাষা তথা কুরআনের ভাষা সম্পর্কে ধারণা ও এর শিল্পসৌন্দর্য ও শৈল্পিক ভাবনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকায় এ শিল্পের দর্শন, পর্যবেক্ষণ, উপলব্ধি, পৃষ্ঠপোষকতা, চর্চা ও বিকাশে বেশি অবদান রাখতে পারছে না।

এ প্রসঙ্গে কুতবা আল মুহাররির বলেছেন-It behaves him he who wishes that his hand writing should be exellent and his script clear that he should devise for it a pattern upon which his regulates his lines. [১০] শুধু তাই নয়, যারা ক্যালিগ্রাফি চর্চা করছেন, তাদের অধিকাংশের মাঝেও শিল্প জ্ঞানের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে।

৮. আরবী ভাষা সম্পর্কে কম জানা

বাংলাদেশের শিক্ষিত লোকসংখ্যার সিংহভাগই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। আরবী ভাষা সম্পর্কে যাদের কোন ধারণা নেই। আরবী বর্ণমালা, বর্ণের বৈশিষ্ট্যমালা ও রূপসৌন্দর্য সম্পর্কে তারা আরও অজ্ঞ। আরবী শিক্ষিত যারা আছেন, তাদের অধিকাংশই আবার ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে অজ্ঞ। এজন্য ক্যালিগ্রাফি শিল্প দেখে আনন্দ পেলেও একে পড়া ও যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ করতে না পারায় এর মূল্যায়ন ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেনা। ফলে এতে অনেকেই উৎসাহী হয়ে উঠে না এবং এটি চর্চা করতে পারে না। এজন্যই বাংলাদেশ এ শিল্প চর্চা ও বিকাশে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

৯. অবমাননার ভয় থাকা

ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম যা করা হয় তা সাধারণত আরবী ভাষাতেই হয়ে থাকে। কুরআনের আয়াত, হাদীস, বিভিন্ন উপদেশমালা ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। পত্রিকা, লিফলেট, পোস্টার, বইয়ের প্রচ্ছদ, ওয়ালমেট, উপহার সামগ্রী, তৈজসপত্র প্রভৃতিতে এসব ক্যালিগ্রাফির প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপরায়ণ হওয়ায় এসব ক্যালিগ্রাফির যত্রতত্র ব্যবহার সম্পর্কে গোনাহের আশঙ্কা করে। শুধু তাই নয়, এমন আশঙ্কার কারণে খুব হিসেব করে ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করেন। আমি বাংলাদেশে আরবী ক্যালিগ্রাফি চর্চায় সমস্যা এর উপর জরিপ চালাতে গিয়ে দেখি অনেক শিল্পীই এ বিষয়টিকে ক্যালিগ্রাফি চর্চার ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

যেমন শিল্পী বশির মেসবাহ বলেন- "পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন লেখার পাশাপাশি এর সাথে ক্যালিগ্রাফি দিলে ক্যালিগ্রাফির বেশ প্রচার ও প্রসার হয়। কিন্তু পত্রিকার পাতা মানুষ বিভিন্ন সময় ছিড়ে যত্র তত্র ব্যবহার করে ও ফেলে রাখে। আর ঐ কাগজের টুকরায় যদি আল কুরআানের আয়াত সম্বলিত ক্যালিগ্রাফি থাকে তাহলে তার অবমাননা হয়। এজন্য আমি ব্যাপকভাবে ক্যালিগ্রাফি করিনা ও পত্রিকায় দেইনা।" সুতরাং এটিও ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও বিকাশে অন্যতম একটি প্রতিবন্ধকতা।

১০. ক্যালিগ্রাফির উপকরণের অপ্রতুলতা

ক্যালিগ্রাফি হচ্ছে সুন্দর হস্তলিখন অর্থাৎ কলমের রহস্যময় পরিচালনার মাধ্যমে অঙ্কিত রেখার সমারোহ। আর তাই সুন্দর লেখার জন্য প্রয়োজন উপযোগী উপকরণ। যথাযথ উপকরণ ছাড়া ক্যালিগ্রাফি নিখুঁত ও মানসম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এজন্য বড় বড় ক্যালিগ্রাফাররা ক্যালিগ্রাফির জন্য ভালমানের উপকরণের ব্যাপারে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন এবং ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক গ্রন্থ সমূহেও এ সংক্রান্ত কথামালা তুলে ধরেছেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়- ক্যালিগ্রাফার আল-দাহ্হাকের অভ্যাস ছিল- তিনি কলমের নীব কাটার সময় আড়ালে চলে যেতেন, যেজন্য তাঁর নীব কাটার কৌশল সম্পর্কে কেউ জানতে পারতো না।

ইবনে আল-বাওয়াব কলমের নীব কাটা কলাকৌশল সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা আমার কাছে এর কলাকৌশল সম্পর্কে জানতে চেওনা। কেননা এটা আমি সযত্নে লুকিয়ে রাখি। এ থেকে সহজেই ক্যালিগ্রাফির উপকরণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফির বিভিন্ন উপকরণের যথেষ্ট অপ্রতুলতা রয়েছে। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে যদিও কম্পিউটারের মাউস দিয়ে কাজ করা যায় কিন্তু তা দিয়ে শতভাগ নিখুঁতভাবে কাজ করা সম্ভব হয়না। এজন্য ক্যালিগ্রাফির উপকরণের অপ্রতুলতাও এর বিকাশে একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. মুসলিম লিপিকলা- এম জিয়া উদ্দিন, অনুঃ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলামী ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃ- ১

২. প্রবন্ধ: কম্পিউটার গ্রাফিক্স ক্যালিগ্রাফি ও মৌলিকতার প্রশ্ন, আমিন আল আসাদ, দৈনিক ইনকিলাব, ৮ জুলাই-২০০

৩. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, অক্টোবর-২০০২, পৃ-১১২

৪. প্রবন্ধ: সমকালীন ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, দৈনিক সংগ্রাম, ১৪ অক্টোবর-২০০৫

৫. মাহজুবার- ইরানের তেহরান থেকে প্রকাশিত পারিবারিক ম্যাগাজিন

৬. হাতে কলমে ক্যালিগ্রাফি- ইব্রাহীম মন্ডল, শহীদুল্লাহ এফ. বারী ও মোহাম্মদ আব্দুর রহীম

৭. দৈনিক ইত্তেফাক-ধর্ম ও জীবন বিভাগ

৮. ইসলামিক আর্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসানের সাথে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত

৯. প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধানে- ড. আব্দুস সাত্তার, পৃষ্ঠা-৭১

১০. Islamic Calligraphy in the Medieval India- P I S Mustafizur Rahman

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে আরবী ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও এর বিকাশে সম্ভাবনাময়ী দিকসমূহ

আরবী হরফের বিস্ময়কর প্রবাহমানতা

ক্যালিগ্রাফারদের সামাজিক মর্যাদা লাভ

প্রতিবছর প্রদর্শনীর আয়োজন

আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বাংলাদেশী ক্যালিগ্রাফারদের অংশগ্রহণ

প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ

রুচিশীল শিল্প হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ

বাণিজ্যিক সম্ভাবনা লাভ

মিডিয়াতে প্রচার

শিল্পীর আর্থিক যোগান লাভ

মহিলা শিল্পীদের ক্যালিগ্রাফি চর্চা শুরু

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে আরবী ক্যালিগ্রাফি চর্চায় সম্ভাবনাময়ী দিকসমূহ

১. আরবী হরফের বিস্ময়কর প্রবাহমানতা

লিপিকার তার সৃজনশীলতা এবং আলঙ্কারিক রীতি প্রকাশের জন্য এমন কতকগুলো রীতির উদ্ভাবন করেন। যা মূলরীতি থেকে বিচ্যুত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- গুলজার, তুগরা, তাউস ও জুলফ-ই-আরুশ কুফি থেকে ইসলামী হস্তলিপি শিল্পের সর্বাধুনিক ও সহজরীতি।তবে আরবী লিপি হচ্ছে প্রবাহমান ঝর্ণার মত প্রাণোচ্ছল ও সদা বিকাশমান মননের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিকী আরবী হরফের বিভিন্ন ধরণের উচ্চাঙ্গ রীতি সীমাহীন সম্ভাবনা প্রদান করে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এর একটি

মনোমুগ্ধকর হরফমালা। ইসলামী শিল্পকৌশল আরবী ক্যালিগ্রাফি। কৌশল শিল্পীকে তার এক শিল্পকর্মে। আরবী ক্যালিগ্রাফির শক্তিশালী অলঙ্করণ কলা রয়েছে এবং হরফের মধ্যে রয়েছে বিস্ময়কর বিমূর্ত লিপিকলার প্রবাহমানতা। ইসলামী ক্যালিগ্রাফির স্বাভাবিক প্লাস্টিক বা নমনীয় চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য তরঙ্গমালার মত পুনরাবৃত্তি বা রিপিটেশন বা প্রয়োগবিধি এটাই প্রমাণ করে যে আরবী ক্যালিগ্রাফি তার Astheric Sence বা সৌন্দর্য দর্শন বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম।

বর্তমান সময়ের খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফার কামাল বাউল্লতা তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, এ্যারাবেস্ক এর জ্যামিতিক এবং ফুলেল নক্সার সাথে বৈশিষ্ট্যগতভাবে আরবী হরফের সাথে ব্যাপক মিল পাওয়া যায়। সুতরাং পেইন্টিং এবং স্থাপত্যে এর প্রয়োগ সত্যিই বিস্ময়কর। যে কোন একটি কারুকাজময় মসজিদের উপর গবেষণা করে দেখা গেছে- সুসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ, যুথবদ্ধতা এবং সিমেট্রিকেল প্যাটার্ন এর জন্য কাজগুলো নিখুঁত হয়েছে। পেইন্টিং সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারায় উন্নতি লাভ করেছে। যার একটি শাখা

Dhaka University Institutional Repository

ক্যালিগ্রাফিতে নিমগ্ন। মূর্ত কিংবা বিমূর্ত যে ধারাই হোক না কেন তা পেইন্টিং এর অলঙ্করণকে গ্রহণ করে। তবে এটা মূলত রং, উপাদান ও প্রতীকের উপর নির্ভর করে।

পলক্লী ও হেনরী মাতিসের মত ইউরোপিয়ান শিল্পীকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছিল- এই এ্যারাবেস্ক। যার কারণেই তাদের কাজে এত বড় ধরনের প্রকাশ দেখা যায়। অতএব আরবী ক্যালিগ্রাফি একটি সম্ভাবনাময় শিল্পসাধনার মাধ্যম তা অস্বীকার করার কোন জো নেই।[১] The importance of Calligraphy as one aspect of cultural heritage and the neeeed to preserve its classical and traditional charicterisrics from ovlivion, led the haritage commission to include Islamic Calligraphy among its field of activities.[২]

২. ক্যালিগ্রাফারদের সামাজিক মর্যাদা লাভ

মহানবী (সাঃ) এর যুগ থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল ও উমাইয়া আমল পর্যন্ত হস্তলিখন শিল্প সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে শিল্পীদের হাতে অপ্রতিরোধ্যভাবে বিকাশ লাভ করেছে। হস্তলিখন শিল্পীর উন্নত সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই। যারা সুন্দর হস্তলিপি এবং দ্রুত লিখনরীতির নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন তাদেরকে ওয়ারাকা বলে। গুণী ব্যক্তিগণ ও সরকারি কর্মচারীরা তাদের সচিব এবং দ্রুত লেখক হিসেবে নিযুক্ত হতেন।[৩] আর তাই হস্তলিখন শিল্পীদের উন্নত সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হতো। খ্যাতিমান লিখনশিল্পীদেরকে রাজকীয় গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হতো। তাদেরকে উচ্চ হারে নিয়মিত বেতন দেওয়া হতো। তারা তাদের অধীনস্থ হস্তলিখন শিল্পীদের কাজের গুণগত দিক বিবেচনা করতেন এবং প্রয়োজনবোধে লেখার মান উন্নত করার জন্য পরামর্শ দিতেন। রাজকীয় পরিবারের সন্তান সন্ততি এবং অভিজাত শ্রেণীর পুত্র-কন্যাদের জন্য নামকরা হস্তলিখন শিল্পীদেরকে নিযুক্ত করা হতো এবং মর্যাদাশীল জীবন যাপনের জন্য ইকতা বরাদ্ধ দেওয়া হতো। কারণ আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যে যেন তাদের এ শিল্প সাধনা ব্যাহত না হয়।[৪]

ক্যালিগ্রাফি তথা শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশ ঘটে থাকে। সাময়িকভাবে কোন শিল্প সাধনার ক্ষেত্রে মন্দাভাব দেখা দিলেও পরবর্তীতে তাতে আরো বেগবান ও গতিসঞ্চারিত হয়ে মাত্রাধিক্যভাবে সাধনার পথকে আরও কুসুমাস্তীর্ণ করে তুলেছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা মানব সমাজে

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পকলার লালন ও আনুপাতিক বিকাশের দ্বারা নির্ণীত হয়ে থাকে। অতএব এ শিল্পচর্চায় যে মানব যতবেশি অগ্রসর সে তত সভ্য ও সংস্কৃতিবান হিসেবে বিবেচিত।[৫] শিল্পকলার বিকাশ ও উন্নয়নের ধারা বিচার করে অতীত জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল্যায়ন করা যায়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, সামাজিক স্বীকৃতি এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা শিল্পকলার চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মুসলিম সভ্যতার ধারায় ক্যালিগ্রাফি এমন একটি শাখা যা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, সামাজিক অনুমোদন এবং রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে পূর্ণতা দান করেছে। ইসলামে লিখন শিল্পকে উৎসাহিত করার কারণে শিল্পীরা ধর্মীয় আনুকূল্যে অসাধারণ শিল্পকর্ম নির্মাণে প্রয়াস পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, পবিত্র কুরআনের আয়াত সম্বলিত ক্যালিগ্রাফি আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলীয় দেশ মরক্কো থেকে এশিয়ার পূর্ব উপকূলের দেশ ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এক অভিন্ন সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। সুতরাং ইসলামী ক্যালিগ্রাফির এ বিশাল ক্ষেত্র একজন ক্যালিগ্রাফারকে আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন করে তুলে।[৬]

৩. প্রতিবছর প্রদর্শনীর আয়োজন

মুঘল ও সুলতানী আমলে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের ব্যাপক চর্চা থাকলেও পরবর্তীতে তা স্থবির হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর মুক্তিযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ সহ নানাবিধ বিষয় নিয়ে অনেক চিত্র শিল্প নির্মিত হলেও ক্যালিগ্রাফির চর্চা মোটেও ছিল না বললেই চলে। তবে আশির দশকের শুরু থেকে এর যাত্রা মৃদু গতিতে শুরু হয়। ১৯৮১ সালে ওআইসির সম্মেলন উপলক্ষে জাতীয় জাদুঘরে শিল্পী সাইফুল ইসলামের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর পর বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি জনপ্রিয় হতে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্যালিগ্রাফারদের কিছু কিছু চর্চা চলতে থাকে। নব্বইয়ের দশকে এসে তা আরো বেগবান হয়। ১৯৯৯ সালে শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, ২০০১ সালে আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী এবং ১৯৯৮ সাল হতে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রতি বছরই সারাদেশের ক্যালিগ্রাফারদের শিল্পকর্ম নিয়ে জাতীয় জাদুঘরে দশদিন বা পক্ষকাল ব্যাপি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছে।

বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমীও দু'টি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। গত কয়েক বছরে চট্টগ্রাম ও সিলেটসহ রাজধানী ঢাকায় বেশ কয়েকটি যৌথ ও একক প্রদর্শনীতে, প্রকাশিত ক্যালেন্ডার কার্ডে, সংবাদপত্র-সাময়িকীতে ক্যালিগ্রাফির বর্ণময় বহুল ব্যবহার দেখে ধারণা হয়, বাংলাদেশের পুনর্জীবিত এ

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পটিকে দেশের শিল্পানুরাগী মানুষ আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথেই গ্রহণ করেছে। এসব প্রদর্শনীর আয়োজন শিল্পকলার ভূবনে ক্যালিগ্রাফির উজ্জ্বল অবস্থান বিবেচনায় আমরা আশান্বিত হতে পারি বৈকি। এভাবে বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফির চর্চা উত্তোরোত্তর বেড়েই চলেছে। যা নতুন নতুন ক্যালিগ্রাফার তৈরীতে ও এর ব্যাপক চর্চার সম্ভাবনার দুয়ারকে উম্মোচিত করেছে।

৪. আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বাংলাদেশী ক্যালিগ্রাফারদের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি শিল্পীরা স্বদেশের ভালবাসায় যেমন বাংলাদেশে অনবরত শিল্পচর্চা করে চলছেন তেমনি বিদেশের মাটিতেও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল ২০০১ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত নবম ইন্টারন্যাশনাল ক্যালিগ্রাফি এক্সিবিশন, ২০০২ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত ক্যালিগ্রাফি অব দ্যা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড, শিল্পী আরিফুর রহমান ১৯৯৯ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কুরআন ফেয়ার, ১৯৯৭ সালে ইরানের রাজধানী তেহরানে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ক্যালিগ্রাফি ফেস্টিভ্যাল, ২০০২ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত ক্যালিগ্রাফি অব দ্যা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড এবং ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কুরআন ফেয়ার-এ অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া ২০০২ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত 'ক্যালিগ্রাফি অব দ্যা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের শিল্পী আমিনুল ইসলাম, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়াও ২০০৬ সালে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে আবদুর রহমান মৌলভীর হিলাইয়া ও মুসান্না প্রকরণে দক্ষ ও নিখুঁত উপস্থাপন দর্শকদের হৃদয় ছুঁয়েছে।[৭] দশম আন্তর্জাতিক কুরআন প্রদর্শনী ও সেমিনারে বিশ্বের ২০টি দেশ অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে বাংলাদেশের সরব অংশগ্রহণ ছিল। অন্যান্য দেশগুলো ছিল- ইরান, পাকিস্তান, ভারত, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, তিউনিসিয়া, লেবানন, মরক্কো, সংযুক্ত আরব আমিরাত, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুদান, বসনিয়া, যুগোস্লাভিয়া, চীন, রাশিয়া, বৃটেন, প্রভৃতি।

এ সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণ করেন- বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক আহমদ মনসুর, ইসলামী ফাউন্ডেশনের তৎকালীন ডিজি সৈয়দ আশরাফ আলী এবং ক্যালিগ্রাফার ও শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন। কুরআন প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের গ্যালারীটি ছিল সবচেয়ে বড়। আর সবচেয়ে বেশি দর্শকের

Dhaka University Institutional Repository

সমাগম হয়েছিল। সেমিনার পর্বে The holy Quran and the Art শিরোনামে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন- সৈয়দ আশরাফ আলী। ইরান সহ বিশ্বের বিভিন্ন মিডিয়ায় বাংলাদেশ হতে অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করে। ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠে।[৮]

৫. প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ

বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি শিল্প চর্চা ও বিকাশে অনেক সমস্যা থাকলেও কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক উদ্যোগ বেশ আশার সঞ্চার করেছে। ১৯৯৮ সালে ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠাকাল হতে বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে বেশ কিছু ক্যালিগ্রাফার গড়ে তুলেছেন এবং গড়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। ২০০৩ সালে বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে প্রশিক্ষণের তেমন কোন ভাল ব্যবস্থা না থাকলেও ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'ক্যালিগ্রাফি' বের করে ক্যালিগ্রাফির প্রচারণা এবং এ বিষয়ে লেখালেখির প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। চট্টগ্রামের শিল্পী আমিরুল হক শরীফা আর্ট স্কুল এর বারটি শাখায়, আবদুল্লাহ আল মামুন তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশন এর অধিকাংশ শাখায় এবং শিল্পী আরিফুর রহমান ও বশির মেসবাহ আর্ট এন্ড ক্যালিগ্রাফি ইনস্টিটিউট-এ ক্যালিগ্রাফি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে ক্যালিগ্রাফি চর্চার পথকে সুপ্রশস্ত করছেন।

বাংলাদেশে সরকারিভাবে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যাবস্থা না থাকা সত্ত্বেও উপরিউক্ত উদ্যোগ গুলোর মাধ্যমে যে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে তা উল্লেখ করার মত। বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফারগণ শুধু স্বদেশে নয় বরং এদের মধ্যে অনেকই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। সুতরাং বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি শিল্পীরা বিশ্ব সমমর্যাদায় যে সমাদৃত হয়েছেন এবং হচ্ছেন একথা নিঃসংকোচে বলা যায়। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি শিল্পও যে দেশে বিদেশে আরো অধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠবে তা প্রত্যাশা করা যায়।[৯]

৬. রুচিশীল শিল্প হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ

লিপিকলার প্রধান আকর্ষণ রয়েছে খাড়া ও বক্রাকার হরফগুলোকে এমনভাবে সুরুচিপূর্ণভাবে ছন্দায়িত করার মধ্যে, যাতে সার্বজনীন আবেদন প্রকাশ পায়। একজন চিত্রকর তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে একটি প্রতিকৃতিতে রেখার মাধ্যমে তার আবেগ ও অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারে, যাতে আনন্দ বা দুঃখ,

Dhaka University Institutional Repository

উত্তেজনা প্রশান্তি অথবা বিতৃষ্ণা ফুটে উঠে। স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক বস্তু থেকে গ্রহণ করে একটি লাইন বা রেখা এমনভাবে ব্যক্ত করা হয় যে, তা বিশেষ ধরণের ছন্দের প্রতীক হয়ে উঠে। হস্তলিপি শিল্পীরা এমন এক বিশেষ রেখা ব্যবহার করেন, যার দ্বারা তিনি মনে করেন যে, তিনি তাঁর অভিষ্ট্য লক্ষ্যে পৌছতে পারেন। তার সাফল্য নির্ভর করছে তিনি তার ছন্দের রীতিকে কতটুকু সুচারোরূপে প্রয়োগ করেছেন। তারপর লিপিরীতির ছন্দায়িত করণের উপর নির্ভর করছে একটির প্রকরণের সাথে অন্যটির পার্থক্য। লিপিশিল্পীগণ তাদের লিপিকলায় জীবনের ছন্দের প্রকৃত চেতনা প্রকাশের এমন সফলতা অর্জন করেছিলেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর চিত্রকরেরা লিপিকারদের সেই পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এ ধরণের রেখাকে মিস্টার হিউভোজ Beauty Line বা সৌন্দর্যমণ্ডিত রেখা হিসেবে বর্ণনা করেন। একজন লিপিকার তার লিপিশৈলীর জন্য এমনই একটি রেখা ব্যবহার করেন।[১০]

সময়ের বিবর্তনে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ক্যালিগ্রাফির জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। শিল্পকলা বলতে সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল- কিছু বিমূর্ত চিত্র কিংবা কতিপয় নগ্ন নারীর ছবি আঁকা। কিন্তু ইসলাম শিল্পকলায় বিকল্প হিসেবে উপহার দিয়েছে নান্দনিক ক্যালিগ্রাফি। যা মুসলিম সমাজে শিল্পকলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এটি যেমন শিল্পকলার দাবিতে একটি পরিপূর্ণ কলা তেমনি সৌন্দর্য ও নান্দনিকতায় পরিপূর্ণ। যা দর্শকদের নয়নে প্রশান্তির ছোঁয়া আনে এবং তাদের হৃদয়কে করে আন্দোলিত। এ শিল্পের ব্যাপ্তি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ সম্পর্কে শিল্পী সাইফুল ইসলাম বলেন- "তৈলচিত্রের বিশাল সমুদ্রে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি একটি দ্বীপ"।

এ প্রসঙ্গে Muhammad Mohar Ali তার Art & Architecture শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন- Calligraphy occupies, however an unique position not only because it is one of the most precious tradition of Islamic Art but also because in Bengali represents a combination of two Arts those of writing and stone carving.[১১] ইতোমধ্যে ইউরোপের অনেক শিল্পী প্রাচ্যদেশীয় ক্যালিগ্রাফির শিল্পরূপ, রেখাকলার গীতিময়তা ও ছন্দে আকৃষ্ট হয়ে নিজ নিজ শিল্প সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশের ক্যালিগ্রাফি বা লিপিশিল্পের প্রতি অনেক শিল্পী আকর্ষণ বোধ করেছেন। বেশ কিছু শিল্পী গভীর মমত্ব ও আনুগত্য নিয়ে ক্যালিগ্রাফি চর্চায় মনোযোগ দিয়েছেন। তাছাড়া আনন্দের বিষয় হচ্ছে- এদের মধ্যে কেউ কেউ শিল্পবোদ্ধাদের মনে গভীর রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৭. বাণিজ্যিক সম্ভাবনা লাভ:

আব্বাসীয় আমলে হস্তলিখন শিল্প একটি একটি উন্নত মানের সুকুমার শিল্পের মর্যাদা লাভ করে। হস্তলিখন শিল্পীগণ উচ্চহারে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দ্বারা রাষ্ট্রীয় ফরমান এবং দলিল দস্তাবেজের অনুলিপি তৈরি করার জন্য নিয়োজিত হতেন। শিল্পীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণে হস্তলিখন শিল্পের কারণে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়। যে শিল্পীর হস্তাক্ষর যত সুন্দর এবং হাত যত দ্রুত চলে তিনি তত বেশি উপার্জন করতে পারতেন এবং তাদেরকে সেই হারে সমাদর করা হতো। পণ্ডিতগণ কর্তৃক রচিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণ এবং বিভিন্ন সরকারি নথিপত্রের অনুলিপি তৈরিকরণ লাভজনক পেশা হওয়ার কারণে শিক্ষিত ও সুহস্ত লিখন শিল্পীগণ আগ্রহ সহকারে তা গ্রহণ করেন। সেই আমলে বিক্রয়যোগ্য পুস্তকের অনুলিপি প্রস্তুত করে একজন হস্তলিখন শিল্পী দৈনিক তৎকালীন তিন বা চার টাকা সমপরিমাণ মুদ্রা উপার্জন করতে পারতেন।[১২]

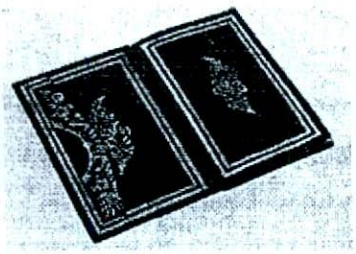

আব্বাসীয় যুগে পুস্তক প্রকাশনা একটি আকর্ষণীয় মর্যাদা সম্পন্ন কাজ ছিল। এর অর্থ ছিল শ্রেণীর লিপিকারের পেশাদারী কাজে নিয়োগ। অমরত্ব লাভের আশায় গ্রন্থকারের সুনাম অর্জন এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান লাভের উৎসের বিকাশ। বর্তমানেও বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবেও ক্যালিগ্রাফি একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। অফিস আদালত ও ড্রইং রুমে জায়গা করে নিচ্ছে ক্যালিগ্রাফি। বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের ক্যালেন্ডার, ডায়েরী, স্টিকার, ভিউকার্ড, ঈদকার্ড, ব্রুশিয়ার, বই ও ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ, বিভিন্ন গিফট সামগ্রী, এমনকি বিল্ডিং এর মোজাইকে পাথর খোদাইয়ে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এটি স্থাপত্য, লিপিকলা, মুদ্রা, পাণ্ডুলিপি, মৃৎপাত্র, বয়নশিল্প, ধাতবপাত্র, ফুলদানি, মোমাধার, ধুপধানি, কাঠ ও হাতির দাঁতের কাসকেট ইত্যাদিতে শিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনার স্বাক্ষর রাখছে।[১৩]

অনেকেই এসব ধর্মীয় অনুভূতি সম্পন্ন শিল্প অধিক পছন্দ করেন বলে আজাদ প্রোডাক্টস, আইডিয়াল প্রোডাক্টস সহ বিভিন্ন প্রোডাক্টস লিমিটেড কোম্পানীগুলো তাদের প্রকাশিত প্রকাশনা সামগ্রীতে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার করে যাচ্ছেন। বর্তমান ইসলামী ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্যালিগ্রাফির

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠপোষকতা ও শিল্পীদের ক্যালিগ্রাফি কর্ম কিনে যে শুকনো বৃক্ষে বৃষ্টি ঢেলে ঝরা কাননে ফুল-ফল ও সবুজের সমাহার ঘটিয়ে প্রানের স্পন্দন জাগিয়েছেন সত্যিই তা ইতিবাচক।[১৪] এভাবে প্রতিনিয়তই মানুষ ক্যালিগ্রাফির প্রতি ঝুঁকছে। ফলে ক্যালিগ্রাফির একটি বাণিজ্যিক সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। গত তিন দশকে ক্যালিগ্রাফি শিল্পকলা উৎকর্ষতার এমন এক উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে বলা যায়।[১৫] Calligraphy linked many other product of imagination and knowledge by ornamenting architecrutal buildings, book's covers and pottery etc.[১৬]

৮. মিডিয়াতে প্রচার

গত দেড় যুগ ধরে বাংলাদেশের একক ও যৌথভাবে আয়োজিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের শিল্পীদের অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন ক্যালিগ্রাফি চর্চা করার কারণে এ সফল আয়োজনের উপর বিভিন্ন প্রতিবেদন, সমালোচনামূলক প্রবন্ধ, বিশ্লেষণমূলক লেখা বিভিন্ন পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ক্যাটালগ, হ্যান্ডবিল কিংবা পোস্টারে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। গত এক দশক থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে- বিভিন্ন পত্রিকা, ম্যাগাজিন কিংবা অন্য কোন প্রকাশনায় ইসলামী কোন বিষয়ের সাথে ক্যালিগ্রাফি যুক্ত করা। এমনকি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিভিন্ন ইসলামী অনুষ্ঠানগুলোর ব্যাকগ্রাউন্ডে কিংবা টিভির পর্দার এনিমেশনে ক্যালিগ্রাফির শিল্পীত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যাতে দর্শক ও শ্রোতার মাঝে যেমন অনুষ্ঠানের প্রতি হৃদ্যিক ভালবাসা তৈরি হয় তেমনি এর মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতির এ গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি দর্শকদের মাঝে গ্রহণীয় হয়ে উঠে। যা প্রকৃতপক্ষেই বাংলাদেশের ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯. শিল্পীর আর্থিক যোগান লাভ

দিন যতই যাচ্ছে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের কদর ততই বেড়েই চলেছে। সৌন্দর্য পিপাসু লোকেরা তাদের ঘর, অফিস, চেম্বার, প্রতিষ্ঠান, ড্রইং রুম সহ বেশিরভাগ সামগ্রী সাজানোর জন্য হাতে আঁকা চিত্র শিল্প ও ক্যালিগ্রাফি কিনে নেন। বর্তমানে অনেক শিল্পী গ্রাফিক্সের কাজ শিখে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার প্রকাশিত বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকার প্রচ্ছদ, কার্টুন সহ সকল প্রকাশনায় কাজ করেন। আবার অনেক শিল্পী নিজেই এড ফার্ম দিয়ে নিজস্ব শিল্প নির্দেশনায় পাবলিকেশন্স এর কাজ করে যাচ্ছেন। এভাবে ক্যালিগ্রাফি শিল্পীরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। অনেক শিল্পী আর্ট ও পাবলিকেশন্স এর নিজস্ব গ্যালারী দিয়েছেন যেখান

Dhaka University Institutional Repository

থেকে শিল্পপ্রেমীরা ক্যালিগ্রাফি কিনে নেন। তাছাড়া প্রতিবছর প্রদর্শনীতে কয়েক লাখ টাকার ক্যালিগ্রাফি বিক্রয় হয়। যা শিল্পীকে যেমন উৎসাহিত ও আনন্দিত করে তেমনি আর্থিক ভাবেও শিল্পীরা লাভবান হন। এ প্রসঙ্গে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন - যে ব্যক্তির হাতের লেখা যত সুন্দর সে ব্যক্তি তত বেশি উপার্জন করতে পারবে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে- দিল্লীর সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ একজন সুদক্ষ লিপিশিল্পী ছিলেন। তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরে কুরআনের অনুলিপি তৈরী করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মুঘল সম্রাট বাবর ও আওরঙ্গজেব অত্যন্ত উঁচুদরের ক্যালিগ্রাফি শিল্পী ছিলেন। সুতরাং বলা যায়, ক্যালিগ্রাফি একটি আর্থিক সম্ভাবনাময় খাত।[১৭]

১০. দেশের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি

শতকরা ৮৮ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। তাই এ দেশের মানুষ স্বভাবগতভাবেই ধর্মভীরু ও ধর্মের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। ধর্মের প্রতি একটি কোমল অনুভূতি প্রায় সকলের অন্তরে বিরাজমান। তাই ধর্মকে কেন্দ্র করে কোন শিল্প গড়ে উঠলে বাংলাদেশের মানুষ তাকে শ্রদ্ধাভরে স্বাগত জানাবে। ক্যালিগ্রাফিও অনুরূপ ধর্মীয় চেতনা, বিশ্বাস, আবেগ ও অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর একটি নান্দনিক মাধ্যম, যা মানুষের চিন্তা চেতনার মাঝে ধর্মীয়ভাবে একটি গভীর আবহ সৃষ্টি করে। তাছাড়া ইসলামে প্রাণীর চিত্রাঙ্কন নিষিদ্ধ থাকায় সেই স্থান দখল করে আছে ক্যালিগ্রাফি। সুন্দর লিপিই হচ্ছে শিল্পের মাধ্যমে ধর্মের বাণী প্রচারের একটি অন্যতম মাধ্যম। তাই যুগ যুগ ধরে কুরআনের সুন্দর লিখন পদ্ধতিকে ধারণ করে এটি আলোকিত ও উচ্চাঙ্গ শিল্পের রূপ ব্যাঞ্জনায় পরিগণিত হয়েছে।[১৮]

তাই ক্যালিগ্রাফির প্রতি এদেশের মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অনেক বেশি। এমনকি একজন নিরক্ষর ব্যক্তিও আরবী লিপির এক অসামান্য পবিত্রতা উপলব্ধি করেন এবং কুরআনের আয়াত সম্বলিত ক্যালিগ্রাফিকে মর্যাদা দেন। ফলে আল কুরআন ও সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষ আরো আকৃষ্ট হয়ে উঠে। যার প্রমাণ মেলে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে উৎসুক দর্শনার্থীদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ লক্ষ্য করে। তবে এসব দর্শকের যদি শিল্প সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকত অথবা তারা যদি শিল্পবোদ্ধা হতেন, তাহলে এর প্রতি মানুষের ভক্তিটা আরও ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হত। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফির সম্ভাবনা খুবই আশাব্যাঞ্জক।

Dhaka University Institutional Repository

১১. মহিলা শিল্পীদের ক্যালিগ্রাফি চর্চা শুরু

বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি চর্চায় আরেকটি সম্ভাবনাময় দিক হচ্ছে- সাম্প্রতিককালে মহিলারাও এ ক্যালিগ্রাফি শিল্পচর্চায় এগিয়ে এসেছেন। শিল্পের এই বৈচিত্রাঙ্গণে তাদের সরব পদচারণা ক্যালিগ্রাফির চর্চাকে আরো সাহসী ও বেগবান করে তুলছে। ২০০৪ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত একাদশ দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এক প্রতিভাবান তরুণী।[১৯] এ সম্মানের ফলে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের মান বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্যালিগ্রাফি অঙ্গনেও বাংলাদেশের কতিপয় নারী ক্রমশ গৌরবোজ্জ্বল অবস্থানে উন্নীত হয়েছেন। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত বিগত কয়েকটি প্রদর্শনীতে মহিলা ক্যালিগ্রাফারদের প্রদীপ্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে। শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ এক ব্যতিক্রমধর্মী শিল্পাচারী। তিনি মেহেদী পাতা নিঃসারিত রস সুকৌশলে ব্যবহার করে পবিত্র কুরআনের মহিমান্বিত আয়াত দ্বারা ক্যালিগ্রাফি করেছেন।

শিল্পী ফেরদৌসী বেগম তার সিদ্ধহস্তে ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করে বিগত পাঁচ বছর যাবত প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করছেন। এছাড়াও মাসুম আখতার মিলি, নাজমুন সাঈদা পলি, আরেফা বেগম চৌধুরী, মুসাম্মাৎ মুকাররমা, শর্মিলা কাদের, রেশমা আখতার, প্রভৃতি মহিলা ক্যালিগ্রাফার বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রদর্শনীসমূহে অংশগ্রহণ করে তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। যদিও তারা এখনও শৈলী ভিত্তিক লিখনে পারদর্শী হয়ে উঠেননি তবে তাদের নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও শিল্পের প্রতি অগাধ ভালবাসা বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- মোহাম্মদ আবদুর রহীম, অক্টোবর-২০০২, ঢাকা, পৃ-৮১

২. Arts and the Islamic world, P-74

৩. মুসলিম লিপিকলা- এম জিয়া উদ্দিন, অনুঃ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলামী ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃ- ১

৪. মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প- ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ-৩২৯

৫. মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা- ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, ২৫ জুন-১৯৯৬, পঞ্চম সংস্করণ, রাজশাহী, পৃ-২৮৭.

৬. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- মোহাম্মদ আবদুর রহীম, অক্টোবর-২০০২, ঢাকা, পৃ-১০

৭. প্রতিবেদন: দুবাইয়ের ৩য় আন্তর্জাতিক আরবী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ২০০৬ শিল্পাঙ্গনে আলোড়ন তুলেছে- মোহাম্মদ আবদুর রহীম, দৈনিক সংগ্রাম, ৫ এপ্রিল-২০০৬

৮. তেহরানে আন্তর্জাতিক কুরআন প্রদর্শনী ও সেমিনারে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ- আহমদ মনসুর, নিউজ লেটার, পৃ-৩০

৯. উজ্জ্বল আশার আলো দেখিয়েছে ৬ষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫, শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, ক্যালিগ্রাফ আর্ট, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আগস্ট-২০০৩, পৃ-৭

১০. মুসলিম লিপিকলা- এম জিয়া উদ্দিন, অনুঃ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলামী ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃ- ১৫

১১. History of the Muslim of Bengal- Mohammad Mohor Ali, Vol.–1B, P.-877

১২. মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প- ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ-৩২৯

১৩. ৩য় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ২০০০-উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে ড. নাজমা খান মজলিসের লিখিত অভিভাষণ

Dhaka University Institutional Repository

১৪. বর্তমান ক্যালিগ্রাফির অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট- আমিনুল ইসলাম আমিন, সাপ্তাহিক রোববার, ১১ মে-২০০৬, ঢাকা, পৃ-৩৫

১৫. সাহিত্য সংস্কৃতি, সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা -২০০৪

১৬. Arts and the Islamic world, P.-74

১৬. প্রতিবেদন: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ২০০৫- ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী

১৭. সংস্কৃতি ও ক্যালিগ্রাফি-ইব্রাহীম মন্ডল, জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্মারক, পৃ-২১৬- ২১৭

১৮. ফিচার: ক্যালিগ্রাফিতে নারী- মহিউদ্দিন আহমাদ, দৈনিক ইনকিলাব, ৬ জুন ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশমালা

সুদীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশে আরবী ক্যালিগ্রাফি চর্চায় যেসব সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে তার আলোকে আমি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতি নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করছিঃ

ক. শিক্ষার্থীদের প্রতি:

১. গভীর মনোনিবেশ ও আন্তরিকতা সহকারে ক্যালিগ্রাফির লিপিশৈলী গুলোর আয়ত্ত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

২. সমকালীন শিল্পকলার সৌন্দর্য দর্শনে ক্যালিগ্রাফির আরা নতুন মাত্রা আবিষ্কারে প্রয়াস চালানো প্রয়োজন।

৩. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী গুলোতে অংশগ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

খ. ক্যালিগ্রাফারদের প্রতি:

১. দেশের প্রথিতযশা ক্যালিগ্রাফার, ক্যালিগ্রাফি গবেষক ও সংগঠকদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে কমিটি থাকা প্রয়োজন। যাদের নেতৃত্বেই মূলত বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে ক্যালিগ্রাফি শিল্প একটি অনুপম ও শক্তিশালী শিল্প হিসেবে স্বীকৃত হবে এবং শিল্পীদের ন্যায়সঙ্গত আধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

২. ঐতিহ্য চলমান রাখতে ও বিকশিত করার জন্য আরো ব্যাপক পরিমাণ শিক্ষার্থী তৈরি করা দরকার।

৩. ক্যালিগ্রাফির ইতিহাস, ধারা, স্টাইল প্রভৃতির উপর হাতে-কলমে, গ্রন্থ-ম্যানুয়াল ও অনুশীলনপত্র যাকে আরবীতে তাসাউইদ এবং তুর্কী ভাষায় কারালামা বলে তা তৈরি করা দরকার এবং সমসাময়িক ক্যালিগ্রাফারদের মূল্যায়ন ও একত্রিত করার প্রয়াস চালানো প্রয়োজন।

গ. প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি:

১. মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ক্যালিগ্রাফিকে শিক্ষা কারিকুলামে ১০০ নাম্বারের নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে হলেও সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

২. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে ক্যালিগ্রাফির উপর স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও আর্ট কলেজে একটি কোর্স চালু করা প্রয়োজন।

৩. বিজ্ঞাপন, প্রকাশনা ও মিডিয়ায় অশ্লীল দৃশ্যের পরিবর্তে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহিত করা এবং এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষে প্রতি বছর সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা দরকার।

৪. ভালমানের ক্যালিগ্রাফি কর্মগুলোর সমন্বয়ে সমৃদ্ধ এলবাম কিংবা Contemporary Calligraphy in Bangladesh নামে ৪ রংয়ের একটি বই প্রকাশ করা দরকার। অন্যথায় এ সকল কৃতিত্বপূর্ণ কাজ একদিন সময়ের দাপটে আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যাবে।

৫. বিদ্যমান ক্যালিগ্রাফি কেন্দ্রিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোর আরো সুদৃঢ় ও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে নিয়মিত ক্লাস, কর্মশালা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা দরকার।

ঘ. সরকারের প্রতি:

১. সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এর অধীনে বিভাগীয় শহরগুলোতে ক্যালিগ্রাফি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যেখানে থাকবে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করার মত সুযোগ, স্বাধীনতা ও ইতিবাচক পরিবেশ।

২. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে জাতীয়ভাবে ক্যালিগ্রাফির উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও কোর্সের আয়োজন করা প্রয়োজন এবং দ্বিবার্ষিক এশিয় চারুকলা প্রদর্শনীর মত আন্তর্জাতিক মানের ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করা দরকার।

৩. জাতীয় জাদুঘর সহ বিভিন্ন শহরের জাদুঘর গুলোতে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের জন্য আলাদা গ্যালারী বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। যেখানে শুধুমাত্র বাছাইকৃত ক্যালিগ্রাফি গুলো স্থান পাবে।

৪. শিশু একাডেমীর কেন্দ্র ও শাখা গুলোতে যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার মধ্যে ক্যালিগ্রাফির বিষয়টিও অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।

৫. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতি বছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করা প্রয়োজন এবং বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত শিল্পকর্মের জন্য শিল্পীকে এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর বা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যে মূর্তির ভাস্কর্য স্থাপন করা হয় তা বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে অত্যন্ত বেমানান ও শরীয়ত বিরোধী। এহেন সমস্যা দূরীকরণে ও সামগ্রিক সৌন্দর্য বর্ধনে ক্যালিগ্রাফি ভিত্তিক ভাস্কর্য নির্মাণ করা যেতে পারে।

৭. সর্বোপরি ইসলামী ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিদর্শন স্বরূপ পর্যায়ক্রমে জাতীয়ভাবে ইসলামিক আর্ট মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যা হতে পারে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য এক অনন্য মডেল।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আলোচনার প্রান্তসীমায় এসে বলা যায়- আরবী ক্যালিগ্রাফি শিল্পকলার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যা মানুষের নান্দনিক মনের সুক্ষ্মকোণে নিজস্ব সুন্দরের অস্তিত্বকে নিরবে কিংবা সরবে প্রমাণ করে তুলতে সক্ষম হয়। এতে একাধারে শৈল্পিক বোধ, ঐতিহ্য, রং এর বিচিত্রতা এবং প্রতিনিয়ত শিল্পময় আবিষ্কারের নতুন নতুন সৌন্দর্যময় আবহ ও আক্ষরিক নতুন দর্শনের প্রকাশ ঘটে। পৃথিবীর অনেক ভাষায় ক্যালিগ্রাফির চর্চা হলেও আরবী ভাষাই ক্যালিগ্রাফির জন্য সর্বোত্তম মাধ্যম। কেননা এ ভাষার শিরঃকোণ ও তীর্যক রেখা দ্বারা যে কৌণিক হরফ লেখা যায় তা এক আশ্চর্যজনক রৈখিক ছন্দে পরিণত হয়। এর লিপিশৈলী ও শিল্পমাধ্যম গুলো রস ও কালোত্তীর্ণ। রাসূল (সাঃ) এর সময় থেকে শুরু হয়ে উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে ক্যালিগ্রাফি চর্চার বেশ উৎকর্ষ সাধিত হয়। পরবর্তীতে মুঘল ও সুলতানী আমলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এ শিল্প ফুলে ফলে সুশোভিত হতে থাকে। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এ শিল্পের পরিপূর্ণতা অর্জিত হলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত ক্যালিগ্রাফির চর্চা স্থবির হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা উত্তর নব্বই এর দশক হতে বাংলাদেশে এর চর্চা আবার বাড়তে থাকে। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে ও একবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফির চর্চা সচেতন মহলে বেশ সাড়া ফেলে।

আরবী ক্যালিগ্রাফির প্রধান ও অপ্রধান মিলে ২৪/২৫ টি শৈল্পিক ধারা বা রীতি থাকলেও বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ক্যালিগ্রাফি শিক্ষা না থাকায় শিল্পীরা ট্রাডিশনাল ধারার সব গুলিতে ক্যালিগ্রাফি শিল্প নির্মাণ করতে সক্ষম হননি। তবে নাসখী, কুফী, সুলুস, নাসতা'লিক ও শিকাসতা প্রভৃতি ধারার ক্যালিগ্রাফি বিগত প্রদর্শনী গুলোতে দেখা গেছে। বাংলাদেশের সমসাময়িক কালের আরবী ক্যালিগ্রাফি চর্চার মূল্যায়ন করতে গেলে বলতে হয়- ইরাক, ইরান, সৌদি আরব, আরব আমিরাত সহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের মত বাংলাদেশে ব্যাপক ক্যালিগ্রাফির চর্চা না হলেও যতটুকু হয়েছে, তাকে একেবারে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। বিগত দশ বছরের বেশি সময় ধরে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সিলেট সহ ঢাকায় প্রায় প্রতি বছরেই ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমী সহ কিছু প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এসব কাজে বেশ নিবেদিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সুবাদে বেশ কিছু আর্ট স্কুল এবং

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগতভাবে অনেক শিল্পী ক্যালিগ্রাফির চর্চা করে চলেছেন। অনেক শিল্পী প্রকাশনা সংস্থায় শিল্প নির্দেশকের ভূমিকা থাকায় তাদের চর্চা অব্যাহত রয়েছে। অনেকেই আবার ক্যালিগ্রাফির উপর নিয়মিত প্রবন্ধ লিখছেন। কেউ কেউ আবার বইও প্রকাশ করছেন। সম্প্রতি কয়েকজন এর উপর গবেষণাও করছেন।

ক্যালিগ্রাফি চর্চার জন্য বাংলাদেশ একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র হলেও কতিপয় মৌলিক সমস্যার কারণে এর ব্যাপক বিস্তৃতি হচ্ছে না। সরকারি পৃষ্ঠপোকতার অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অন্তর্ভূক্ত না হওয়া, শিল্পীদের আর্থিক সংকট, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার অভাব এবং ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা না থাকা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে এ শিল্পের চর্চা কাঙ্ক্ষিত মানে পৌছতে পারছে না। তবে দেশে-বিদেশের বিভিন্ন প্রদর্শনী ও সম্মেলনে বাংলাদেশী ক্যালিগ্রাফারদের ব্যাপক অংশগ্রহণ, ক্যালিগ্রাফির প্রতি মানুষের ইতিবাচক মনোভাব, বাণিজ্যিক সম্ভাবনা, নতুন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের উদ্ভব, মহিলা ক্যালিগ্রাফারদের অংশগ্রহণ এবং বিশেষ করে শিল্পীদের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চায় অসীম সম্ভাবনার দুয়ারকে উম্মোচিত করেছে।

পৃথিবীর প্রতিটি মানস পরিবর্তনে এ সত্যটি বারবার প্রমাণিত হয়েছে, কোন সমাজে বা রাষ্ট্রে পরিবর্তন ঘটিয়েছে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিন্তু তার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে সাংস্কৃতিক কর্মীরা। সাংস্কৃতিক কর্মীরা হচ্ছে যুগের মুয়াজ্জিন আর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হচ্ছেন ইমাম। আধুনিক বিশ্বে যুগের নকীবদের মুসলমানরা যতক্ষণ পর্যন্ত ময়দানের পাঠাতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত লাব্বাইক লাব্বাইক বলে ঘর থেকে ছুটে আসবেনা মুসল্লীরা। জনগণ কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবেনা কোন ইমামের পেছনে। ফলে পরিবর্তন সেখানে সম্ভব হবে না। এজন্য শিল্প চর্চায় নিয়োজিত তাদের নিকট সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

আজ সারাবিশ্বেই সংস্কৃতির নামে চলছে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা। অপসংস্কৃতির হিংস্র থাবা গ্রাস করে ফেলছে আমাদের নৈতিকতা, আদর্শ, স্বকীয়তা ও সৌন্দর্যবোধ। পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসনের চরম শিকার সমগ্র মুসলিম বিশ্ব। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের ফিরে আসতে হবে আল কুরআনের সাংস্কৃতিক মোহনায়। সর্বক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ক্যালিগ্রাফির শিল্প সৌন্দর্যকে। আমরা বিশ্বাস

Dhaka University Institutional Repository

করি, শিল্প শুধু শিল্পের জন্য নয়, বরং শিল্প সত্যের জন্য, সুন্দরের জন্য। ইসলামী শিল্পকলা বিশেষ করে, ক্যালিগ্রাফি শিল্প সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, সুনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, শুভ চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে, মানব চরিত্র উন্নয়নের ক্ষেত্রে, মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। ধর্ম যেহেতু মানুষকে বিশুদ্ধ করে, শুভ ও সুন্দর কাজে অনুপ্রাণিত করে, সেহেতু এ ধর্মের সাথে সঙ্গতিশীল শিল্প মানবজাতির জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হবে। সমাজে ন্যায়, শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বর্তমান বিশ্বের দিকে দিকে যেভাবে ইসলামের পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে, এর সাথে প্রয়োজনীয় উৎসাহ উদ্দীপনা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে বাংলাদেশেও ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্পের পুনর্জাগরণ ঘটবে এটি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক.আল কুরআনুল কারীমঃ

১. পবিত্র আল কুরআনুল কারীম

খ.তাফসীর গ্রন্থ সমূহ

১. তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, অনুবাদ- মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব, সম্পাদনা- আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩

২. মা'রেফুল কুরআন- মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শাফী, অনুবাদ ও সম্পাদনা- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

গ.আরবী গ্রন্থাবলী

১. তালাতাবে- তারিখ দুয়াল-ই-আরব

২. মুসেআহ খত আল আরাবী- কামেল সালমান জাবুরী

৩. কিতাব আল ফিহরিসত- আল নাদিম

৪. তারিখ আল খাত্তুল আরাবী - মুহাম্মদ তাহির আল কুদরী

৫. দিরাসাত ফি তারিখ আল খাত্তুল আরাবী - সালাহুদ্দীন মুনাজ্জিদ

৬. অসি আল খাত্তুল আরাবী - খলীল ইয়াহইয়া আল নামী

৭. আল কুরতবী, আল কাসদ

৮. আদাবুল কেতাব

৯. مراجع للطلاب الخط العربى . خالد محمد المصرى الخطاط .

Dhaka University Institutional Repository

ঘ.বাংলা গ্রন্থাবলী

১. ইসলামী লিপিকলা- এম জিয়াউদ্দিন, ইসলামী ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৪

২. মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা- ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, জুন-১৯৯৬, রাজশাহী

৩. প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধানে- ড. আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, মে-২০০০, ঢাকা

৪. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা- ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী

৫. মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প - এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯

৬. মুসলিম চিত্রকলা- সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ঢাকা, ২০০৫,

৭. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, যোগাযোগ পাবলিশার্স, ঢাকা, অক্টোবর-০২

৮. ইসলামী শিল্পকলা- এবনে গোলাম সামাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৮

৭. মুসলিম চিত্রকলা- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ছাত্রবন্ধু পাবলিকেন্স, ডিসেম্বর-১৯৯৪

৯. মুসলিম ক্যালিগ্রাফি- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, মজিদ পাবলিকেন্স, ঢাকা, ২০০৫

১০. বাংলাদেশে ইসলামী শিল্পকলা- ঢাকা জাতীয় জাদুঘর, ১৯৭৮

১১. ইসলাম ও শিল্পকলা- আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, অনুবাদ- ড. মাহফুজুর রহমান, জুন-২০০৭, ঢাকা

১২. ইসলামী বিশ্বকোষ- নবম ও দ্বাদশ খণ্ড

১৩. আব্দুস সাত্তারের শিল্পকর্ম- অক্টোবর-২০০২, ঢাকা

১৪. সিলেবাস, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৫. সিলেবাস, ইসলামের ইতিতহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৬. হাতে কলমে ক্যালিগ্রাফি- ইব্রাহীম মন্ডল, শহীদুল্লাহ এফ. বারী ও মোহাম্মদ আব্দুর রহীম

১৭. ইসলামী সংস্কৃতি- আসাদ বিন হাফিজ, প্রীতি প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০০১

১৮. আরবী ক্যালিগ্রাফির উৎস ও বিকাশ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, মুহাম্মদ নুরুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

৬.ইংরেজি গ্রন্থাবলী

1. Muslim Calligraphy - M. Ziauddin
2. Islamic Art - D. T. Rice
3. Persian Painting - A. U. Pope.
4. Painting in Islam - Arnold T. W.
5. Persian Painting - B. Grag.
6. A Survey of Persian Art - A. U. Pope
7. Arab Painting - R. E. Hinghausen
8. Rihla Ibn Batuta- English Tr.- Agha Mahdi Hussain Baroda.
9. An Introductin to parsian art. 1930
10. Parsian art- Edited Sir E Denison Ross
11. Encyclopedia Britanica Vol.-11
12. Encyclopedia of Islam, Vol.-1
13. History of the Arabs- P K Hitti
14. Sirat Rasul Allah- Ibn Ishaq, Tr. Copy
15. Ain-I-Akbari Vol-1
16. Indian Painting under the Mughals - Brown, Percy.
17. Islamic Calligraphy- Y H Safadi, London, 1978
18. Art and Architecture of Islam - Blair S & J Bloom.
19. Art of Islam, Language and Meaning- T. Burckhar
20. Mughal Painting during Jahangir's time
21. Arts and the Islamic world
22. Memories Archeological surveyof India, Specimen no.-3
23. Art and Architecture of Islam - R.E.Hinghausen & Oleg Grabar.
24. Inscription of Bangal- Shamsuddin Ahmad, Vol-11 Rajshahi- 1960
25. Oriental Penmanship- E H Palmer, London,1889
26. Splendor of Islamic Calligraphy- Khatibi & Sijolmasi
27. The rise of the north Arabic script and its Quranic development
28. In the Surfey of Persian Art Vol.- II
29. The Quranic art of Calligraphy and Illumination- Martin Lings

Dhaka University Institutional Repository

30. A hand book of Muhammad Art - M. S. Diamond.
31. Arabic Calligraphy and his arritable Encyclopedia of Islam- B. Moontz
32. Selection Arabic and Parsian Epigraph- AKM Yaqub Ali, Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh, October-1988.
33. Islamic Calligraphy in the Medieval Iadia- P.I.S Mustafizur Rahman, University Press Ltd.-1989.
34. Khayyam larger English Persian Dictionery-Tehran, Iran-1313.
35. Islamic Art- Edited by Dr. Nazimuddin Ahmeds, Dr. Syed Mahmdul Hasan-2007, Dhaka.
36. History of the Muslims of Bengal-Muhammad Mohar Ali, Vol-IB Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, November, 2003.
37. Islamic Art in Bangladesh- Catalogue of special exhibition, National museum, 3-8 April, 1078
38. Glimpses of Muslim Art and Archetecture, Sayed Mahmudul Hasan

চ.অভিধান সমূহ:

১. আল মাওরিদ- ইংরেজি-আরবী অভিধান-১৯৬৭, বৈরুত, লেবানন
২. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ১৯৯৫
৩. তিন ভাষায় আরবী অভিধান- ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬
৪. Encyclopedia Britanica
৫. Illustrated Oxford Dictionery
৬. Oxford Advanced learners Dictionery

ছ.ক্যাটালগ সমূহ:

১. ক্যাটালগ: ১ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-১৯৯৮, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
২. ক্যাটালগ: ২য় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-১৯৯৯, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
৩. ক্যাটালগ: ৩য় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০০, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
৪. ক্যাটালগ: ৪র্থ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০১, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

৫. ক্যাটালগ: ৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

৬. ক্যাটালগ: ৬ষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৩, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

৭. ক্যাটালগ: ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

৮. ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

৯. ক্যাটালগ: ৯ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৬, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

১০. ক্যাটালগ: ইসলামী শিল্পকলা প্রদর্শনী-১৯৭৮, জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা

১১. ক্যাটালগ: গ্রুপ আর্ট প্রদর্শনী-২০০৫, জাতীয় জাদুঘর, অংকন আর্ট স্কুল

১২. ক্যাটালগ: বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৩

১৩. ক্যাটালগ: বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫

১৪. ক্যাটালগ: শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডলের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০০

১৫. ক্যাটালগ: শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০০

১৬. ক্যাটালগ: শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী- ২০০৫

১৭. ক্যাটালগ: শিল্পী বশির মেসবাহ'র একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

১৮. ক্যাটালগ: শিল্পী ফেরদৌস আরা আহমেদের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

জ.স্মারক সমূহ

১. সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

২. সাহিত্য সংস্কৃতি- জুলাই-২০০০, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৩. সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা-২০০০ সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৪. সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা-২০০১ সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৫. সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা-২০০৪ সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৬. জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্মারক

ঝ.বাংলা পত্রিকা, জার্নাল ও সাময়িকী সমূহ

১. দৈনিক প্রথম আলো

Dhaka University Institutional Repository

২. দৈনিক নয়াদিগন্ত

৩. দৈনিক সংগ্রাম

৪. দৈনিক ইনকিলাব

৫. দৈনিক মানবজমিন

৬. দৈনিক ইত্তেফাক

৭. দৈনিক আজকের কাগজ

৮. দৈনিক যুগান্তর

৯. দৈনিক খবর পত্র

১০. দৈনিক যায়যায়দিন

১১. দৈনিক বাংলা বাজার

১২.দৈনিক জনকণ্ঠ

১৩. দৈনিক আমার দেশ

১৪. সাপ্তাহিক রোববার

১৫. সাপ্তাহিক সোনার বাংলা

১৬. মাসিক অগ্রপথিক

১৭. মাসিক ছাত্র সংবাদ

১৮. মাসিক কলম

১৯. মাসিক নিউজ লেটার

২০. মাসিক তানযীমুল উম্মাহ

২১. মাসিক ক্যালিগ্রাফ আর্ট

২২. অনন্যা- ঈদ সংখ্যা

২৩. অন্যদিন- জুন-২০০০

২৪. মাসিক ক্যালিগ্রাফ আর্ট

২৫. ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি

২৬. ত্রৈমাসিক প্রেক্ষণ- জুলাই-সেপ্টেম্বর-১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

২৭. এশিয়াটিক সোসাইট পত্রিকা

২৮. ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা

২৯. মাহজুবার- ইরানের তেহরান থেকে প্রকাশিত পারিবারিক ম্যাগাজিন

ঞ.ইংরেজি পত্রিকা

1. Daily Star

ট.ওয়েব সাইট সমূহ:

1. www.arabiccalligraphy.com
2. www.islimiccalligraphy.com
3. www.calligraphy.org
4. www.islimicart.com
5. www.islimicity.org
6. www.sakkal.com
7. www.syfulart.com
8. www.behance.net

ড.বিবিধ

১. নতুনইসলামী ক্যালিগ্রাফি- ইরানী সংস্কৃতি কেন্দ্র

২. সাক্ষাৎকারের জন্য প্রেরিত প্রশ্নোত্তর

৩. জাতীয় জাদুঘর, আর্ট প্রতিষ্ঠান ও প্রদর্শনী সমূহ পরিদর্শন

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

১. আরবী লিপির উৎপত্তি:

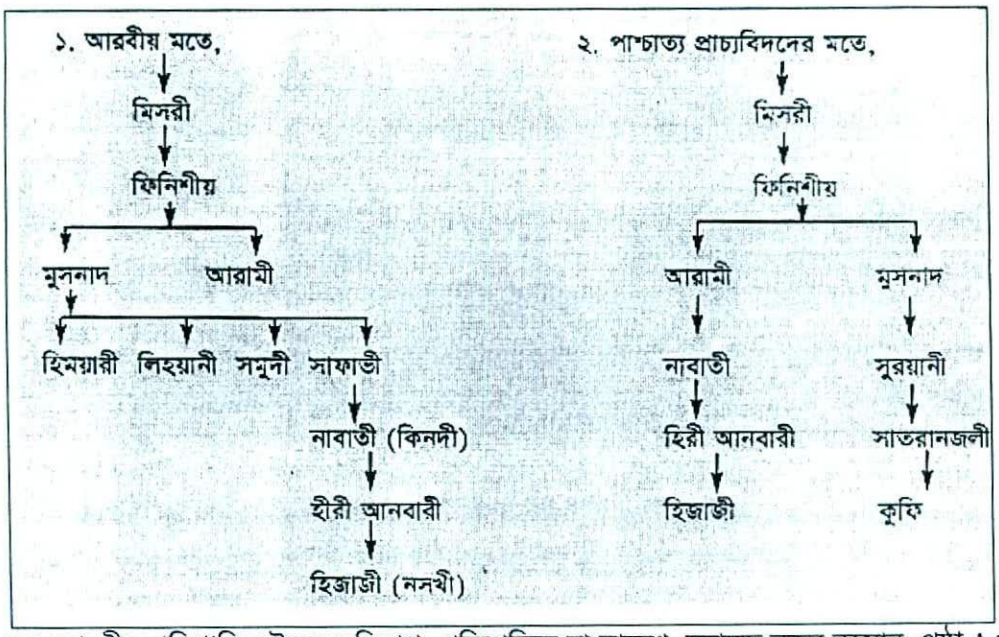

সূত্র: আরবী ক্যালিগ্রাফির উৎস ও বিকাশ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, মুহাম্মদ নুরুর রহমান, পৃষ্ঠা-১৩

২. বিভিন্ন শাসকদের আমলে উৎকীর্ণ লিপি ও মুদ্রালিপি:

Duration	Ruler	Inscriptions	Coins
879-886 1474-81	Yusuf Shah, son of Barbak Shah	870, 879(8), 882, 883, 884, 885	873, 874, 881, 882, 883, 884
	Sikandar Shah II, a prince of the royal family		
886-93 1481-87	Fath Shah, son of Mahmud Shah	886, 887, 888, 889, 891, 892,	886, 887, 890
	Sultan Shahzada	893	
	Barbak, An Abyssinian prince		
893-96 1487-90	Firuz Shah II, an Abyssinian prince	880(9), 894, 895, 892-5	893, 895

Source: Glimpses of Muslim Art and Archetecture, Sayed Mahmudul Hasan, Page-19

Dhaka University Institutional Repository

3. Primpive semantic:

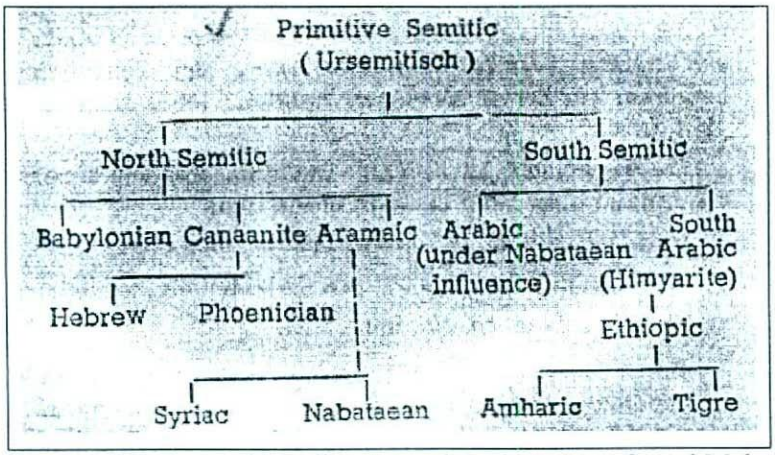

Source: Glimpses of Muslim Art and Archetecture, Sayed Mahmudul Hasan, Page-57

4. Guidelines & principles of Thuluth, Fatima Al N. re-designed:

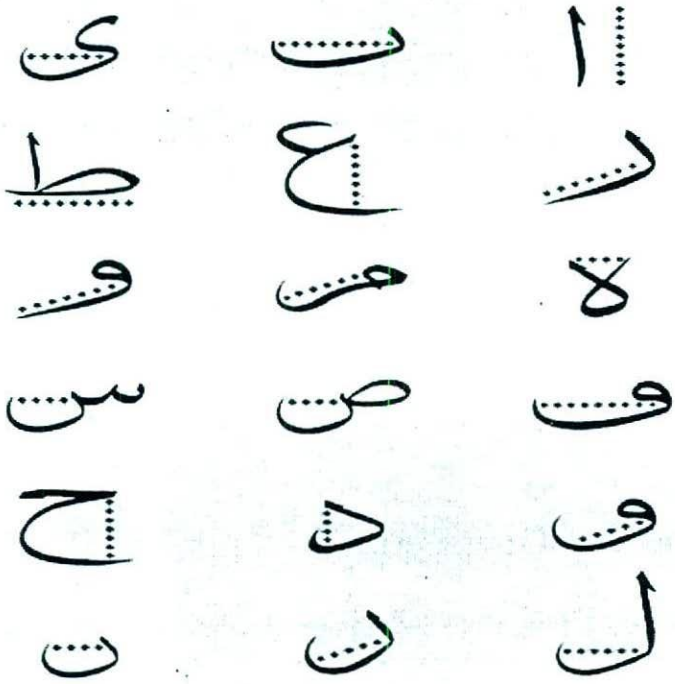

Source: http://www.behance.net/gallery/Capstone-Project/743411